ভগবান ব্রজানন্দের বেদবাণী
ও
আমার ঠাকুর

ভগবান ব্রজানন্দের বেদবাণী

ও

আমার ঠাকুর

জগৎগুরু ভগবান বুড়াশিব ব্রজানন্দের পাদপদ্মে

ক্ষমাপরানন্দের নিবেদন

website : www.joybababurashivbrajananda.in

Email Id : khamaparananda13@gmail.com

ব্রাহ্মণডুরা বুড়াশিব ব্রজানন্দধাম

ব্রাহ্মণডুরা। হবিগঞ্জ,

বাংলাদেশ

প্রথম সংস্করণ
গুরু পূর্ণিমা, ২৭শে আষাঢ় ১৪২১
১২ জুলাই ২০১৪

দ্বিতীয় সংস্করণ
গুরুধাম প্রতিষ্ঠা দিবস, ১৬ই পৌষ, ১৪২১
১লা জানুয়ারী, ২০১৫

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস ঃ
সুরজিৎ সরকার
৯৮৩০৯ ৩৭৬৩১

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
গুরুধাম, বাঙ্গুর এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০৫৫
বুড়াশিব ধাম, ঢাকা, বাংলাদেশ
দেউন্দি বটতলা গুপ্ত বৃন্দাবন ব্রজানন্দধাম
দেউন্দি চা বাগান

মুদ্রণ ঃ-
এ. জি. প্রিন্টার্স
১০১, বৈঠখখানা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

ভগবান ব্রজানন্দের বেদবাণী

ও

আমার ঠাকুর

"হরে ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে।
গৌর হরি বাসুদেব, রাম নারায়ণ হরে"।।

গুরুবাণী

গুরু সেবা কর। তাঁকে ভালবাস।
ঠিক্ ঠিক্ ভালবাসা 'যা-তা' নয়।
তিনি ছাড়া জানে না — তাঁকে না
দেখলে থাকতে পারে না। নিজের
ভাল মন্দ দুই-জানে না। কিসে তাঁর
শান্তি এই চিন্তা, এই ঠিক ভালবাসা।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

সূচীপত্র

১।	ভগবান ব্রজানন্দের বাৎসরিক উৎসবের সূচী	৫
২।	অবতরনিকা	৬
৩।	ব্রজানন্দের ধর্মগ্রন্থমালা	৮
৪।	ব্রজানন্দের বেদবাণী	৯
৫।	শ্রীশ্রীব্রজানন্দ-যুগবতার ● তরণীকান্ত বসু	৪৬
৬।	শ্রীশ্রীব্রজানন্দ বন্দনা ● শ্রীরমণী দাস	৫৩
৭।	A Glimpse into My First Impression ● *Tarani Kanta Basu*	৫৪
৮।	'গুরুধাম' প্রতিষ্ঠার অন্তরালে ● *পরিমল কুমার দাস*	৫৬
৯।	পূণ্যতীর্থ গুরুধাম ● *প্রমথ মিত্র*	৫৯
১০।	গুরু-শিষ্য সংবাদ	৬১
১১।	যা চেয়েছি তা পেয়েছি ● *রামকৃষ্ণ পাল*	৬২
১২।	ব্রজানন্দ ধর্ম ও আদর্শ ● *শ্রীরমনীমোহন দাস*	৬৬
১৩।	অহেতুকী কৃপা ● *বীণা রাণী পাল*	৬৯
১৪।	ঢাকার বুড়াশিব ধামে ধ্বংসলীলা ● *সুনীল রায় পালধি*	৭২
১৫।	ঠাকুর ব্রজানন্দের জয়োধ্বনি	৭৮
১৬।	ব্রজানন্দের লীলার কথা ● *ধামেশ্বরী মাঈ*	৭৯
১৭।	Letter from Guruji to Rameshananda	৮২
১৮।	The Speech of Swami Brajananda....	৮৩
১৯।	ঠাকুরের কিছু প্রয়োজনীয় ভজন	৮৭
২০।	শ্রীশ্রীবুড়াশিব মাহাত্ম্যর কিছু স্মরণীয় লেখা.....	৯৫
২১।	ভগবান শঙ্করাচার্য্যের তীর্থযাত্রা ● ভূমানন্দ সরস্বতী মাঈ	৯৬
২২।	রমেশানন্দ মহারাজকে নাটকের বইটি প্রকাশের.....	১০৭
২৩।	ভজনাঞ্জলীর সিডির গান ● বীনা মাঈ	১১০
২৪।	বুড়াশিবের ভজন ● দেবী মুখার্জী	১১৫
২৫।	আয় সবে মিলে ● *ধামেশ্বরী মাঈ*	১১৯
২৬।	শৈশবে আমার ঠাকুর ও দীক্ষা ● ক্ষমাপরানন্দ সরস্বতী	১২০
২৭।	১৯৭৫ ডিসেম্বর আমি ভূপালে	১২৪
২৮।	পূণ্যতীর্থ বৃন্দাবন দর্শন	১২৬
২৯।	বাদরে নিয়ে গেল ঠাকুরের উলের গেঞ্জি	১৪০
৩০।	ভজন সম্বন্ধে	১৪৫
৩১।	সন্ন্যাসিনী ভূমানন্দ ও মনীষানন্দের স্মরণে	১৪৭
৩২।	ঠাকুরের জন্মস্থান দর্শন	১৪৯
৩৩।	ব্রহ্মচর্য্যয় কাশী ও বৃন্দাবন যাত্রা	১৫১
৩৪।	দেউন্দিধামে কার্ত্তিক মাস	১৫৪
৩৫।	দেউন্দি বাগানে কার্ত্তিকের অধিবাস	১৫৬
৩৬।	সন টিলায় ঠাকুরের লুট	১৫৭
৩৭।	রঘুনন্দন ঠাকুরের লুট	১৫৮
৩৮।	গিলানীতে ঠাকুরের লুট	১৫৯
৩৯।	ব্রাহ্মণডুরার কথা	১৬৪
৪০।	ঠাকুরের লীলা, মন্টু সর্দ্দারের উপর	১৬৭
৪১।	ঠাকুরের পরিচিতি ও নিত্যপূজা পদ্ধতি	১৬৯
৪২।	ক্ষমাপরানন্দের সন্ন্যাস যাত্রা	১৭৩
৪৩।	ঠাকুরের ভজন আমারও জগন্নাথ ● ভগবান ব্রজানন্দ	১৭৬
৪৪।	নানান ভাব ● সুজিত কুমার ঘোষ	১৭৬
৪৪।	কৃষ্ণ কথামৃত ● শ্রী কৃষ্ণ স্বরূপে ভগবান ব্রজানন্দ	১৭৭
৪৫।	চাকর হতে চাই ● ঠাকুরপদ সরকার	১৮১
৪৬।	ঠাকুরের ভজন ব্রজানন্দ জয় জয় ● ভগবান ব্রজানন্দ	১৮২
৪৭।	লীলার কথা জগৎবাসীকে শোনাও ● ভগবান ব্রজানন্দ	১৮৩

হরে ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে।
গৌরহরি বাসুদেব, রাম নারায়ণ হরে।।

শ্রী শ্রী বুড়াশিব ভগবান ব্রজানন্দের বাৎসরিক উৎসবের সূচী

ক্রমিক নং	উৎসবের নাম	দিন
১	নববর্ষ	১
২	অক্ষয় তৃতীয়া	১
৩	ফুলদোল	১
৪	জামাই ষষ্ঠী	১
৫	রথযাত্রা	১
৬	গুরু পূর্ণিমা	১
৭	ঝুলন পূর্ণিমা	১
৮	জন্মাষ্টমী	১
৯	দূর্গাষ্টমী ও সন্ধি পূজা	১
১০	লক্ষীপূজা	১
১১	দীপান্বিতা	১
১২	অন্নকূট উৎসব (গুরুধাম)	১
১৩	কার্তিক সংক্রান্তি (দেউন্দিতে)	৩
১৪	জগদ্ধাত্রী অর্চনা উৎসব	১
১৫	রাস পূর্ণিমা	১
১৬	গুরুধাম প্রতিষ্ঠা দিবস	১
১৭	ভগবান ব্রজানন্দের আবির্ভাব উৎসব ও তিরোধাম (মাঘী পূর্ণিমা)	৩
১৮	শিব চতুর্দ্দশী ও পারনোৎসব	২
১৯	দোল পূর্ণিমা	১
২০	চড়ক পূজা	১

অবতরনিকা

"হরে ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে।
গৌর হরি বাসুদেব, রাম নারায়ণ হরে।"

কলি যুগের শ্রেষ্ঠ তারকব্রহ্মনাম, এই নামে যেন জগৎ সংসার উদ্ধার পায়। এই চিন্তা করেই আজকের ক্ষমাপরানন্দ সরস্বতী ঠাকুর ব্রজানন্দের সমস্ত বেদবাণীগুলোকে সংগৃহীত করেছে ঠাকুরেরই কৃপায় 'গুরুধাম' পত্রিকা হইতে। যেন সংসার জীবনে বহু আলোচিত মৃণাল, আজ উদ্ধার হয়েছে ঠাকুরের ক্ষমাপরানন্দ নামে, এই সমস্ত কর্মযজ্ঞই ঠাকুরের ইচ্ছানুযায়ী, ঠাকুর ভিন্ন এ সম্ভব কোন প্রকারেই হইত না। যারা বিশ্বাস করবেন যে — সকল কিছুরই নিয়ন্তা স্বয়ং ভগবান ব্রজানন্দই একমাত্র হতে পারেন। তিনি ছাড়া পৃথিবী অন্ধ কারে আচ্ছন্ন। তাই তার কৃপা এবং আশীর্বাদ ও নির্দেশ না হলে ঠাকুরের বেদবাণীগুলোকে ভক্ত ও সেবায়েত বাবা রামকৃষ্ণ কেন সকল 'গুরুধাম' পত্রিকাগুলোকে একত্রিত করে গুছিয়ে রেখে যাবেন আর তা কেনই বা সাধিকা বীনা মাঈ এই ক্ষমাপরানন্দকে গুরুপাদপদ্মে আশ্রয় নেবার পূর্বে দিয়ে গেলেন। তার পরই ঠাকুর যেন রোজই খোঁচা দেন — "কি রে কি করলি এই মূল্যবান সম্পদ নিয়ে?" নড়েচড়ে বসলাম ও ঠিক করলাম ব্রহ্মার মুখ নিঃসৃত বাণীগুলোকে একত্রিত করার। শৈশব হতে যা যা মনে আছে বা সাধিকা বীনামাঈ এবং একনিষ্ঠ-ভক্ত সেবক রামকৃষ্ণ বাবা কেনই বা আমার শৈশব এর মূল্যবান ঘটনাগুলো আমাকে জানালেন তা আজ বুঝতে পারছি। জয় হোক ঠাকুরের সেবায়েত ব্রজবাসী ভক্ত রামকৃষ্ণের আর সাধিকা ও সেবিকা বীণা মাঈর।

ভক্ত বনয়ারীলালজী তার ছোট ছেলে, অরুনের বাড়ীতে এই ক্ষমাপরানন্দকে বলছিলেন যে 'সবচেয়ে বড় বিষয় কি জানো? তুমি হলে ঠাকুর ব্রজানন্দের সেবক ও সেবিকার সন্তান, তোমার মধ্যে তো তাদের আশীর্বাদও অনেক আছে'। যদিও আজ আমি সন্ন্যাসী কিন্তু কি করে অস্বীকার করি তাদের ভক্তি ও সেবার কথা যা কিনা ঠাকুরের জন্যই একমাত্র ছিল, ঠাকুরই তাদের সেভাবে চালিয়েছিলেন, জয় ব্রজানন্দ।

যে সমস্ত ভক্ত শিষ্যেরা ঠাকুরের এই গ্রন্থটি একটিবার পাঠ করবেন তারাই ঠাকুরকে স্পর্শ করবেন বলে আমার বিশ্বাস আর ঠাকুরের আশীর্বাদ তো আছেই। ঠাকুরই আমাকে দিয়ে যতটুকু সম্ভব শৈশব থেকে কিছু কিছু ঘটনা যা আমার কাছে অমূল্য, সে সকল লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করিয়েছেন ঠাকুরই, ঠাকুরের চরণে আজ জানাই-হে ঠাকুর তোমার ক্ষমাপরানন্দের কলমে-সরস্বতী রূপে এসো স্বয়ং তুমি সব লিখে দিয়ে যাও, নতুবা আমার ন্যায় অজ্ঞান ব-কলম শিষ্য হয়তো এই পৃথিবীতে আর কেহই নাই।

ভুলিনি, তোমার দেহ রাখার চারদিন পূর্বের ঘটনা। হালকা বেলফুলের মালা নিয়ে গিয়েছিলাম। বীণামাঈ, রেখামাঈরা ব্যস্ত ছিল তোমাকে নিয়ে। তবুও তুমি আমাকে বলেছিলে "আনছো বেলির মালা, দাও দাও, তাড়াতাড়ি দাও"। কি অস্থিরতা ছিল তোমার, সে আজও ভুলতে পারলাম না। ডঃ ফটিক কুন্ডু বলেছিলেন আমাকে- 'তোমার মালার জন্য মনে হয় ঠাকুর যেন বসে আছেন'। সেদিন বুঝে উঠতে পারিনি। ঠাকুর তুমি তোমার এই অধম ক্ষমাকে, বলেছিলে "আমারে এইরকম সব সাদা ফুল দিবা"। যেদিন তুমি দেহ রাখলে! আজও মনে আছে সকাল ৬.৩০ মিনিটে বাঙ্গুর গুরুধাম আশ্রমে আসলাম সব হারিয়ে, ভক্তা অনিতা দোতলায় গড়াগড়ি খাচ্ছে কাঁদছে আর তোমারই তারকব্রহ্মনাম করছে। শুধু বললো 'খোকন দা' ঠাকুর আমাদের ফেলে চলে গেছে। ডঃ মিত্র ও বাগচী ৮টার পর ঘোষণা করল, তুমি নিরাকার পরমব্রহ্মেমিশে সচ্চিদানন্দ সরূপে বিরাজমান।

ডঃ ফটিক কুন্ডু বললেন মৃণাল মনে আছে বাবার কথা "এরকম সব সাদা ফুল দিবা", তুমি সব ফুল নিয়ে আসো। আমি আর রমাপ্রসাদ গুহ চৌধুরী রুবীদির স্বামী গেলাম নিউ মার্কেটে, যত ফুলের দোকান ছিল সব দোকানে সাদা ফুল তাদের দোকানে ঠাকুর আর রাখেননি - সেদিন। রমাদা বলছিলেন 'আরে মৃণাল তুমি পাগোল হয়ে গেছ'। এক টেম্পোরও বেশী হবে, এরকম কিছু সত্য অপ্রকাশিত ঘটনা আছে 'আমার ঠাকুরের' লেখার মধ্যে।

সকল ভগবত প্রেমী ভক্তশিষ্যদের কাছে এই ক্ষমাপরানন্দের অনুরোধ বইটি বহুল প্রচার করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন। কারণ মানব জীবনে ঠাকুরের বেদবাণীই অমৃতসুধা, মানবের মুক্তির জন্য। যাদের লেখা আমার জীবনকে গৌরিকে পরিণত করেছে তাদের লেখা না ছাপলে এই গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ থাকতো, সকলেই সমস্ত লেখা থেকে অমৃত সন্ধান করবেন বলে আমার বিশ্বাস।

যা ঠাকুরের নামে ঠাকুর আমার মতন মূর্খ্যকে দিয়ে লেখালেন তার প্রতিটি ঘটনাই সত্য। মিথ্যা নয় যেমন মিথ্যা নয় আমাদের জয় ব্রজানন্দ, জয় বুড়াশিব ও জয় গুরু। ওঁ নমঃ শ্রী শ্রী জগৎ গুরাচার্য্য ব্রজানন্দায় নমঃ

ভগবান শ্রী শ্রী বুড়াশিব ব্রজানন্দের ধর্মগ্রন্থমালা

১।	শ্রীশ্রী বুড়াশিব মাহাত্ম্য	ভূমানন্দ সরস্বতী
২।	লীলা পরিচয় (বাংলা)	শ্রীমৎ গনপতি দেব
৩।	লীলা পরিচয় (ইংরাজী)	শ্রী প্রাণ কুমার ভট্টাচার্য্য
৪।	ভজন-রত্নমালা	শ্রীমৎ গনপতি দেব
৫।	The Omnipotent	Srimat Rameshananda
৬।	ব্রজানন্দ আর্বিভাব নাটক	শ্রীমৎ রমেশানন্দ ও রেণুকা মাঈ
৭।	অমৃত সাগর	শ্রীমৎ বলানন্দ মহারাজ
৮।	শ্রীশ্রীগুরু নারায়ণের পাচালি	শ্রী রমনী মোহন দাস
৯।	শ্রীশ্রী ব্রজানন্দ ভজন	শ্রী বরদা সুন্দর ভৌমিক
১০।	গুরুদর্শন	শ্রী সুনীল বিশ্বাস
১১।	গুরুধাম পত্রিকা	গুরুধাম, কলকাতা
১২।	শ্রীশ্রী ব্রজানন্দ অষ্টোত্তর শতনাম গীতিমালা	শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস রায়
১৩।	ব্রজানন্দ পরমেশ্বর স্বয়ং - ৩টি খন্ডে	শ্রী সুবিমল কান্তি মজুমদার
১৪।	ঠাকুরের তারকব্রহ্মনাম ও ব্রজানন্দ স্মরণম	ক্ষমাপরানন্দ সরস্বতী
১৫।	ভগবান ব্রজানন্দের বেদবাণী ও আমার ঠাকুর	ক্ষমাপরানন্দ সরস্বতী

ভগবান ব্রজানন্দের বেদবাণী

(ভগবান ব্রজানন্দের দৈনন্দিন উপদেশ বাণী
'গুরুধাম' পত্রিকা ও অমৃত - সাগর হইতে সংগৃহীত।)

১। সত্যাশ্রয়ী হও। সত্যই জ্ঞানের উৎস-শক্তির অঙ্কুর — নিষ্ঠার হেতু — তৃতীয় নয়ন।

২। সত্য — প্রেম — পবিত্রতা — ভক্তি ও বিশ্বাসই সংসার-জীবন, ধর্ম্মাশ্রয়ী-জীবন সহজ - সরল ও সুন্দর করে।

৩। দেব দর্শনে পাপ ক্ষয় হয়, অমঙ্গল দূর হয়। ভক্তি-বিশ্বাস নিয়ে দর্শন করতে হয়।

৪। স্মরণাগত প্রতিপালক। যে আমার স্মরণ নেয় — আমি তার প্রতিপালন করি।

৫। ভক্ত আমার প্রাণ — ভক্তকে রক্ষা করা আমার ধর্ম্ম — ভক্তের মুক্তিই আমার জীবন বেদ।

৬। ব্রজানন্দ মানুষ-ভগবান। ভক্তি-বিশ্বাস-অনুভূতি চাই। যদি আর কিছু মনে কর, মহাভুল করবে।

৭। মাতৃভক্ত হ'লে সংসার স্বর্গরাজ্য হয়। মাকে দেবীজ্ঞানে পূজা করবে।

৮। ব্রজানন্দ মহাকালী। ভক্ত নানা ভাবে আমাকে দর্শন করে। যার যেমন ভাব। কখনও শ্যামা-কখনও শ্যাম-ব্রজানন্দ শিব-রাম।

৯। এক কথায় সবর্ব ধর্মের সমন্নয়ে ব্রজানন্দ ধর্ম। ধর্মের সমন্নয় সাধন ব্রজানন্দের আবির্ভাবের হেতু।

১০। আমি তুষ্ট হ'লে তোমার ইহকালে সুখ-পরকালে পরম অমৃত লাভ।

১১। মায়ায় আবদ্ধ হইও না। আমাকে সাথী করে সব করবে। সংসার করবে ব্রজানন্দের সংসার। সে সংসার হবে ত্যাগীর সংসার — ভোগীর সংসার নয়।

১২। হিংসা দ্বেষ বর্জিত প্রাণ শান্তির প্রস্রবন। হিংসা দ্বেষ বর্জিত হও।

১৩। কর্ম্মই বন্ধন। কর্ম্ম-বন্ধন মুক্ত হও। কর্ম থাকতে উদ্ধার নাই। কর্ম ক্ষয় কর, মুক্তি করায়ত্ত্ব হবে।

১৪। বৈদ্য নারায়ণ হরি — তার স্মরণ লও। রোগমুক্ত হ'বে।

১৫। জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয় সবার উপরে ব্রজানন্দ ভগবান।

১৬। বর্ত্তমান শিক্ষা সভ্যতা তামসিক সকলই অহং প্রতিষ্ঠা।

১৭। রাজ ধর্ম প্রজা পালন, প্রজা পীড়ন নয়, অসির বলে শাসন নয়।

১৮। নাম কর। নামের মধ্যেই সব কিছু আছে। আমার কাছে যা আছে নামের কাছেও তাই আছে। নাম অক্ষর বিশেষ মনে কোরনা, নাম মূর্ত্তিমান মনে রাখবে।

১৯। শান্তি আশীর্ব্বাদ অমোঘ। অশান্তি থাকেনা।

২০। নাম ও আমি অভেদ। নাম নিয়ে থাকতে হয়। আমাকে যা দিবে নামের কাছে দিলেই আমি পাই। গুরুত চিরদিন থাকেনা। নামই চির সত্য, নাম কর।

২১। আমা হতে যা পাবে এই আসন হ'তেও তাই পাবে। জীব-জগতের কল্যাণের জন্যই আসন প্রতিষ্ঠা। আসনই অনন্তকাল থাকবে।

২২। শক্ত করে বাক্য ধর সত্বর ফল পাবে, ভক্তি বিশ্বাস নিয়ে বাক্য পালন করবে।

২৩। ব্রজের ভাব-ভক্তি তোমার আদর্শ। এর কাছে আর কোন ভাব-ভক্তি লাগে না। যশোদার স্নেহের গোপাল। সেখানে আর ভগবান থাকেনা। বাৎসল্যভাব।

২৪। বেদে নাই ভাগবতে নাই। ব্রজের ভাব ভক্তি সবার উপরে, তুমি আমার আমি তোমার। ওঁ পরমাত্মণে নমঃ, ওঁ ব্রজানন্দায় নমঃ, তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট ব্রজের ভাব।

২৫। মন্ত্রের তিনটী অংশ — প্রণব ওঁকার বীজ। বীজ মন্ত্র সোহহং-শিব-বিষ্ণু-কৃষ্ণ যার যে উপাস্য। প্রণব জপ করিলে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। যত প্রকার বাক্য আছে সে সমস্ত বাক্যের পরিসমাপ্তি একমাত্র প্রণবে। প্রণবের পরে আর বচন নাই। সর্বদা প্রণব উচ্চারণ করিতে পারিলে, চারি বেদের পাঠ হইয়া যায়। প্রণব একাক্ষর ছন্দ স্ত্রী পুরুষ সকলেই এই বাক্য উচ্চারণ করিবার অধিকারী। ইহার সূক্ষ্মভাব এই যে আত্মাই সত্য আত্মাভিন্ন প্রণবাদি মিথ্যা মায়া মাত্র। আমি আত্মা — জীব নই — দেহ নই — মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি নই। এইরূপ নিশ্চয় রাখিয়া প্রণব উচ্চারণ চিন্তা করিবে।

২৬। আমার প্রকাশেই সকলের প্রকাশ। সেই আত্মার স্বরূপ তুমি। তোমার প্রকাশ দিয়াই সকল প্রকাশ তুমি স্বপ্রকাশ। তোমার প্রকাশেই সকলের প্রকাশ। তোমাকে কেহই প্রকাশ করিতে পারে না। তুমি চৈতন্য নির্বিকার পুরুষ। যেমন নট নানা প্রকার নাটক করিয়াও সে নটত্ব নিশ্চয় হারায় না। সেইরূপ তুমি প্রণবাদি চিন্তন, মনন, ধ্যান করিয়াও নিজ স্বরূপ হইতে বিচলিত হইবে না; তবেই তুমি সংসার সাগর হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে এবং দুঃখ কষ্টের হাত এড়াইবে। তুমিত মুক্তই — তোমাকে আবার মুক্ত করে কে? মন্ত্রের ইহাই হইল সূক্ষ্ম ভাব।

২৭। গুরুপথে গুরুরূপ ধ্যান চিন্তা মনন দ্বারা নিজ স্বরূপের প্রকাশ হয়। গুরুদেব নাম

দিয়া চিত্ত দর্পণের ময়লা দূর করিয়া যান। তখন নিজ স্বরূপ আপনি প্রকাশ হইয়া পরে। যেমন সূর্য্য নারায়ণকে মেঘে আবরণ করে মেঘ সরিয়া গেলেই সূর্য্য আপনিই প্রকাশ হন।

২৮। নাম আর বিন্দুভেদে সৃষ্টি দুই প্রকার। এক বাহ্য সৃষ্টি পিতামাতা কর্ত্তৃক। আর এক সৃষ্টি গুরু কর্ত্তৃক নাম সৃষ্টি। গুরু কাণে নাম দিয়া শিষ্যের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া জ্ঞান ভক্তি দিয়া উদ্ধার করেন। গুরু সোহহং বীজ কাণে দিয়া পূর্বদেহ নাশ করে — তুমি দেহ নও আত্মা — এই পঞ্চ ভূতাত্মক — অসৎ, জর, দুঃখ, জরা ও দেহ তুমি নও — তুমি সৎ চিৎ আনন্দরূপ আত্মা এই নিশ্চয়তা জন্মাইয়া দেও।

২৯। সোহহং বীজ দানে শিষ্যের অলৌকিক জন্মলাভ হয়। সেই হেতু সোহহংকে বীজমন্ত্র বলে। সোহহং মন্ত্রের সূক্ষ্মাভাব এই — ব্রজানন্দরূপ শিব, বিষ্ণু বা কৃষ্ণ দেবতা আপন স্বরূপ বোধ করা চাই। অর্থাৎ আমি চৈতন্য স্বরূপ আত্মা সমস্ত জগতের নিয়ন্তা নির্বাহ কর্ত্তা। এই বোধে ধ্যাণ চিন্তা পূজাই সূক্ষ্মভাবের সাধনা। গুরুকে আকার বোধে পূজা ধ্যাণই নিত্য ফলদায়ক নতুবা অনিত্য ফললাভ হয়।

৩০। বাৎসল্য ভাব নিয়ে যে আমায় লালন পালন করে — কৃপা পরবশ হইয়া আমি তাকে ধরা দেই। দ্বাপরে যশোদা মাই এর যেমন কৃষ্ণ দরশন হইয়াছিল। যে যেভাবে আমায় ভজনা করে — আমি সেই ভাবেই তার সাথে একাত্ম হইয়া যাই। যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ।

৩১। সভক্তি সাধন ভজনে মায়াজাল ছিন্ন হয় — পাপ অবিদ্যা দূর হয় — ভগবৎ পদে নিষ্ঠালাভ হয় — নিষ্ঠা হইতে নামে রুচি হয় — রুচি হইতে আসক্তি জন্মে — আসক্তি হইতে ভাবের উদয় হয়। ভাব হইতে প্রেমলাভ হয়। এইখানেই সাধনার সমাপ্তি — ঈশ্বরত্বলাভ।

৩২। ভগবান মঙ্গলময় শান্তিদাতা, এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে অমঙ্গল দূর হয় — অশান্তি থাকে না। দৃঢ়বিশ্বাস আন গুরুর প্রতি।

৩৩। আত্মজয়ী হইয়া জন্ম মৃত্যুর হাত হইতে মুক্ত হও। তোমার জন্ম সফল কর। শ্রী ভগবানের চরণ সেবায় তোমার জীবন অতিবাহিত কর। সংসার সাগরে ডুবন্ত মন ভাসিয়া নির্লিপ্ত হইয়া উঠুক। সাধু গুরুর সেবা পরিচর্য্যায় দেহ প্রাণ ঢালিয়া দেও। তবেই এই নশ্বর দেহের সার্থকতা। নতুবা এই হাড় মাংসময় দেহের মূল্য কি?

৩৪। ভক্তের টান শক্ত টান। সে টান কি আমি এড়াইতে পারি? ভক্ত আমার বড় প্রিয়। ভক্ত আমার প্রাণের প্রাণ। ভক্তের কারণে আসি এ ভুবনে ভক্তজনে করি পরিত্রাণ। ভক্তের জন্যই আমার এবার আবির্ভাব।

৩৫। বৈষ্ণবের পদধূলি পরে গৃহে যার সপ্তকোটি কুল তার হইবে উদ্ধার। বৈষ্ণবকে আপনজন বলিয়া যদি কাহারও প্রাণে সারা দেয় তাহাকে আমার আপন করিয়া লই তাহার সপ্তকোটি কুল উদ্ধার করি।

৩৬। শ্রীগুরুতে ভক্তি স্থাপন কর — ইহাই অতি মঙ্গলের কাজ। ভক্তকে বেষ্টন করিয়াই শ্রীগুরুর দৃষ্টি নিবদ্ধ।

৩৭। সত্ত্বগুণী লোকে যাহা বলে — তাহা মিথ্যা হয় না। গুরুবাক্য অবশ্যম্ভাবী।

৩৮। ভক্তির প্রভাবে ভক্তের সাফল্য অনিবার্য — ভক্ত সর্বজয়ী।

৩৯। বুড়াশিবের শিবরাত্রি দর্শনের ফলে পূণ্য সঞ্চয় হয় — দিব্যদৃষ্টি গোচর হয়, দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। দিব্যজ্ঞান লাভ না হইলে অনুভূতি হয় না।

৪০। শাস্ত্র পুরাণের কথা — সাধুর মঙ্গলময় দৃষ্টি যে দিকে পরে — সে দিকের অমঙ্গল দূর হ'য়ে যায়।

৪১। নাম তরোয়াল হাতে নিয়ে বসে থাক — কোন ভয় থাকবে না। শিবোহহম্ শিবোহহম্ মহামন্ত্র উচ্চারণ কর — দ্বাদশ সিংহের বল সঞ্চার হইবে — জন্ম-মৃত্যু রহিত হইবে।

৪২। সাধু যাহা বলেন তাহাই হয়। সাধুবাক্য কদাচ মিথ্যা হয় না।

৪৩। প্রতিনিয়ত জপের জন্য নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে শিবোহহং এই মহামন্ত্রই ব্যবস্থা। এতে মনের বিক্ষিপ্ত অবস্থা সহজে দূর হয়। সব সময়ই উঠিতে বসিতে শ্বাসের উঠা নামার সঙ্গে সঙ্গেই জপ চলিতে থাকে।

৪৪। ধ্যান গুরুমূর্তিতে অভেদ ভাবে করতে হ'বে। ধ্যান একবার জমে গেল — আর মন স্থির হ'লেই সব ঠিক হ'য়ে গেল। তখন আর এই মায়ার দুনিয়া থাকে না।

৪৫। আমি কৃপা-পরবশ হ'য়ে জীবের চক্ষু স্পর্শ ক'রে চক্ষুদান করি — কণ্ঠ স্পর্শ করে তাহা ভেদ করি। ফলে জ্ঞানের বিকাশ হয় — আমায় চিনতে পারে। আমায় ধরতে বুঝতে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করতে হয় না। কেবল মদর্থে কর্ম করে গেলেই — (মৎদর্শন-মৎকথাশ্রবণ-মৎকীর্তন) — মন আপনিই সংযত হয়। স্বল্পায়ুকলির জীবের জন্য এই সরল পথ। জীবের সর্বভার বিমোচনের জন্য এসেছি। ভক্তি-বিশ্বাস করে মৎদর্শন বুদ্ধি তে এই সুগম পথে অগ্রসর হও। বিষয়

বুদ্ধি দূর হ'য়ে পরম কল্যাণলাভ হ'বে — কর্মফলে পাবে না। পদ্ম-পত্রস্থ জলের ন্যায় পাপ পরিশূণ্য দেহে বিচরণ করবে।

৪৬। শিবোহহম্ শব্দের অর্থ — জ্ঞান। আমি সেই ব্রজানন্দস্বরূপ শিব, এই ভাবে জপ ধ্যান না করে এক কথায় — "শিবোহহম্" জপ করা, অর্থ একই। কোন বিভিন্ন না। শিবঃ + অহম্ = শিবোহহম্ সন্ধি শব্দ। শিব অর্থ পরব্রহ্ম-পরমাত্মা গুরু, আর অহম্ অর্থ আমি।

এই আমি দুই প্রকার — 'বিদ্যা আমি' আর 'অবিদ্যা আমি'। বদ্ধজীবে নিজেকে 'অবিদ্যা আমি' মনে করে। আর মুক্তজীবে নিজেকে 'বিদ্যা আমি' মনে করে। নিজেকে 'বিদ্যা আমি' মনে কর। এই 'বিদ্যা আমি'ই আত্মপর — নিজ আত্মাকে লক্ষ্য করে। দেহ ইন্দ্রিয়াদি মন বুদ্ধিকে লক্ষ্য করে না। 'অবিদ্যা আমি' দেহ ইন্দ্রিয়াদি মন বুদ্ধিকে লক্ষ্য করে। তাই বদ্ধজীব পুনঃ পুনঃ জন্ম - মৃত্যুরূপ - সংসার দুঃখ ভোগ করে। আর মুক্তজীব ইহার কিছুই ভোগ করে না। দেহে থাকিয়াও দেহে নাই — নির্লিপ্ত।

তোমার 'আমিকে' গুরুরূপী-শিবাত্মা ধর। আর গুরু রূপী শিবাত্মাকে নিজ আত্মা আমি ধর। এই অভেদ উপাসনা। এইভাবে অভেদ উপাসনা ক'রে — 'রূপজাল ছিন্ন ক'রে' — মায়ার গণ্ডি ভেঙ্গে সিংহের মত বাহির হ'য়ে পরো। জ্ঞান-ভক্তি না হ'লে — বিবেক বৈরাগ্য না হ'লে — ত্যাগী না হ'লে হয় না। মাছির মত একবার মধুর ভাণ্ডে — আর একবার বিষ্ঠার ভাণ্ডে বসে লাভ নাই। ভোগীর মত জপ তপও করি আবার সংসারও করি।

৪৭। যজ্ঞাহুতি করিবার সময় প্রথমে আচমন অঙ্গন্যাস করিয়া নিজের অভীপ্সিত বর প্রার্থনা করিবে, মনে মনে করজোর করিয়া। যেমন হে অন্তর্য্যামী জ্যোতিস্বরূপস্তক! আপনি অমৃতস্বরূপ, মঙ্গলময় ও শান্তিময়। আমরা বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়া আপনাকে ভুলিয়া থাকি। কিন্তু আপনি নিজগুণে আমাদিগকে ভুলিবেন না। আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া শান্তিবিধানপূর্বক পরমানন্দে রাখুন। স্থূল শরীরে বা- মনে কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট না হয়। হে মঙ্গলময়, মঙ্গল করুন। আপনাকে পূর্ণরূপে বারংবার প্রণাম করি। এইভাবে সরল ও নিজ ভাষায় প্রার্থনা করিবে। তারপর শেষাগ্নি মঙ্গলকারী অগ্নি এই নামকরণ করিয়া পূর্বাপর লিখিত মন্ত্রে তিনটি বা পাঁচটি আহুতি দিয়া নির্বাণ করিবে। 'শান্তিঃর্ভব শান্তিঃর্ভব শান্তিঃর্ভব' বলিয়া জল ছিটাইয়া দিবে, ইহাতে কোন ভয় বা সংশয় নাই। সব রকমে মঙ্গলই আছে।

৪৮। ব্রজানন্দের চরণে যে মাথা নোয়াইয়াছে — তাহার মাথায় আঘাত দিবার এ - সংসারে কেহ জন্মে নাই। যে মাথায় আঘাত দিয়াছে, সে নিজের মাথায় আঘাত ততোধিক খাইয়াছে।

৪৯। ভক্ত আমার প্রাণ। ভক্ত কভু আমার চরণ ছাড়া হয় না। আর আমিও তাদের ছাড়া হই না। গুরুধাম তোমাদের হিতকল্পে প্রতিষ্ঠিত। ভক্ত-ভগবানের মিলন-মন্দির।

৫০। দেশে শান্তি নাই। উল্‌টা বিচার করলি রাম। কোথায় স্বাধীনতা? এ যে পরাধীনতার একশেষ। মালিককে ভুলিয়া গিয়াছে — তাই লোকের এত দুর্গতি।

৫১। তোমার গোপাল — এই ভাব ঠিক থাকিলেই, তোমার সব হইয়া গেল। আর কোন কিছুরই দরকার নাই তোমার। পুতনার মোক্ষ লাভের কথা মনে কর। যার অপার করুণায় বিষের পরিবর্ত্তে অমৃত পাইল। পুতনার রাক্ষসের জন্ম ঘুচিয়া গেল। গোবিন্দের আনন্দময় শরীর পাইয়া তাহার নিজধামে স্থানলাভ হইল।

৫২। তোমাদের হিতচেষ্টা আমার জীবনব্রত। তোমরা আমাকে ভালবাসিয়া স্নেহ করিয়া গোপালভাব লইয়া ভাল ভাল জিনিষ যখনকার যা সব কিছু সেবা দিচ্ছ। তোমাদের ভাগ্যের ত সীমাই আমি পাইনা। কোন পরম শান্তির লোকে ভগবানের কাছে অবাধে যাইবে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

৫৩। ভক্তের অভীষ্ট সিদ্ধি কল্পে ভগবান সততই কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন। সাধুর ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হয়। কারণ এই ইচ্ছা যে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। এই ইচ্ছার গতি ফিরায় কে?

৫৪। শ্রীগুরু দেহতরীর কাণ্ডারী। জ্ঞান মাঝি শক্ত করিয়া হাল ধরিয়া আছেন। কি করে তরী ডুববে? হোকনা সংসার সাগর। আসুক না তুফান ভারি। জ্ঞান মাঝির নৌকা জলে ভাসে, দোলে ডোবে না। সংসারের মায়াজালে, হাসি-কান্নার তুফানে এ জড়দেহ দোলাইবে তাতে ক্ষতি কি? সেই সৎচিদানন্দ তুমি — তোমার ধ্বংস কোথায়? তুমি সৎ — তুমি চিরকাল থাকবে। দেহ অসৎ তাই ক্ষণস্থায়ী। সৎ যাহা তাহা গ্রহণ কর — অসৎকে বর্জন কর। তুমি সৎ — তোমার শান্তি অশান্তি কি? এই মরদেহেরই শান্তি অশান্তি জরা-ব্যাধি।

৫৫। শান্তি-অশান্তি — জরা-ব্যাধি এই সব চিন্তা অণুক্ষণ কর বলেই ক্ষণস্থায়ী বস্তুতে আসক্তি থাকিলেই নানা প্রকার ভয় উদ্বেগ হইয়া থাকে। সৎ কার্যে, সৎ বস্তুতে

আসক্তি রাখ — তাহাতে ডর ভয় নাই। মনে মনে বলবে আমি সৎ কার্য করিয়াছি — আমার আবার ডর ভয় কি? সচ্চিদানন্দের ধ্যান ধারণা ছাড়া শান্তি কোথায়? সচ্চিদানন্দের পূজা-অর্চ্চনাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তা হইলে কোন অবস্থাতেই দুঃখ কষ্ট হইবে না। সংসারে থাকিয়া নির্লিপ্তভাবে গুরু সচ্চিদানন্দকে পাইতে হইবে। তবেই জীবন চিরসুখের। সংসারের হাসি-কান্নায় ক্লেশ পাইতে হইবে না।

৫৬। 'গুরু' পাঞ্জাব মেইল। সেই মেইলে নাম-টিকেট কাটাইয়া উঠিয়াছ। এখন তাস-পাশা খেলে যাও বা ঘুমাইয়া বসিয়াই যাও পাঞ্জাব পৌঁছিতে হইবেই। এই হল গিয়ে সৎ গুরুর ব্যাপার। তবে আর চিন্তা কি? আনন্দম্, আনন্দম্, আনন্দম্। আমিইত সব করে নিব। ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

৫৭। রাখে কৃষ্ণ মারে কে? কে বুঝিবে তোমার লীলা — জলেতে ভাসাও শীলা — কর ঘোড়া — গাধা পিটায়ে। কাঠ-বিড়ালী সাগর বাধে ডুবে অতল জলাশয়ে! বিধাতার বিচিত্র লীলা।

৫৮। জয় ব্রজানন্দ হরে। নাম তরোয়াল হাতে নিয়ে বসে থাক। বিপদ আপদ কিছুই থাকবে না।

৫৯। পুতনা কৃষ্ণের ধাইমা হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইল। আমার মাঈরা মায়ার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে। ভরসা রাখ, নির্ভয় নিশ্চিন্ত হও।

৬০। আমার বাক্য অমোঘ। একবার যে বাক্য বাহির হয় — তা আর ফিরে না। সাধুকা বাত — হাতীকা দাঁত। হাতীর দাঁত বাহির হইলে আর ফিরে না। তেমনি সাধুর জীব-কল্যাণ বাক্য অমোঘ। আমার শতং জীব এই বাক্য অমোঘ। আমার সর্ব্বরোগারোগ্যম্ আশীর্ব্বাদ অমোঘ।

৬১। অসুখ বিসুখ কি করিতে পারে? দেহ ঘরের খুটি শক্ত করিয়া লও। ঝড় তুফানে কিছু করিতে পারিবে না। নাম তরোয়াল হাতে রাখ।

৬২। ভগবানে ও তাঁর অবতারে বিশ্বাস মহাভাগ্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। উদ্ধার অবশ্যম্ভাবী।

৬৩। আমার ভক্ত আমার সুশীতল শান্তিময় কোলে স্থানলাভ করে। আমার সত্যবাণী।

৬৪। কৃপার অধিকারী না হইলে দর্শনলাভ হয় না। কৃপা না হইলে আমার দর্শন দিবার শক্তি নাই।

৬৫। প্রণব চিন্তন বা ধ্যান গুরুমূর্ত্তির পৃথক বোধ করিও না। অর্থাৎ আমি এক — প্রণবাদি গুরুমূর্ত্তি আর এইরূপ দ্বৈতভাব নিয়া উপাসনা করিও না। আমি এবং

আমার উপাস্য অভেদ — এই ভাব ধারণ করিয়া লও। তুমি এবং তোমার উপাস্য এক না হলে — উপাস্যে মিশিয়া একাকার হইবে কেমনে? নানা নাম আর রূপ সকল তোমাতে কল্পিত। নাম রূপ উপাধি সকল পরিত্যাগ করিয়া — সার বস্তু তোমার আত্মা পরমাত্মা স্বরূপ জানিয়া ধ্যান কর — তাহার নানা নাম নানা রূপ শব্দ লইয়া বৃথা অশান্তি ভোগ করিওনা। গুরুকে অকার জানিবে অর্থাৎ অশরীরী, কায়া-রহিত বোধে ভজন করিও। আমার ভক্তের আমার মূর্ত্তির জন্য ভাবনা কি?

৬৬। মন খোলা — হাত খোলা — আমার প্রকৃত রূপ।

৬৭। সার্ব্বভৌম দেবালয় — জগৎ জোরা। ব্রজানন্দ নব যুগের নব অবতার। ভক্ত সার্ব্বভৌম ধর্ম প্রতিষ্ঠার ভাব পায়। সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ে কলির যুগ ধর্ম্ম।

৬৮। গুরু যদি সহায় থাকে — প্রসন্ন হয় — হাজার মাইল দূর থেকেই শুভ করতে পারে।

৬৯। আমি কুয়া খুদিনা — আমার ভক্ত পাতালে যাবে না। আমি মঠ তুলি — আমার ভক্ত ব্রহ্মলোকে যাবে।

৭০। ভক্তের শক্তি না পেলে — ভগবান শক্তি কোথায় পাবে? ভক্তের শক্তিতেই ভগবান বলীয়ান। ভক্তই ভগবানকে গড়ে তোলে।

৭১। ব্রজানন্দ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। হাম্ যো তুম সো — সর্ব্বত্রই রাম। যাহা যাহা আঁখি কোরে তাহা তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে। যে দিকেই আঁখি যায় — সে দিকেই কৃষ্ণ।

৭২। গুরু দেন বৈরাগ্য — মন ভোগের দিকে। তার হলনা। গুরু দেন ছেড়া কাথা আর রুটি — মন ভোগের দিকে। তার হলনা। কবে মোরে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে — সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে। এই ভাব ধর।

৭৩। গুরু ভিন্ন আমার গতি নাই। তাই গুরুর চরণে সব সমর্পণ করে বসে আছি। একান্ত স্মরণ।

৭৪। তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট। তুমি সুখময় তুমি সুখে থাক। এইই ভক্তের কথা।

৭৫। ভক্তি নিষ্ঠা চাই। সাত খানে কুয়া খুদলে কি হবে? সাত খানে কুয়া খুদ্‌লে কি আর জল পাওয়া যায়? বিশ্বাসে ফল পায়। ছুটা ছুটি করলে কি হ'বে? ভক্তি আনতে হ'বে — ভগবৎ বুদ্ধি আনতে হ'বে। পুরাপুরি বিশ্বাস চাই।

৭৬। যিনি ব্যাধি দিয়েছেন — তিনিই ব্যাধি হরণ করতে পারেন। ডাক্তার কবিরাজ কি করবে? ভাব নিয়ে ভাবতে হবে — তবে ত ফল হ'বে। ভাব ভক্তি চাই।

৭৭। চাহনির শেষ কর। চাহনি শেষ হ'লেই পাইয়া যাইবা। চাহনির শেষ কর।

৭৮। প্রাতঃকালে শিবং দৃষ্টা নিশিপাপং ন বিদ্যতে। মধ্যাহ্নে আজন্মকৃতং পাপং সায়াহ্নে সপ্ত জন্মনয়।

৭৯। প্রতিমায় শীলা বুদ্ধি — মন্ত্রেতে অক্ষর বোধ — গুরুতে মানুষ বুদ্ধি। নরকে যাবার পথ।

৮০। সৎ কর্মের প্রভাবে সঞ্চিত প্রারব্ধের অল্পাধিক লাঘব হয়। যেমন দশ বৎসরের কয়েদী দশ বৎসর কারাবাসের পূর্বেও মুক্তি পায়। ক্রিয়মান প্রারব্ধের লাঘব হয় না। যেমন ধনুক হইতে তীর একবার ছাড়িয়া ফেরান যায় না।

৮১। গুরু সহায় থাকিলে — আগুনে পুড়বে না — জলে ডুববে না — ছাই মুঠ করলে সোনা হবে।

৮২। নাম নৌকা — নদী পার করে — ভবসাগর পার করে।

৮৩। শ্রীদেহের কুশল জিজ্ঞাসার উত্তরে — ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট — রুষ্ট তুষ্ট ক্ষণৈঃ ক্ষণৈঃ।

৮৪। কৃপালাভ করতে হলে — নাম করতে হয় — জয় গুরু — জয় গুরু। আল্লা হরি করলে হবে না। হয় আল্লা না হয় হরি — এক আশ্রয়ে থাক।

৮৫। গোচনায় নারায়ণ শুদ্ধ হয়। দানপুণ্যে মনের ময়লা দূর হয় — দেহের পাপ ক্ষয় হয়।

৮৬। সাধুর দশজনের সঙ্গে কারবার, সকলের — সঙ্গে এক রকম ব্যবহার। তা না হলে কেমন সাধু?

৮৭। মেয়েদের কাজ সংসার দেখা — চাকুরী করা ভাল না — প্রজনন শক্তি নাশ হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি কোন সমস্যাই না।

৮৮। পাশ্চাত্য আদর্শে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার — বিষয়াভিমুখী বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত — অর্থোপার্জনে লক্ষ্য। ফলে সংসারের কাজে উদাসীন সংসারে বিশৃঙ্খলা।

৮৯। গুরুকে সব সমর্পণ করতে হয় — স্মরণাগত হইতে হয় — গুরুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হয়। তবেই গুরু রক্ষা করেন। স্ত্রীর যেমন স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হয় — তবেই স্বামী ভালবাসে। সংসার দিয়াই ভগবৎ রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

৯০। ভজ ভজ ভজ ভাই শ্রীগুরুর চরণ — মদ মোহ ছাড়ি লও শ্রীগুরুর স্মরণ।

একান্ত স্মরণ — একান্ত স্মরণ লও। সব সহজ হয়ে যাবে। শ্রীগুরুর চরণে স্মরণ লও সব সহজ হয়ে যাবে।

৯১। কর্তা সাজবে না — কর্তা হওয়া বড় কঠিন — সোজা না। কর্তার সব দিকে দৃষ্টি রাখতে হয় — পারবেলা কাণ্ডারী কর তাঁহারে — তবেই তোমার সব সহজ হয়ে যাবে।

৯২। ভগবানকে কি করে জান্‌বে? ভগবানকে জানতে হলে — চেষ্টা করতে হয় — সাধনা করতে হয়। 'সর্ব ধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং স্মরণং ব্রজ' এর মর্ম উপলব্ধি করতেই সারা জীবন যায় কেটে। সারা জীবন চিন্তা করনা কি খাব — কি খাব? ভগবানকে জানবে কি করে?

৯৩। গুরুদত্তকাত্বী বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করে। ভক্তি বিশ্বাস নিয়ে ধারণ করবে। কণ্ঠী বডি গার্ড।

৯৪। সংসার সমুদ্র — কেবলই তরঙ্গ — কেবলই তরঙ্গ। সারা জীবন খাটনী খেটে — একটার পর একটা আছেই আছে। ভূতের কাছে ছুটা ছুটী। গুটান যায় না। ছেলে নাই — ঠাকুর দেবতার কাছে মানত করে। ছেলে হইল-চিন্তা ছেলে বাঁচবেত? ঠাকুর দেবতার কাছে মানত করে। ছেলে বড় হইল — চিন্তা ছেলে মানুষ হবেত? এর পর-ছেলে পরীক্ষা পাশ করবেত — ভাল চাকরী হবেত — মনের মত পুত্রবধু হবে কি? একের পর এক আর শেষ নাই। ভুতের সাথে দৌড়া দৌড়ি। সংসার কেউ গুটাতে পারে না। সংসার সমুদ্র — দশ কলসি ঢাল আর তোল — সমান।

৯৫। দিন নাই ক্ষণ নাই। যার ঘরে গুরু বিরাজ করেন তার সকল তিথিই সকল বারই শুভ। যার ঘরে গুরু বিরাজ করেন না — তার সকল তিথিই সকল বারই অশুভ।

৯৬। বিশ্বাসে সব হয়। আমি তুলসী চন্দন শালগ্রাম শীলা চরণে লই — আমার পুরোপুরি বিশ্বাস — আমি সেই। যার এই বিশ্বাস নাই সে ভস্ম হয়ে যাবে। নজরের ভয়ে সবাই নিভৃতে সেবা গ্রহণ করে। আমি হাজার হাজার চোখের সামনে বসে সেবা লই। আমার একটুও নজরের ভয় নাই। আমার পুরাপুরি বিশ্বাস আমি সেই।

৯৭। লাভ লোকসান আসলে সমান। ভাঙ্গা গড়া সংসারের নিয়ম। গুরু সহায় থাকলে — আর একখানা দিয়ে দেয়। একখানা নিয়ে গেলে — গুরু আর একখানা দিয়ে দেয়।

৯৮। আমাকে যে চায় — আমাকে সে পায়। বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ। প্রহলাদের বিশ্বাস আমার হরি থামের ভিতর। ভক্ত হনুমান জয় রাম বলে সাগর পার হয়ে গেল। মারিচ রাম রাম করতে করতে রাম হয়ে গেল। ভক্তি বিশ্বাসে সব হয়।

৯৯। তুমি শুধু আমার চিন্তা কর। আমি সকলের চিন্তা করি। আমি স্থানান্তরে গিয়েও — সব সময় ভাবি কে কেমন আছে।

১০০। ব্রজানন্দ বায়ু। তার গতি কে রোধ করে? স্মরণ মাত্র আমি তোমার অন্তরে বিরাজ করি। ঝড় তুফানে আমার গতি রোধ করতে পারবে না।

১০১। ভক্ত যায় আগে আগে, আমি যাই তার পাছে পাছে। শেষের দিনের সাথী আমি। শেষের দিনের সাথী আর কেহই হ'বেনা।

১০২। ধর্ম ভিন্ন বিদ্যা, ধন অকর্মন্য। ধর্ম ভিন্ন বিদ্যা অবিদ্যা, ধর্ম ভিন্ন ধন নিরর্থক।

১০৩। অভিমান সুরাপান। সাধুর ধর্ম অভিমান শূন্য হওয়া।

১০৪। রজোগুণ ত্যাগ কর — সত্যে প্রতিষ্ঠিত হও। আমি ভক্তের সেবা করে যাচ্ছি। অসুস্থ অবস্থায় শিষ্যদের হাসিমুখে, বিদায় দেই। দেহের জ্বালা ভুলে যাই। এক মুহুর্ত্তের শান্তি নাই। ভক্তের পাছে পাছে আছি। নিস্তার নাই। স সহহি দুঃখ পরহিত লাগি। পর দুঃখ হেতু অনন্ত অভাগী।

১০৫। স্বাস্থ্য সুখ অমৃত তুল্য। স্বাস্থ্য সুখ না থাকলে সব বৃথা। স্বাস্থ্য সুখ বিনা ধন জন কিছু না।

১০৬। প্রসাদে হরি-ভক্তির উদয় হয়। প্রসাদস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। প্রসাদে সর্ব দুঃখাণাং হানিঃ।

১০৭। পরিষ্কার করে এসেছি, কিছু রেখে আসিনি। ভাঙ্গা-গড়া আমার স্বভাব। একবার ভাঙ্গি একবার গড়ি। আমার স্বভাবই এই।

১০৮। তোমার আমার একই। আমার মনে থাক বা না থাক, তোমার মনে থাকলেই হইল।

১০৯। গুরুদেব বিনা নাহি ভাগ জাগে। গুরুদেব বিনা ভাগ্য জাগাইবার কারও শক্তি নাই। বন্দুকের হাত থেকেও প্রাণ বাঁচে, গুরুর নামে ভূত পালায়।

১১০। অসাধু রাজশক্তি। কে করে তারে কে মারে। সাধু হত্যা, ভিক্ষালব্ধ ধন অপহরণ! তা না হ'লে অসুর বিনাশ হ'বে কেন? পবিত্র উদ্দেশ্য জীব কল্যাণকর। বেতালেও ব্রজানন্দের পা পড়েনা।

১১১। রাজ ধর্ম প্রজা-পালন, প্রজা পীড়ন নয়। রাজ ধর্ম পালন না করে অসুর বৃত্তি। এই হ'বে ধবংসের কারণ। যুগে যুগে তাই হয়েছে।

১১২। ভাগ্য কামাই কইরা না আইলে ভাগ্য পাওয়া যায় না। ভাগ্য কামাই করতে হয়।

১১৩। সংসার স্বপ্ন। স্বপ্ন আর সংসার একই। এই আছে এই নাই। স্বপ্ন দেখতে দেখতে যেমন স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, কিছুই থাকেনা। সংসারটাও তেমনি। স্বপ্নের চেয়ে কম না। অজ্ঞান কালে সত্য বলেই মনে হয়। জ্ঞান হইলে সবই মিথ্যা, কিছুই না। এই স্বপ্ন-জগৎ সাজাইতেই কি কম পরিশ্রম? এক চুল এদিক ওদিক হইলে প্রাণান্ত হইতে হয়। প্রাণপাত করতে হয়।

১১৪। ধর্মের লক্ষণ মন সংযম, ইন্দ্রিয় সংযম, সত্য ও অক্রোধ।

১১৫। চরণামৃত সেবনে অকালমৃত্যু হয় না।

১১৬। সাধু কোন অপরাধ করে না। সাধু নিরপরাধ, কোন ভোগে নাই, বিলাসিতায় নাই।

১১৭। পথে মন্দির, আশ্রম, বিল্ববৃক্ষ, বটবৃক্ষ উল্লঙ্ঘন করে যাওয়া অশুভ লক্ষণ।

১১৮। 'চরণামৃত পান করিলে মানুষ অমর হয়' এই বিশ্বাস না থাকিলে ক্রিয়া করেনা। এক সময় এক গুরু তাঁর প্রিয় শিষ্য এক রাজার বাড়ী এলেন দর্শন দিতে। রাজা রাণী পরমসমাদরে গুরুর সেবা পূজা করেন। সময় হ'লে গুরু যাত্রার প্রস্তাব করেন। রাজা রাণী 'আজ থাকুন', 'আজ থাকুন' করে এক বৎসর অতীত হ'লে, অবশেষে গুরু বলেন, আরও শিষ্য আছে একস্থানে আর থাক্‌লে তাদের কি করে দরশন হ'বে? গুরুদেব আসন গুটাইলেন। রাজা যাইয়া রাণীকে সংবাদ দিলেন গুরুদেব আজ যাচ্ছেন। রাণী বললেন, গুরুদেবকে যাইয়া বল আজের দিনটা থাকুন;কাল যাবেন। রাজা গুরুদেবকে এই নিবেদন করলেন। গুরু আসন পাতলেন। রাণী গুরুদেবের যাওয়া বন্ধ করতে মনস্থ করলেন। ছেলেকে বিষ খাওয়াইলেন; ছেলে মারা গেল। এখন আর গুরু যেতে পারবেন না। অন্দর মহলে কান্নাকাটি। গুরুদেব গেলেন অন্দর মহলে। তিনি কান্না কাটি শুনে চিন্তিত হলেন তিনি দেখেন রাজা-রাণী হাসি-খুশী। গুরুদেব এই দেখে অবাক। রাজা-রাণী বিশ্রাম্ভালাপ করছেন। এ কি আশ্চর্য্য, যুবরাজ মারা গেল! এই বলতেই রাজা-রাণী বললেন, তুমিত আছ। তুমি থাক্‌লেই হ'ল। এই বলিয়া চরণামৃত খাওয়াইলেন। যুবরাজ প্রাণ ফিরে পেল। গুরু ভাবেন এমন শিষ্য পাব কোথায়? এই সৎসঙ্গ ছেড়ে কোথায় যাব? জীবনে এই স্থান ছেড়ে আর আমি কোথাও যাবনা। এমন ভক্তি বিশ্বাস কোথায় পাব? চরণামৃতে মরা মানুষ বাঁচে। বিশ্বাস এমন জিনিষ। কি কৌশল অবলম্বন করে গুরুদেবের যাওয়া চিরতরে বন্ধ করে

দিল। ধন্য গুরুভক্তি, ধন্য বিশ্বাস। গুরু ভাবেন এমন গুরুভক্তি আমি কোথায় পাব।

১১৯। আমার ইচ্ছার সাথে তোমার ইচ্ছ মিলাও; ফল আশু হবে। ভক্ত দিয়াই ভগবানের পরিচয়। আমার চেয়ে আমার ভক্ত বড়। আমার কি মূল্য আছে? আমার চেয়ে আমার ভক্ত বড়!

১২০। নাম মহৌষধি। নামে রোগ সারে। নামে ভক্তির উদয় হয়।

১২১। ওসমান আলী সমস্ত এশিয়া খণ্ড জয় করেছিল। কাবুল রাজ্য তখন জয় করতে যায়। কাবুলের রাজা ও রাণী তাকে দেখতে গিয়েছিল ওস্‌মান আলী কেমন লোকটি, সমগ্র এশিয়া জয় করে এল। তার শিবিরে প্রবেশ করল। দেখে বড় বড় এক একটি তাবু, পতাকা উড়ছে। জাঁক জমক দেখে ভাবে এইখানেই ওসমান আলী থাকেন। জিজ্ঞাসা করে জানলেন এটি তাঁর কমাণ্ডারের বাসস্থান। অপর একটি ছোট তাবু দেখে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তর এলো এখানে তার জেনারেল থাকেন। অপর একটি তদ্‌পেক্ষা ছোট তাবু দেখে জিজ্ঞাসা করে জানলেন এখানে তাঁর ক্যাপটেন থাকেন। পর পর মেজর, লেফণ্টেনাণ্ট, হাবিলদারের ক্যাম্প দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "তবে ওসমান আলী থাকেন কোথায়? বাদশা ওসমান আলী থাকেন একটা অনাড়ম্বর ছোট তাবুতে — দেখতে নৌকার ছৈয়ের মত। তার মধ্যে একটা মাদুরে হাটু গেড়ে বসে আছেন। দেখে বিশ্বাস হল না। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনিই কি বাদশা ওসমান আলী, সমগ্র এশিয়া জয় করেছেন? বাদশা উত্তর দিলেন, "আমি প্রজার ভৃত্য, রাজার কর্তব্য পালন করি মাত্র" রাজা বিষ্ণুর অবতার। আর এখন আমরা কি দেখি? প্রজা পালন নয়, প্রজা পীড়ন।

১২২। সমস্ত শক্তির মূলই হইল ধর্ম। জগৎটা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত না হইলে শক্তির উৎসই অবলুপ্ত হইত। ধৈর্য্য একটা ধর্ম। মানুষ ধৈর্য্যশীল হবে। বজ্র মাথায় পড়লেও চঞ্চ ল হবে না। ধৈর্য্য যা ধারণ করবে তা আজীবন ছাড়বেনা। তাকেই বলে ধর্ম। ক্ষমা একটা ধর্ম। তোমরা মনে কর প্রস্তর মূর্ত্তির উপরে, ধাতুময় মূর্ত্তির উপরে, কাষ্ঠের মূর্ত্তির উপরে ফুল জল ছিটাইলেই ধর্ম হয়। ক্ষমা ধর্ম — হাজার অপরাধ করে থাকুক, মহাপাপী মহতের কাছে গেলে ক্ষমা পায়। দয়া ও ইন্দ্রিয় যার হাতের মুঠে — বশে, সেই হল ধার্মিক। চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা ত্বক, দশ ইন্দ্রিয় যার বশে বাক্য হস্ত পদ গুহ্য লিঙ্গ, চক্ষু, ত্বক, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ

কর্মেন্দ্রিয় যার বশে সেই একমাত্র ধার্মিক। ধার্মিক ব্যক্তি কখনও পরস্বাপহরণ করে না। অচৌর্যবৃত্তি তার। এই হ'ল ধার্মিকের লক্ষণ। ধার্মিক ব্যক্তি কখনও কাউকে কটুকথা বলে না। মন সংযম — যে মনকে জয় করতে পেরেছে সেই একমাত্র ধার্মিক। যার মনে কুচিন্তা কুভাব হয় না। অসৎ চিন্তা মনে স্থান পায় না যার, সেই মনোজয়ী। অচৌর্যবৃত্তি পরায়ণ ধার্মিক ব্যক্তিও শুচিই হবে। ফুল ছিটাইলাম, নাম জপ করলাম, ধার্মিক হইলাম। দেহ শুদ্ধ না, মন শুদ্ধ না, মালাজপ করলাম! "হরি হরি বলে — কাপড় গুটায়।" ভোজন করে ষোলবার কুলকুচি করবে, তবে মুখ শুদ্ধ হবে, একবারে দুবারে মুখ শুদ্ধ হয় না। শুচি — অন্তর শৌচ, আর বাহ্য শৌচ। দুই প্রকার। বাহ্য শৌচ যেমন কুলকুচি, মলমূত্র ত্যাগের পর জলব্যবহার, নিত্যস্নান বাসি বস্ত্র ধৌত, অঙ্গ মার্জনা। অন্তর শৌচ — সত্য কথা কইবে, মনকে শুদ্ধ করবে। মিথ্যা কথা বললে মন অশুদ্ধ হয়। ধার্মিকের লক্ষণ বিদ্যা, আত্মজ্ঞান, ধী, ভগবানে বিশ্বাস, গুরুতে বিশ্বাস। ধার্মিক ব্যক্তি আত্মজ্ঞানী হবে, গুরুতে বিশ্বাসী হবে, ভগবানে বিশ্বাসী হবে, সত্য সেবন করবে, সত্যের আশ্রয় নিবে, অক্রোধী হবে। এই সবই ধার্মিকের লক্ষণ। এই সব গুণ যার ভিতরে আছে সেই ধার্মিক। এই সবই এখন বিদায় নিয়েছে। এই সব ধর্ম সংসার হতে বিদায় নিয়েছে। পশুবলের পাবল্য ঘটেছে। তাই এখন মানুষ মানুষকে মারে। মানুষের এখন পশুর স্বভাব। পশুর আচরণ। সত্য, অক্রোধ। ক্রোধ বিনাশের মূল। ক্রোধের বশীভূত হইয়া, দেশ ছারখার করে। সাজান গোছানো দেশ শ্মশানে পরিণত করে। ক্রোধঃ বিনাশস্যহি মূলম্। ইন্দ্রিয়াদি কোনটাই বশীভূত নয়। কাজেই দেশ শ্মশানে পরিণত। অবশীভুত ইন্দ্রিয়াদি! — ফল ধবংস।

গুরুদেব বিনা নাহি ভাগ্ জাগে;
গুরুদেব বিনা নাহি প্রীতি জাগে;
গুরুদেব বিনা নাহি শুদ্ধ হৃদম্।
গুরুদেব বিনা নাহি মোক্ষ পদম্।

১২৩। ভক্তি মহারাণী। অসম্ভব সম্ভব ঘটায়। অঘটন ঘটায়। ভক্তি রাখ। বিশ্বাস রাখ।

১২৪। গুরুময় ভূমণ্ড ল। গুরুর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হইতে পারে না। গাছের পাতাও পড়ে না গুরুর ইচ্ছা ছাড়া।

১২৫। আনন্দময় জগৎ। আনন্দম্! আনন্দম্! সৃষ্টি স্থিতি লয় আনন্দম'য়। কেবলই আনন্দ। সুখ দুঃখ বলে কিছু নাই। সুখ দুঃখ মানুষের কল্পনা। কল্পনার সুখ দুঃখ ভোগ করে মানুষ।

১২৬। নারায়ণ, শিব দুই না। যেই নারায়ণ সেই শিব। নারায়ণও বড় শিব ও বড়। নারায়ণ, শিব ভিন্ন মনে করোনা।

১২৭। লভিতে ফণির মণি থাকে যদি মন, তবে পারিবে কি সহিতে দংশন? ভেবে দেখ। সংসার পেতেছ ধবংসের সামিল হয়োনা। অজ্ঞ নাবিকের মত সংসার করতে নেই। ভবসিন্ধু—সংসার ভবসিন্ধু। ধীর স্থির নয়। অজ্ঞ নাবিকের নৌকা কুলে পৌছায় না। আবর্ত্ত-সঙ্কুল। ঘূর্ণিপাক আছে। তরঙ্গ পাক দিয়ে উঠ্ছে। বুঝে সুজে চল—হুঁসিয়ার নাবিকের মত।
হুঁসিয়ার নাবিকের দরকার। যেমন তেমন নাবিক না। সংসার বুঝে সুজে করতে হয়।

১২৮। সাপের দন্তে বিষ। সাপের সঙ্গে খেলা করতে হ'লে—বিষ-দন্তটা উৎপাটন করে ফেলতে হবে। তারপরে সাপ নিয়ে খেলা করতে হবে। আগে বিষদন্ত ফেল। সংসারেরও বিষ-দাত আছে। আগে সেই বিষ-দাতটা ভেঙ্গে সংসার কর—মজা পাবে।

১২৯। ভগবানের কাজ যে করতে পারে—সেই ভাগ্যবান। দশজনকে যে পালন করে—সেই ভগবান।

১৩০। সাধুর চরিত্র-মুদ্রা বোঝে কে? গুরু নানক বলেন—ষিন্ ঢোঁরে তিন্ পায়। যে খোজে সেই পায়। অপরে নয়।

১৩১। বৈকুণ্ঠ—যেখানে কোন কুণ্ঠা নেই। ভগবানের উদয়। দীন-দুঃখিওকা হিতৈষী-ভগবান।

১৩২। নিয়ম, ন্যায়, নীতি পাপে নাশ হয়। পাপে সমস্ত দুঃখ আনে। দেহের পাপ দূর হয় দরশণ-পরশণে।

১৩৩। আমি কভু আমার না। সব কিছুই তুমি। দ্রৌপদী যতক্ষণ বুঝতে না পারছিলেন, কাপড় ধরে টানাটানি করছিলেন। না পেরে টানাটানি ছেড়ে দিলেন। বুঝতে পারলেন, "আমি কিছুনা, আমি কোন শক্তি না।" যখন কাপড় টানাটানি ছেড়ে স্মরণ নিলেন তখন রক্ষা পেলেন।

১৩৪। নামের আশ্রয় নিলে—কর্ম্মভোগ সহজে কাটে। না হ'লে কর্ম্মভোগ কাটে না।

১৩৫। ওঁ নমো শিবায়! ওঁ নমো শিবায়! ওঁ নমো শিবায়! শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে; নিবেদয়ামিচাত্মাণং ত্বং গতি পরমেশ্বরং।

১৩৬। সবাইকে সমান চক্ষে দেখ। প্রত্যেকের প্রতি সমান ভাব রাখ। ফুল-জল ছিটান—এগুলি কিছুনা। দন্দ মিটাও। সবাইকে সমান চক্ষে দেখ। এই ধর্ম্ম।

১৩৭। সংসার আনন্দময়। ভগবান কি না দিয়েছেন? তবু ভাইয়ে ভাইয়ে দন্দ। পিতা-পুত্রে মিল নেই। স্বামী-স্ত্রীরও মিল নেই।

১৩৮। গুরুকে সাথে করে সংসার করতে হবে। সংসারে এসেছ মুক্ত হতে, বাধা পড়তে নয়। সংসার মুক্তিক্ষেত্র। দেবতারা ইচ্ছা করেন সংসারে আসতে। মুক্তি-লাভের অধিকারী হ'তে সংসারে আসতে হয়। মনুষ্য-যোনি মুক্তির পথ, মুক্তিক্ষেত্র। বাঁধাপ্রাপ্ত হতে না হয়, এ-রকম করে সংসার করবে। সংসারে এসেছ মুক্তি-লাভের জন্য। ভগবানকে সাথে করে সংসার করবে। গুরুকে সাথে করে সংসার করবে। সেটা সংসার নয়। মুক্তিরই কারণ।

১৩৯। আনন্দময়ী মা-ভুখায়িত অবস্থা-অচেতনা ভাব। কয়েকটি নিষ্কাম ভক্ত তাঁকে প্রতিষ্ঠা করে। চতুর্দ্দিকে তাঁর প্রচার হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও ভুখায়িত অবস্থা ছিল। অচেতন ভাব।

১৪০। গুরুর অপার মহিমা। বহ্নিকে পবর্বত, পবর্বতকে বহ্নি বানাতে পারে।

১৪১। সংসার কর্ম্মবহুল—ঘটনা-প্রবাহ জটিল। এই সংসারের রূপ।

১৪২। অধর্ম্মে দুঃখ—ধর্ম্মে সুখ। অধর্ম্ম না করলে দুঃখ আসতে পারে না। দুঃখ হবে কেন? দুঃখহারী সন্তানের দুঃখ দূর করেন। এই জন্যই পিতা। অধর্ম্ম ছেড়ে দাও। দুঃখ আপনিই পালাবে।

১৪৩। অহং থাকতে প্রভুর দরশন হয় না। অহং নাশ কর—প্রভুর দরশন পাবে।

১৪৪। ভবসিন্ধু উত্তাল তরঙ্গময়—আবর্ত্ত-সঙ্কুল। পাক দিয়ে দিয়ে তরঙ্গ ওঠে। স্থির-ধীর নয়।

১৪৫। নামের নেশা নামই হয়—নেশাতে হয় না। নাম যেমন-তেমন বস্তু না।

১৪৬। জীবভাব নিয়ে ধর্মস্থানে এলেও শান্তি পাবে না।

১৪৭। গুরুশে কপট্-সাধুসে চুরি। গুরুর সঙ্গে কপটতা—সাধুর দেবধন চুরি।

১৪৮। চিকিৎসা যে যা করুক—ভগবান সাথে না থাকলে কিছু হয় না। চিকিৎসা ভগবানকে সাথে রেখে করতে হয়; তবে চিকিৎসা ফলবতী হয়।

১৪৯। একমাত্র গুরুর ইচ্ছায় জগৎ পরিচালিত। তিনিই একমাত্র জগতের স্রষ্টা—নিয়ন্তা—তাঁতেই লয়প্রাপ্ত হয়।

১৫০। আসা অর্থ জন্ম সার্থক করা। নইলেত আসা বৃথা। বিবাহ ন কার্য্যায়। বিবাহ ধর্ম্মায়। দুইএ মিলে ধর্ম্ম করা। বিবাহের উদ্দেশ্য ধর্ম্ম অর্জনের জন্য।

১৫১। ন চ দৈবাৎ পরম্ বলম্।

১৫২। ভবসিন্ধু—সংসার ভবসিন্ধু। আবর্ত্তময়—উত্তাল-তরঙ্গ-ময়। চরণ-ছাড়া হইও না।

১৫৩। দাহ্যমান ইতি দেহ। সব সময় জলছে—কেবল জলছে।

১৫৪। কাঠের নৌকা ডুবে যায়। ধর্ম্মের নৌকা ডোবে না।

১৫৫। সংসার সাগরের খরস্রোতে গা ভাসাইও না। দেহ-তরী ভাসাইয়া দিও না।

১৫৬। প্রেম আর সেবা এই দুই-ই বস্তু। আর সব অবস্তু।

১৫৭। পুট্‌লি নিয়ে যেতে পারে না। সারা জীবন পুট্‌লি বানাবা—নিয়ে যেতে পারবা না। ফালাইয়া যাইতে হইব। পুট্‌লি বাইন্দ না। আমিও পুট্‌লি বান্দছিলাম। এই দেখ। একশত টাকার, পাঁচশত টাকার নোট ২৮,০০০ টাকা। এই দেখ পুট্‌লির দশা। এই দেখ পুট্‌[illegible]র দশা—যা নিয়ে যেতে পারব না। যা পার ভগবানের সেবায় লাগাইবা।

১৫৮। গুরু যদি সঙ্গের সাথী হয়—যাওয়া স্থায়ী হয়। যাওয়ার মত যাওয়া। আর আসতে হয় না। পুট্‌লী থাক্‌লে - যাতায়াত কেবল যাতায়াত। আর [illegible] তাও দেখ্‌ছ। পুনরপি জনমম্ পুনরপি মরণম্। হে মুরারি ত্রাণ কর। বার বার আসা কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

১৫৯। যে কোন কাজ গুরুর। গুরুর চরণ অমূল্যধন। খরিদদার নাই। লক্ষ টাকা। যার তার কাম না। বড় বাপের বেটীর কাম। অমূল্যধন—গুরুর চরণ। এক লক্ষ টাকা চাই।

১৬০। বিষয়ে বিকার। বিষয় থাকবে—বিকার থাকবে না। বিষয়ে বিকার—বিষয়ানল। বিষয়ানল।

১৬১। ধর্ম্ম-পথে শত-বাধা। জটিলা কুটিলা হয় বাদী। কৃষ্ণ-সেবার বাদী। চিরকাল বাধা। ননদিনী-তুই বল্‌গে যা নগরে—ডুবেছে রাই-কলঙ্কিনী কলঙ্ক সাগরে।

১৬২। ব্রহ্মনাম যার কানে—তারে যমে ছোবে না।

১৬৩। গুরুনাম মহা পবিত্র নাম। এই নাম নিয়ে যে যেমন ব্রতী হবে—সে সেই কাজে জয়ী হবে।

১৬৪। সব তিথি সুতিথি—সব বার সুবার বলা যায়। গুরুনাম এমন পবিত্র নাম। তাঁর নাম করে গেলে জয় ছাড়া ক্ষয় নাই। তাঁকে ছেড়েও খুটিনাটি তাঁকে বাদ দিয়ে—এ জন্যই বলেছে - তার লাগে ভদ্রা - যে ভুলে নন্দকুমার। তার লাগে ভদ্রা— যে ত্যাজে নন্দকুমার। ধর্ম্ম-রাজ্যের ভাবই আলাদা। সেই রাজ্যে কেউ পদার্পনই করে না।

১৬৫। গুরুবাক্য অমৃত বাক্য—ধরতে পারলে হয়।

১৬৬। আধার সে ছোর দে - দুঃখ আবসে ছোর যায় গা। কায়িক - মানসিক-বাচনিক তিন দুঃখই দূর হবে দুঃখের নিবৃত্তি হ'বে শ্রী গুরুর নামে।

১৬৭। জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। গুরু সেবায় বিঘ্ন ঘটাইয়া নিজ উদ্দেশ্য সাধন, গুরুকৃপা হ'তে বঞ্চি ত করে। আগে ঠিক করতে হ'বে জীবনের উদ্দেশ্য। তার জন্য-নির্দেশিত পথে চলতে হ'বে।

১৬৮। ব্রজানন্দ জগন্মাতা—জগৎ পালক।

১৬৯। কত অপরাধ কর? ধর্মে থাক—অশান্তি কেন হ'বে। অধর্ম্ম ছেড়ে দাও - গুরু নাম কর — আপনিই শান্তি হ'বে।

১৭০। বাধা বিঘ্নের মস্তকে পা ফেলে চলে আসবে। এই পথে বাধা নেই—তুমি যদি ঠিক থাক। শোন যবন হরিদাস কি বলে—খণ্ড খণ্ড হ'য়ে যদি যায় দেহ প্রাণ, তথাপি বদনে নাহি ছাড়ি হরিণাম। কেমন জোরের কথা। এই পথে বাধা নেই। নিজে একটু ঠিক থাক্‌লেই হয়।

১৭১। নামের প্রভাবে কি না হয়। নামের প্রভাবে হাজার হাজার পাপ ক্ষয় হয়। নামের তুল্য আর কি আছে জগতে? মানুষ পাপ করবে—পরিষ্কার হইতে কতক্ষণ? হনুমান সেতু বন্ধন না করে জয় রাম বলে এক লাফে সাগর পার হয়ে গেল। নাম এমন বস্তু। নাম ধর শক্ত করে-সব পরিষ্কার হয়ে যাবে এ নাম সুধামাখা—জীবের পাপ ক্ষয় করে—নামে রুচি জন্মায়—গুরুতে প্রেমের উদয় হয়। ধর নাম শক্ত করে। নুলাপুত হলে চলবেনা। ধর শক্ত করে 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য'। বলহীন পুরুষ কি আর শক্তি সঞ্চার করতে পারে? নাম এমন—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎশর্য্য এই ষড় রিপুকে ভস্ম ক'রে ফেলে। যবন হরিদাস হরিণাম জপ করছে। এমন সময় কাজী পাঠালেন এক অপ্সরাকে

তার ধ্যান ভঙ্গ করতে। কাজী অপ্সরাকে আদেশ করলেন—হরিদাসের ধ্যান ভঙ্গ কর, সাধুগিরি দাও নষ্ট করে। হরিদাস ধ্যানে মগ্ন। কামাতুরা অপ্সরা ডাকে কৈ সাধু, এস না! হরিদাস বলে, একটু দেরী কর। পুনঃ পুনঃ ঐ একই উত্তর একটু দেরী কর। এদিকে রাত প্রভাত হয়ে এল। কাজী জিজ্ঞাসা করলেন অপ্সরা কি হল? অপ্সরা উত্তর দিল কিছুই হয় নাই। হরিদাস সারারাত নামে ডুবে ছিল। শুনে কাজী আদেশ করলেন—আজ রাতে আবার যাও। রাত হ'লে অপ্সরা সাজ সজ্জা ক'রে হরিদাসের কাছে গিয়ে বলল। —কি সাধু কি হল? হরিদাস উত্তর দেয়—আর একটু জপ বাকী আছে। অপ্সরা যতবার ডাকে হরিদাস ততবারই উত্তর দেয় আর একটু জপ করে নেই। অপ্সরা ভাবে—এমন সাধু আর আমি নিতান্ত পিশাচিনী নারকী। আমার নরকেও স্থান নেই। হরিদাসের নিকট প্রার্থনা জানায় আমাকে দয়া করে ভেক দিন। টাকা, পয়সা সোনা গয়না সব গঙ্গায় বিসর্জন দিয়া বলে—আমার গতি কি হবে, বাবা? আমার নরকেও স্থান নেই। সব গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করে অপ্সরা। দলে দলে লোক দরশন করতে যায় এই সন্ন্যাসিনীকে। বেশ্যা হইল পরম মহান্তী রক্ত বস্ত্র পরিহিতা কেমন আশ্চার্য্য পরিবর্ত্তন, বেশ্যা হইল সন্ন্যাসিনী। দলে দলে লোক আসে দরশন প্রার্থী হয়ে। নামের মহিমা—নাম ব্রহ্মাণ্ড।

১৭২। বৈষ্ণবের পদধূলি শিবের ভূষণ করিয়া এড়াও, ভাই, সংসার বন্ধন।

১৭৩। গঙ্গাম্বু সেবন, গঙ্গার তীরে বাস, গঙ্গা স্নান মহা ভাগ্য। তব তট নিকটে যস্য নিবাস—খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাস।

১৭৪। সে যে ফুরুৎ ফুরুৎ করে বেড়ায়—কারো বাধা মানে না। পাবে কি করে? সাধন না করলে সাধনার ধন পাওয়া যায় না। সাধন করবে তবেত সিদ্ধিলাভ হবে। প্রতিমাস পয়লা দরশন করে যাবে। কোন খরচ-পাতি নাই।

১৭৫। সেবাতে প্রসন্ন হলে মোক্ষলাভ হয়। সেবা এমন বস্তু।

১৭৬। ইন্দ্রিয় ও মনের গতির প্রভাব ভয়ঙ্কর। লাগাম কষে ধর। ইন্দ্রিয়ের লাগাম কষে ধর। মনের লাগাম কষে ধর।

১৭৭। দীক্ষা গ্রহণ করতে দিন ক্ষণ মলমাস আটকায় না।

১৭৮। চরণ শক্ত করে ধরলে বিপদ কি করবে? বিপদের মাথায় পা দিয়ে চলবে। বিপদ কি? আপদে বিপদে যদি মজে রামপদে, আপদ বিপদ কি করবে? রূপ সাগবে দেওনা ডুব, আপদ বিপদ দূর হবে।

১৭৯। এক রোটি যো দেগা এক ছেলের মা হবে। দো রোটি যো দেগা দুই ছেলের মা হবে। তিন রোটি যো দেগা তিন ছেলের মা হবে। রুটির বন্দোবস্ত কর ছেলে আনব! এক সাধু দুপুর বেলায় এই বলে যাচ্ছিল। ঐ রাস্তায় ধারে এক অপুত্রক গৃহস্থের বাড়ী। তার কানে যেই এই কথা গেল সে আনন্দে আত্মহারা। হাম্ তিন রোটি দেগা। ডাল-তরকারী-রুটি দিয়া সাধুর সেবা দিল প্রেমসে। সাধুর আশীর্বাদ পড়ল তিন ছেলে হবে। একদিন নারদ ঐ পথে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে গৃহস্থের তিন ছেলে হল। নারদ গৃহস্থের তিন ছেলে দেখে, ভাবেন—ভগবান বলছিলেন তার সন্তান হবে না। এখন নারদ তিন ছেলে দেখে অবাক। দেখে তিন ছেলে ছুটাছুটি করছে। নারদ গৃহস্থকে বললেন ভগবান বলেছিলেন তোমার সন্তান হবে না—দেখছি তোমার তিন ছেলে হয়েছে। তখন গৃহস্থ প্রকৃত ঘটনা বলে দিল নারদকে! সাধুর আশীর্বাদেই তার তিন ছেলে হয়েছে। সাধু যদি ভগবান হয় তা হ'লে এই রকমই হয়! সাধু ভগবান। তোমার কপালে যদি সন্তান না থাকে—সাধুর কৃপা দৃষ্টিতে সন্তান হবেই। যো না করে লকির সো করে ফকির! কপালের লেখায় যা না করে সাধু তা করে। জিস্‌কো না দেয় আল্লা—উস্‌কো দেয়—ফকির মোল্লা, আল্লা যাকে না দেয় ফকির মোল্লা তাকে দেয়।

১৮০। প্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি, বৈষ্ণবে, সর্ব পুণ্যবতাং বিশ্বাসোনৈবজায়তে। গোবিন্দে আর প্রসাদে নাম ব্রজে আর বৈষ্ণবে পুণ্যের জোর খুব বেশী যার বিশ্বাস হয়; সকল পুণ্যবানের হয় না।

১৮১। গুরু মূর্ত্তির কাছে কাম, ক্রোধ কাঁপে থর থর। লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য পালায় চকিতে। এই মূর্ত্তি দরশনে পাপ নিঃশেষ হয়ে যায়। সুখ শান্তিতে সংসার ভরপূর হয়।

১৮২। জীব কল্যাণের জন্য গুরুধাম গোলকধাম প্রতিষ্ঠা। জীব উদ্ধার হবে। জগৎ উদ্ধারণ নাম 'ব্রজানন্দ' দিনান্তে একবার স্মরণ করবে।

১৮৩। ব্রজানন্দ এই দু'পোয়া দেহের মধ্যে নয়। ব্রজানন্দ সর্ব-ব্যাপী সত্ত্বা। ব্রজানন্দ অনন্ত, ভজবে'ত বিরাট অনন্তের—অসীমের ভজনা করবে। সসীমের উপাসনা করবে না। ব্রজানন্দ নিত্যসত্ত্বা। ব্রজানন্দ অসীম, অনন্ত বিরাট সত্ত্বা! এই ভাব নিয়ে ভজবে, তা হলেই সেই অবস্থা প্রাপ্ত হবে। মন ছড়াইয়া আছে গুটাইয়া আনতে হবে।

১৮৪। দেহ কয় দিনের? দেহিকে ধর! দেহ নিয়া টানাটানি করনা। যিনি অনন্ত অনাদি তাঁর সন্ধান কর।

১৮৫। যে শিষ্য গুরু হতে দূরে সে ভগবান হতেও দূরে।

১৮৬। যার প্রসাদে ভক্তি আছে—আগ্রহ আছে সে আপনি আসিয়া চাহিয়া লয়—তাকে ডাকতে হয় না।

১৮৭। উদিতে জপতি নাথে। সূর্য্যেদয়ের পূর্বে গাত্রোত্থান করতে হয়—অন্যথায় সূর্য্যদেবকে অমান্য করা হয়।

১৮৮। শিক্ষার চরম ফল—প্রকৃত শিক্ষার প্রভাব এই - ধর্ম পরায়ণ হ'বে। প্রকৃত শিক্ষা না পাইলে ধর্মহীন পণ্ডিত হয়। যে শিক্ষায় ধর্মহীন পণ্ডিত তৈরি করে—সে শিক্ষা কুশিক্ষা। সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়।

১৮৯। শ্রীগুরুর পদধৌত জল মস্তকে লও। জীবন সফল—কৃত কৃতার্থ - কিছু বাকি থাকে না। ওঁ গুরবে নমঃ। ন গুরোরধিকম্। গুরু সব চেয়েও আপন। সফল জনম—সফল জীবন।

১৯০। আমার হিত হউক বা না হউক—গুরুধামের হিত হউক—ধাম-বাসিদের এই মহামন্ত্র জীবন বেদ। এই ভাব নিয়ে না থাকলে—না হবে ধর্মের মঙ্গল—না হবে তোমার মঙ্গল। ত্যাগী হতে হবে—গৃহী নয়। ধামের হিতার্থে আপন স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে। ভক্ত-শিষ্যেদের আপন জ্ঞান করতে হবে। গুরু ধামের আইনই আলাদা। এখানে নিজ স্বার্থ হারাইতে হবে। অন্যথায় না হবে হইকালের—না হবে পরকালের মঙ্গল।

১৯১। ব্রজানন্দ সত্য নাম—ওঁকার মধ্যে কাশীধাম। এই লীলার উদ্দেশ্য জীব-কল্যাণ। আমার সব কিছু খাওয়া-ওঠা-বসা জীবের কল্যাণের জন্য।

১৯২। মাঈরা সোনার বাক্স রাখে—দেহটা সেই রকম। মাঈরা সোনার বাক্সটা চোখে চোখে রাখে। যেখানেই থাকুক—চোখ থাকে সোনার বাক্সের উপর। সেই রকম দেহটার উপর চোখ রাখতে হয়। দেহটা যেন সুস্থ সবল থাকে।

১৯৩। ধর্ম্ম দিয়া মানুষ শান্তিলাভ করে। ধর্মহীন জীবন—তাই কেবল গোলমাল আর গোলমাল। শান্তি নাই। কর ধর্ম-কর্ম শান্তিলাভ হবে। ধর্ম-কর্ম নাই শান্তিলাভ হ'বে কি করে? দিনরাত অগণিত অধর্ম কর্ম। ধর্মহীন জীবন—শান্তিলাভ হ'বে কি করে?

১৯৪। নাম গ্রহণ কর—দেহ পবিত্র হউক। দেহ-মন পবিত্র না হলে কোন কার্য্যই সিদ্ধিলাভ হয় না। নাম গ্রহণ কর—সব দিক দিয়া মঙ্গল হ'বে।

১৯৫। গুরুর নামে ক্ষয় নাই। তাঁর নাম নিয়ে আরম্ভ করলে জয় অবশ্যম্ভাবী।

১৯৬। কাল বড় ভয়ঙ্কর। কালের প্রভাবে মনের পরিবর্তন হতে পারে। শুভ-বাসনা সব সময় মনে জাগে না। কাজেই শুভস্য শীঘ্রম্। নিঃশ্বাসের নাই বিশ্বাস। মরিয়াও শান্তি পাবে না। মরণইত শেষ নয়—পরকাল আছে। শুভ বাসনা কি সব সময় মনে জাগে? মনের পরিবর্তন হ'তে কতক্ষণ? দীক্ষার বাসনা যখনই মনে উদয় হয় কালক্ষেপ করতে নাই। নিঃশ্বাসের নাই বিশ্বাস। মনের কথা মনেই থাকবে। লুটাইয়া দাও—সঙ্গের সাথী কেউ হ'বে না।

১৯৭। ভক্ত শিষ্য একার্থ বাচক। ভক্ত শিষ্য উভয়েই সমর্পিত প্রাণ। দীক্ষিতের কাজ একটু তাড়াতাড়ি হয় সাধন ক্ষেত্রে গুরুর সাহায্য পায়। উভয়েরই এক অবস্থা।

১৯৮। তোমাদের পূর্ণ বস্তু দিয়েছি। অসম্পূর্ণ কিছু রাখি নাই। ঐ যে নাম দিয়েছি—নামের কাছে চাইলেই সব পাবে। চাইলেই আমার দেখা পাবে। এই রকম—যেমন আমার দেহে হাত বুলাচ্ছ—সেই রকম। এই জন্য দেহ নষ্ট করা হয় না, সমাধি দেওয়া হয়। সমাধি থেকে সময় সময় দর্শন দেন। দেহ নশ্বর—এই আইন আমার। আমি কি এই আইন লঙঘন করতে পারি? পারি না। এই আসন রেখে গেলাম। এই আসন রক্ষা করে রাখবে তা হ'লে আমাকে পাবে। এই আসন রক্ষা করার দায়িত্ব তোমাদের—ভক্ত শিষ্যদের। আমি এই আসনেই আছি—এই আসনই ব্রজানন্দ এই বিশ্বাস যদি রাখতে পার তবে তোমরা কখনই আমার অভাব অনুভব করবেনা। আমাকে চিরকাল পাবে।

১৯৯। এই জগতে তিনটি বস্তু দুর্লভ। সাধু দরশন, মনুষ্য জন্ম, সৎ গুরুলাভ। সাধু দরশন দুর্লভ দরশন। সৎ গুরুলাভ সাধন সাপেক্ষ। মনুষ্য-জন্ম দুর্লভ জন্ম। ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে তবে মনুষ্য যোনি লাভ হয়। মনুষ্য জন্ম দুর্লভ এই অর্থে।

২০০। মন ঠিক করা সাধন-সাপেক্ষ। মায়ায় মুগ্ধ হয়ে এই মন কত কাল মলিন হয়ে আছে। সেই মনকে শুদ্ধ শান্ত করা সাধন সাপেক্ষ। যজ্ঞ করতে হয় তপস্যা করতে হয়। তপস্যা যজ্ঞ এক কথায় উঠেই গেছে। তপস্যা কেউ বোঝেই না—তপস্যা কি। বিষয়াভিমুখী মনত মলিন হ'য়ে আছে। মনকে শুদ্ধ শান্ত কর। অঙ্গারের ময়লা কাটে অগ্নির দহনে। মনের ময়লা কাটে সাধু সম্মেলনে—তপোযজ্ঞে। সহজ পথে সাধু সঙ্গ করে মনের ময়লা কাটাও। মনকে শান্ত শুদ্ধ কর। করতে থাক। মহতের দরশন যেখানেই পাও করো। সহজ পথ দরশন পরশন। একটা ধরতে পারলেই হয়। মন এদিক সেদিক যায় বলে ছাড়বেনা। বস্‌বে—বস্‌বে। যুদ্ধ

করতে করতে মন বস্‌বে। ছাড়বেনা—ছাড়বেনা। মনকে টেনে আনবে। যতবার মন এদিক সেদিক যায়—টেনে আনবে পথে। পানা-পুকুরে স্নান করলে—হাত দিয়ে পানা সরাতে হয়। অভ্যাস রাখ। এই জন্যই নাম-জপ। অভ্যাস রাখ। অভ্যাস যোগ যোগাভ্যাস। দরশন কর—এগিয়ে যাবে। সাধন ভজন করার সময় সুযোগ-সুবিধাত নেই। কাজেই মহাপুরুষের কৃপালাভ কর। যেমন ইঞ্জিনের সাথে মালগাড়ী। মহাপুরুষের সাথে সঙ্গ করো। মনের ময়লা কাটে সাধু সম্মেলনে। সাধন ভজনের যুগত নয়—ঘোর কলি।

২০১। উপাধী বাড়াবেনা—অশান্তি ভোগ হ'বে। সংকোচ শক্তি অবলম্বন করতে হ'বে—। কেহ মিনিষ্টার—কেহ লাট। এখন গাড়ী ছাড়া চলেনা—এই উপাধি। যখন গাড়ী রাখার ক্ষমতার অবসান হ'বে—অশান্তি ভোগ হ'বে। খুব সংক্ষেপ করে চলবে উপাধি বাড়াবেনা। খুব ঠাণ্ডাভাবে থাকবে—খুব সিধাভাবে থাকবে—মনটাও শান্তিতে থাকবে। ঠাণ্ডাভাবে থাক—কিছুতে পাবে না। উপাধি বাড়ালেই লোকের চোখ পড়ে।

২০২। পাপজ ব্যাধি নিরাময় হতে—তীর্থ, ধর্ম, দানপুণ্য প্রয়োজন। অন্তর্ব্যাধি বহির্ব্যাধি উভয়ই।

২০৩। এক রাজরাণী রামভক্ত ছিলেন—কিন্তু রাজা রামভক্ত ছিলেন না। রাণী এজন্য দুঃখিত। রাণীর আক্ষেপ—রাজা যদি রামভক্ত হইতেন—তিনি জোর পাইতেন। এক রাত্রে রাণী শুনতে পান রাজা ঘুমন্ত অবস্থায়—রাম রাম উচ্চারণ করছেন। রাণীর আনন্দের পরিসীমা নাই। রাণী ভাবেন—এমন রামভক্ত স্বামী--এতদিন চিনতে পারেন নাই। এমন মহাপুরুষ স্বামী—তাঁর উপর এই ভুল ধারণা তার। রাণী মনের আনন্দে প্রজাদের মিঠাই-মণ্ডা খাওয়ালেন। মন্ত্রীকে আদেশ দেন—মন্ত্রী এই মর্মে রাজ্যে ঢোল পিটাইয়া দিলেন। প্রজারা সাজসজ্জা করে দলে দলে এসে ভোজনে আপ্লায়িত হইল। এদিকে রাজা এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন না। দেখে শুনে রাণীকে জিজ্ঞাসা করেন ব্যাপার কি? রাণী আনন্দে সকল কথা রাজাকে বললেন। অবশেষে বললেন এজন্যই আমি প্রজাদের মিঠাই মণ্ডা সেবা দিয়া আনন্দ করতে আদেশ করেছি। আমি রামভক্ত তুমি কোন দিন রামনাম কর নাই। এ জন্য আমার মনে দুঃখের অবধি ছিল না। এক রাত্রে তুমি ঘুমন্ত অবস্থায রাম রাম উচ্চারণ করেছ তাহ শুনে আমার এত আনন্দ।এই শুনে রাজা ভাবেন যে কথা এতদিন আমি সযত্নে গোপন রেখেছি, ঘুমন্ত অবস্থায় তাহা

প্রকাশ হয়ে পড়ল। এই বলতে বলতেই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে গিয়ে রাজার মৃত্যু হয়। সাধন করবে—মনে-বনে কোণে।

২০৪। মানুষ ভগবানের দরশন পেয়েছ—জীবন সফল—অমঙ্গল দূর হ'য়েছে—মনোবাসনা পূর্ণ হ'বে। দরশনে অমঙ্গল দূর হয়—মনোবাসনা পূর্ণ হয়। সব দিক দিয়ে জয় হয়।

২০৫। আত্মশক্তির উপর নির্ভর দিয়েছিলে—সুফল হয় নাই। এখন ভগবানে নির্ভর দিয়েছ—ফলপ্রসূ হবে। আশীর্ব্বাদ অমোঘ।

২০৬। গুরু এসেছেন—জোর কর। এমন দিন আর পাবে না। কি ভাবনা আর, এসেছে এবার, দাতা শিরোমণি করুণা আধার। দাতা গ্রহীতা দুইই বরাবর। যেমন দাতা-তেমন গ্রহীতা। বলি রাজা আর বামন। ত্রিপাদ ভূমি। আর এক পাদ রাখার জায়গা নাই। দুইই বরাবর চাই—রমারম। যেমন দাতা-তেমন গ্রহীতা। ওঁ কৃষ্ণায় ব্রজানন্দায় নমঃ।

২০৭। ভক্তালয়ে সেবা—আমার কত আনন্দ। নুপুরের শব্দ কাণে গেল তোমার। নুপুরের ধবনি শুনে ধণ্য হলে। আর একটু অগ্রসর হ'লেই - একটা লাঠি নিয়ে—গোপাল দরর্শন হ'য়ে যেত। এক ভক্ত আমায় গোপাল রূপে ভজনা করত। নুপুরের ধবনি শুনে তার মনে হ'ল চোর এসেছে তার গোপাল চুরি করে নিয়ে যাবে। চোর তাড়াতে লাঠি নিয়ে এল। পরে আমার চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখে—আমার গোপাল রূপ দরশন করে বুঝল—চোর নয় গোপাল স্বয়ং। হাত থেকে লাঠি ফেলে দিল—নইলে আমাকে লাঠির বাড়ি খেতে হ'ত—যদি আমি আমার রূপ না দেখাইতাম। নুপুরত বাজবেই। ভক্তালয়ে আনন্দধবনি—নুপুরত বাজবেই। লাঠির ভয়ে নিজ মূর্ত্তিধারণ করতে হয়। আর একটু অগ্রসর হ'লেই—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ দরশণ হত তাহার। মহাভাগ্য!

২০৮। কোন দিন মনে করনা—তুমি একা। একা তুমি কিছুতেই হ'তে পার না। তোমার সাথে থাকবই আমি। বেড়া শক্ত করে দিবে—ফাক যেন না থাকে। তা হ'লে গরু বাছুর ঢুকে—সব নষ্ট করে ফেলবে। বেড়ায় কোন ফাঁক যেন না থাকে। হুঁশিয়ার!

২০৯। ঠিক ঠিকমত ব্যারিষ্টারি করতে পারলে না? একটু খানি গোলমাল করে ফেল্‌লে। মারু ভক্ত দেখ নাই। সেবাইত বলে—বাবা শয়নে আছেন এখন দরশন হ'বে না। মারু ভক্ত উত্তর দেয় - জগৎ যাক্ আর থাক্ - দরশন না করে

যাব না। আমার কর্ম না করে আমি যাই না। আমার আদায় পুরা না করে যাইনা। বাবা যে অবস্থায় থাকুন-শয়নে থাকুন তুমি ঠেকাইবার কে? মারু ভক্ত একেই বলে।

২১০। সময় নাই—সময় নাই, সেবার দ্রব্য হাতে নিয়ে একটু মুখে দিন। মুখে দিয়ে দেখুন। সময় মত হলে হয়। যখন তখন কি সেবা হ'তে পারে? এখনও কি আমি গোপাল নাকি? সময় মত হ'লে হয়।

২১১। বি. এ পাশ, এম্ এ পাশ নামের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাকে শোনাও। গালভরা কথা-কথার সরিত সাগর। প্রশ্ন প্রতিপাদ্য বিষয় প্রকৃত বিদ্যালাভ হ'তে অনেক দূরে। যে বিদ্যাতে আত্মবিকাশ আত্মজ্ঞানলাভ হয়না সে বিদ্যা বিদ্যাই না। আচার্য্যবাণ স এব বিদ্বাণ। চরিত্রবাণ লভতে জ্ঞানম্। বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় একমাত্র অর্থকরী বিদ্যা লাভই হয়। বর্ত্তমান শিক্ষায় দেশ ছারখার হ'য়ে গেল। না হয় চরিত্রোন্নতি না হয় ধর্ম্মে বিশ্বাস। চরিত্রবাণ স এব বিদ্বান্।

২১২। মানুষের ধৈর্য্য থাকা একান্ত প্রয়োজন। ধৈর্য্য না থাকলে সে মানুষই না। তার পদে পদে পরাজয়। ধৈর্য্য ধরে থাক। আমি আছি তোমার পাছে পাছে।

২১৩। চিরস্থায়ী কর্ম্ম কর। পাকা পাকি কর্ম্ম হ'লে কিছুদিন থাকে। আম সন্দেশত রাত প্রভাত হ'লেই নিঃশেষ। পাকা কাম কর় কিছুকাল থাকবে।

২১৪। গাভী বিষ্ণুর অবতার। দেবালয়ে গাভী পালন, গো-সেবা শাস্ত্র-সম্মত। গো-সেবা পরম ধর্ম্ম। পূজা-আর্চ্চায় পঞ্চামৃত, গোরচনা, গোবর প্রয়োজন হয়। কামধেণু গাভী যখনই দোয়াবে দুধ পাবে তখনই। যত্ন পরিচর্য্যা অত্যাবশ্যক। মশায় না কামড়ায় সেই জন্য মশারি টানিয়ে দিতে হয়। আখরায় অখরায় কামধেণু পালন করা হয়। ইহার জন্য বংশগত শক্তি, উপযুক্ত খাদ্য, যত্ন-পরিচর্য্যা, সেবা যত্ন অত্যাবশ্যক। গো-সেবায় অনুরাগ ভাল গৃহস্থের লক্ষণ। গোগৃহে-দেবগৃহে-পিতামাতাকে প্রত্যুষে শ্রদ্ধাসহকারে ভক্তি প্রদর্শন অবশ্য কর্ত্তব্য।

২১৫। সেই সমুদ্রেই ঝাঁপ দাও—শান্তির সমুদ্রে ঝাপ দাও—শান্তির সমুদ্রে-ভক্তির সমুদ্রে মিশে একাকার হয়ে যাও। শান্তির জাহাজের সঙ্গে জালিবোট বেঁধে নিব আমি। আমি আমার করে নিব—তুমি মনে-প্রাণে ঝাপিয়ে পড়। যার নাই—আমি তারে দিয়ে নেই। যার আছে তার রক্ষা করি। কারো অভাব রাখিনা। সবার অভাব পূরণ করি।

২১৬। হ্যাম্ থাকো রামে—থাকো রামে সাঁইয়া—জগৎ বৈরী হলেও—জগৎ বৈরী হয়েছে ভি-কুছ না কর সাকে। দুষমন্ কুছ না কর সাকে যাকো রাখে সাঁইয়া। বিশ্বাস রাখ।

২১৭। যো আয়া হ্যায়, সো জায়গা ভি—রাজা, ভিখারী, ধনী, নির্ধন। মন মরি না মায়া মরি। কত ভক্ত চলে গেছে-মায়াকে কেউ মারতে পারে নাই। মনও মরে না-মায়াও মরেনা। আশা তৃষ্ণার শেষ নাই। মায়া অনন্তকাল থেকে আছে—অনন্তকাল থাকবেও।

২১৮। যা সঞ্চয় করেছে, তাই নিয়েইত আসবে আমার এখানে। তার বেশী নিয়ে আসবে কোথা থেকে যা জন্ম জন্ম সঞ্চয় করেছে তাইত তার পুঁজি। এই আসা যাওয়ার মধ্যেই-জন্ম জন্মান্তর। যার সুকৃতি আছে—শেষ পর্য্যন্ত পার হয়ে যায়। ধ্রুবও প্রথম কামনা নিয়েই এসেছিল ভগবানের কাছে। পরে ভগবান দরশন হলে—আর কামনা নাই—রাজ্য চাইনা—রাজা হতে চাইনা। সব চাওয়া পাওয়ার শেষ। পরমার্থ লাভ হ'লে আর চাওয়া পাওয়ার কিছুই থাকেনা। 'বরং ন যাচেৎ। আমাকে দরশন করে ঘর পূর্ণ হ'য়ে গেছে। চাইবার আর কিছুই রইল না। যাওয়া চাই। কামনা বাসনা নিয়েই প্রথমে যাবে। যেতে যেতেই কামনা বাসনার অবসান। ধ্রুবও কামনা নিয়েই গিয়েছিল প্রথম—রাজ্য চাই। অনেকেই এভাবে তরে যায়। যারা নিতান্ত বদ্ধ জীব—তারাই পড়ে থাকে। মায়া-তেরি তিন নাম—পরমা,পরেমা, পরেশরাম।

২১৯। গাছে উঠে মরতে—জামিন হয় ভরতে। নিজানন্দ সাধুর মৃত্যু প্রসঙ্গ। ঢাকায় হরতাল। গাভীর জন্য ঘাস ক্রয় করা সম্ভব হয় নাই পর পর কয় দিন। আজ গাভীর অনশনের সম্ভাবনা দূরীকরণার্থে, আম্রপত্র সংগ্রহের জন্য আম্রবৃক্ষে উঠিয়া আম্রপত্র তুলিতেছেন। এদিকে ঠাকুর তার জন্য বিচলিত হইয়া খোঁজ করিতেছেন—কোথায় যেন নিজানন্দ সাধু? গাছের উপর তাঁহাকে দেখিয়া—গাছ হইতে নামিতে আদেশ করিলেন। ঠাকুর অমঙ্গল আশঙ্কাই করিতেছিলেন। গাছ হইতে নামিয়া আসিতে আদেশ করিয়া সবেমাত্র আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন-সেই মুহূর্ত্তে সাধু গাছ হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সংবাদ পাইবা মাত্র ঠাকুর ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসিলেন। শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁহার অন্তেষ্ট্রি-ক্রিয়ার ব্যবস্থা করিলেন। শিব-ধামের প্রাঙ্গণেই তাঁহার অন্তেষ্ট্রি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের একনিষ্ঠ শিষ্যের স্মৃতি-রক্ষার্থে, শিবের অর্থব্যয়ে

তাঁহার স্মৃতিমঠ নির্ম্মিত হইল। কথা প্রসঙ্গে একদিন ঠাকুর নিজানন্দ সাধুর বিবিধ গুণাবলির উল্লেখ করেন। সেই সঙ্গে ঠাকুর একটি ঘটনা ব্যাক্ত করেন। একদিন তিনি নিজানন্দ সাধু প্রমুখ ভক্ত-শিষ্যের নিকট—সম্ভাব্য স্বীয় মহা-প্রয়ানের পর কোথায় কিভাবে শ্রীদেহ রক্ষা করিতে হইবে। সেই বিষয়ে বিশদ উপদেশ প্রদান করিলেন। আমার কি ব্যবস্থা হইবে জানিতে বাসনা হয়, দয়াময়। মনে হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহরক্ষার সম্ভাবতা স্মরণ করিয়া-শোক-বিহ্বল চিত্তে তাহার পূর্বেবই স্বীয় দেহ রক্ষার প্রার্থনা চরণে নিবেদন করিয়াছিলেন। কৃপাপরবশ হইয়া ঠাকুর তাঁহার আকুল প্রার্থনা সার্থক করিলেন। ঠাকুর তাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলা বাহুল্য তিনি ছিলেন একজন আদর্শ একনিষ্ঠ গুরু-সেবী। গুরু-সেবাই ছিল তার জীবন বেদ। বাবা বলেন-শিবধাম একেবারে অন্ধকার করে গেল।

২২০। গুরু-পাটে ত্রিরাত্রবাস শাস্ত্রের বিধান।

২২১। নিরাকার থেকে সাকার মুর্ত্তি ধারণ করেছি। বাক্য দিলাম—বাচাইলাম। তার রোগ আমি গ্রহণ করলাম। ভক্ত বলে—ও কথা বলবো না। আমি বলি—মুখে এসে পরেছে—আমি কি করব? আমার ভক্তের মধ্যে কুটিপতি আছে—কারবার করে কুটিপতি হ'য়েছে। ভক্ত বলে—তোমার দয়ায় হয়েছে—তোমার দয়ার নাই বিরাম ঝরে অবিরাম।

২২২। যতক্ষণ বলতে পার—ততক্ষণই লাভ। কতকাল সংসার করছো? এর কি শেষ নেই? যার শেষ নেই—তার পাছে ছুটে লাভ কি?

২২৩। পাপ নিঃশেষ করে যাও। সুখ-শান্তিতে সংসার ভরপুর হ'বে।

২২৪। ঠেকা-ঠেকি পরলেই আসবে। জীব-কল্যাণের জন্য গোলকধাম প্রতিষ্ঠা হ'ল। ঠেকা-ঠেকি উদ্ধার হ'বে।

২২৫। চরণে স্মরণ লও দিনান্তে একবার। স্মরণ করো—যমে ছোঁবে না। জগৎ-উদ্ধারণ নাম—ব্রজানন্দ।

২২৬। মুক্তিদাতা গুরু। মোক্ষপদ পাওয়াতে পারে একমাত্র গুরু। গুরু সবচেয়ে আপন। তাঁর চেয়ে আপন আর কেহ নেই। পিতামাতা পালনীয়-পোষ্যবর্গ, পালন করতে হয়। গুরু ও পোষ্যবর্গ পালন করতে হয়। যেমন পিতামাতাকে পালন করতে হয়। গুরোণোধিকম্। গুরুর অধিক আর কেহ নাই।

২২৭। বিদ্যা, ধন যদি সৎপাত্রে পড়ে - তবে অভিমান হয না। বিদ্যার অভিমান, ধনের অভিমান - এই বিদ্যার, ধনের দোষ। ধর্ম্ম ভিন্ন ধন ও বিদ্যা দুইই অকর্ম্মণ্য।

২২৮। ঠাকুর দিলেন প্রসাদ—সন্দেশ। ভক্ত নিয়ে গেল ঘরে। দেখে সন্দেশ-হরি। প্রসাদস্তু ভগবান স্বয়ং। ও-কি-দুই।

২২৯। বাল্মিকী মহা পাতকী—যার মুখে রামনাম উচ্চারণ হয় না। তার সমস্ত পাপ ক্ষমা হ'য়ে গেল। কবে যে লীলা ক'রে গেছে—আজ হিন্দুর ঘরে ঘরে তাঁর গুণগাণ। আজ বাল্মিকী-মুনি।

২৩০। তোমার শুদ্ধ দেহ—নির্ম্মল দেহ—পবিত্র দেহ। তোমার কোন পাপ নেই। সব পাপ যায় নামে। তোমার কোন পাপ নেই।

২৩১। অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাতে পারে না—সে অন্ধকার দূর করতে পারে না। বিবাহের পূর্ব্বে দীক্ষিত পাত্র-পাত্রী—ভিন্ন গুরু। বিবাহের পরে স্ত্রী স্বামীর গুরুর নিকট দীক্ষিতা হবে। স্বামীর গুরুই স্ত্রীর গুরু হ'বেন। উভয়ের নাম শুনেই অনুরাগ। উর্ব্বর ভূমি। কারও দেখেও অনুরাগ হয় না—কারও নাম শুনেই অনুরাগ।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে মন যথা গিয়ে রয়,
সে যে পরম গুরু জানিবে নিশ্চয়।

নাম গুরুরই আর এক রূপ।

২৩২। স্বামী মহাজন। মহাজন যেন গত স পন্থা। স্বামীর পথইত অনুসরণ করতে হ'বে। স্বামীর গুরুইত স্ত্রীর গুরু হ'বেন।

২৩৩। পুনরপি জন্মম পুনরপি মরণম্,
পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্।

সারাদিন ভাবনা-চিন্তা-কি খাব? কি খাব? মানুষত মুক্তি চায় না।

২৩৪। নাম মুক্তি ফৌজ। কানা পোলার নাম—পদ্মলোচন।

২৩৫। কবির উপাখ্যান। কবির ছিল মুসলমান জোলা-কাপড় বুনত। রোজ এক জোরা বিক্রয় করে সংসার চালাত। একদিন বাজারে এক জোরা কাপড় লয়ে গেছে বিক্রয় করতে। এক বৈষ্ণব বলে "আমার দরকার"। কবির বৈষ্ণবকে দিল একখান এই মনে করে—মহাভাগ্য! একখান বস্ত্র দান করে বৈষ্ণবকে। বৈষ্ণব বলে—দুইখানাই দাও। একখানা পড়ব, আর একখানা ভিজাব। কবির দুইখানাই কাপড় দিল। এখন খালিহাতে ভয়ে আর বাড়ী যেতে পারে না। সন্ধ্যায় জঙ্গলে এক মন্দিরে শয়ন দেয়। বাড়ী গেল না। এদিকে ভক্ত-অভুক্ত, কোথায় না খেয়ে শুয়ে থাকবে—হরি নিজে ব্রাহ্মণের বেশে গাধার পিঠে রাস্তায় বহে

চাল ডাল নিয়ে গেল ভক্তের বাড়ী। এই দেখে কবিরের বাবা মনে করে "এত চাল-ডাল ছেলে কোথা পেল? লোক পাঠিয়ে কবিরকে খুঁজে আনা হ'ল। কবির মনে করে—হরি ভক্তের কষ্ট সইতে না পেরে, ভক্তের সব অভাব পূরণ করতে দয়াময় নিজে এসেছেন। ভক্তের ভগবান হরি-ভক্তের দুঃখ সইতে পারে না। কবির হরিভক্ত মুসলমান।

২৩৬। ধর্ম্ম ছেড়ে দিলে-দুঃখত সবই। অধর্ম্ম ছেড়ে দাও—দুঃখ দূর হবে, অবশ্য দূর হবেই। চোখে আঙ্গুল দিয়ে না বুঝালে বোঝ না। আমাকে দেখে বুঝে লও। আমারে দেখে বুঝে লও।

২৩৭। দুই রাজা—সোনার পুরী ছারখার করে দিল। ধর্ম্মবল না থাকলে সব মিথ্যা। সাবধান-খবরদার। এই দেখ আমার আর এক রাজ্য। রাজা ধর্ম্মবলে বলীয়ান। আমার ধর্ম্মের জোর জোয়ার হ'চ্ছে ওর মনের উপর। এই জায়গায় জায়গা। এই ছাড়া জায়গা নেই। রাজা ধর্ম্মবলে বলীয়মান।

২৩৮। আমি তোমাদের জন্যই আছি-নরদেহে। নিজের কোন প্রয়োজন নেই—তোমাদের জন্যই এসেছি। প্রার্থনা দিয়েছ ঠিক জায়গায়। দরশন রাখ মনে, সবকিছু হ'বে। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুবর্গ ফললাভ হ'বে। ছোঁয়া মাত্র হ'য়ে গেছে। সাধু স্পর্শমণি। ছোঁয়ালেই সোনা।

২৩৯। শুকদেব যেই মাটিতে পড়লো—ওমনি দৌর। বাবা বলেন—আয়-আয়—কোথা যাচ্ছিস? শুকদেব বলে না বাবা—আমার হ'য়ে গেছে। বনমুখী চলল। সেই রকম কোথায়?

২৪০। ভজ ভজ ভজ ভাই শ্রীগুরুর চরণ—
মদ মোহ ছাড়ি লও শ্রীগুরুর স্মরণ।

গুরুর চরণ সংসারের মুখরূপী। খোলা সংসার গলার ফাঁসী। সংসার রূপ গলার ফাঁসী খোলা যায় না। শ্রীগুরুর চরণ-স্মরণ লও।

২৪১। সংসারের বাঘ-ভালুকের চেয়ে বনের বাঘ-ভালুক ভাল। বি, এ, এম্, এ পাশ। গলা কাটে। এই বাঘের চেয়ে বনের বাঘ-ভালুক ভাল। কান কাটে-নাক কাটে-চোখ উপড়ে ফেলে। সব শিক্ষিত লোকের এই কার্য্য। বনের বাঘ-ভালুক আর কি!

২৪২। সন্দেশ-প্রসাদের সঙ্গে প্রসাদি ফুল। ফুলের মধ্যে পাওয়া গেল হরিতকি একটি।

২৪৩। এক ব্রাহ্মণ কন্যা-দায়ে একেবারে পাগল-পারা। দুই মেয়ে-গৃহ অর্থশূন্য—কি করে? বিশ্বনাথের মন্দিরে হত্যা দেয়। অর্থশূন্য গৃহ—তুমি ছাড়া এই দুঃখ

মোচন করবে কে? বিশ্বনাথ আদেশ করলেন। যাও বৃন্দাবনে সনাতন ঠাকুরের কাছে গেল কাশী থেকে বৃন্দাবনে। টাকা দাও-কন্যা দায় মুক্ত হই। সনাতন ঠাকুর বলেন— আমি সব টাকা ছেড়ে ফকির হ'য়েছি। আমার কাছে টাকা নেই। ব্রাহ্মণ বলে—তবে বিশ্বনাথের আদেশ মিথ্যা হ'বে? এই কথা শুনে সনাতন ঠাকুরের মনে হ'ল পরশ সাহেবের কথা। এনে দিল স্পর্শমণি। মাথা ছোঁয়ালে লোহা সোনা হয়। একমন লোহা ছোঁয়ালে একমন সোনা হয়। তখন ব্রাহ্মণ ভাবে হায়! হায়! এর চাইতেও আরও বড় জিনিষ আছে, যা চাইতে হয়। তখন ব্রাহ্মণ বলে সনাতনকে—যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মাননা মণি—আমি চাই তার এক কণা। এই বলে স্পর্শমণি ফেরৎ দিল সনাতন ঠাকুরকে। স্পর্শমণি ফেরৎ লও। তুমি যে ধনে ধনী তার এক কণা আমাকে দেও। আমার কাছেও এই রকম ৫/৭ টী সাধু ছিল।

২৪৪। যে যার গুণ জানে না—সে তা তুচ্ছ মনে করে। যেমন গজমুক্তা তুচ্ছ করে—গুঞ্জনফল পরিত্যাগ করে। গজমুক্তা কি চিনবে—ইচ্ছা ক'রে ফেলে দেয়—পরিধান করে না। গুঞ্জণফল গলায় ধারণ করে—হাতে ধারণ করে! মুক্তা পরিত্যাজ্যা—গুঞ্জণফল মহা মূল্যবান। হাতি ম'রে থাকে—চিনে না গজমুক্তা—গজমুক্তা ফেলে দেয়। পরিধান করে না।

২৪৫। ভক্তের কষ্টোপার্জ্জিত পয়সা—যা ভক্তরা দেয়, যথোচিত ব্যবহার করতে হয়।

২৪৬। এক হাজার অমৃতের তুল্য-স্বাস্থ্য যদি ভাল থাকে—এক হাজার অমৃতের তুল্য। হাজার নিয়ামত। স্বাস্থ্য সুখের নিধান। এক তুলসী হাজার নিয়ামত।

২৪৭। আমি কভু আমার না। করি এক, হয় আর। মানুষের সর্ব্ব ধুলিসাৎ।

২৪৮। এতদিনের বুড়াশিব লোকালয়ে ছিল। লোকালয় গিয়ে জঙ্গলে পরিণত হল। আমরা এসে আসন পেতে জাগাতে লাগলাম। হাজার হাজার যাত্রীর ভীড়। চিরকালের বুড়াশিব চিরকাল থাকবে। দেখ কি কাণ্ড হ'য়ে গেল? এই যে আমার বাক্য—আমি কভু আমার না। করি এক, হয় আর।

২৪৯। এমন একটা অমানুষিক অবিচার হয়ে গেল—আশ্চার্য্য, অভূতপূর্ব্ব। সমানে গুলি। বাছাবাছি নেই। একধার দিয়ে অত্যাচার। কিন্তু জান্ গিয়া। ফুল-চন্দন ছিটাকে মোর ঘুরাদে।

২৫০। দুঃখেষু অনুদ্বিগ্ন সুখেষু অনাশক্ত ত এব ধীরা। দুঃখে অনুদ্বিগ্ন সুখে অনাশক্ত তাঁরাই ধীরপদবাচ্য।

২৫১। তৎবিদ্ধি প্রণিপাতেন—পরিশ্রমেন—সেবয়া। তাঁহাকে জানতে হ'লে প্রণিপাত—পরিশ্রম—সেবাদ্বারাই সম্ভব।

২৫২। আপ্ ভালা ত জগৎ ভালা। আপ্ বুড়া ত জগৎ বুড়া।

২৫৩। পুত্র-কন্যার সেবা-যত্ন পাওয়া ভাগ্যের কথা।

২৫৪। আমি জীব-কল্যাণের জন্য দেহ ধারণ করেছি। দেহের যা ভোগ—তা ভুগতেই হ'বে।

২৫৫। কামনাই জন্মের কারণ। কামনা নিয়ে সংসার কর। তাই পুনঃ পুনঃ জন্ম হয়। কামনা রহিত হ'লে, পুর্নজন্ম হ'বেনা। আমার আচরণ দেখ—বাইরে বিষয়ী—মনে কিছু নাই—পরিষ্কার।

২৫৬। প্রারম্ভ কর্ম্ম-ক্ষণ আংশিক খণ্ডন হয়—ক্রিয়া আরম্ভ হ'য়ে গেলে। যেমন রাজা জন্মেজয়। মহাভারতে আছে—শাপগ্রস্ত জন্মেজয়—বিংশতি প্রকার কুষ্ঠ হবে তাঁর। কিন্তু এই এই কার্য্য করলে—রক্ষা পাবে। অনেক দানপুণ্য, যাগযজ্ঞ করে গুরু-সেবা, সাধু-সেবা করে—বিংশতি প্রকার কুষ্ঠের জায়গায়—১৮ প্রকার কুষ্ঠ হ'য়েছিল। তার মধ্যে এক প্রকার কুষ্ঠ রয়ে গেল।

২৫৭। বিষয় বন্ধনের কারণ নয়। আশক্তিই বন্ধনের কারণ। বিষয় আশক্তিই বন্ধনের কারণ।

২৫৮। আমি মুক্ত পুরুষ—আমি আপন মনে ঘুড়ে বেড়াই। আমাকে ভক্তালয়ে আবদ্ধ করে রাখা সমীচীন না। আমি মুক্ত পুরুষ—আপন ইচ্ছায় চলি-ফিরি। কোন নিয়মের অধীন না।

২৫৯। করি করি করে—রজগুণের আশ্রয়। সত্য-গুণের যারা আশ্রয় লয়—পয়সা হয় না। ছলনা-কপটতা—মিথ্যা নাই—পয়সাও হয় না। এক টাকার জমি—একশত টাকা লাভে বিক্রী। এতটাকা লাভেরও একটা ধর্ম্মাধর্ম্ম আছে। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে—টাকা হ'বেনা কেন? এক টাকায় একশত টাকা লাভ। এত লাভ ধর্ম্মের বিধি-বর্হিভূত। সত্যের আশ্রয় নিলে—এত অর্থ হয় না। অধর্ম্মের পথে বেশী টাকা হয়।

২৬০। আপদে বিপদে—যদি মজে রামপদে, সম্পদে বিপদে—পদে পদে সকলই তাহার।

২৬১। কৃষ্ণ-সুখে সুখী—ব্রজ-গুপীর ভাব। শতেক কৃষ্ণ ঘরে থাক—দুঃখ নাই। কৃষ্ণ সুখে সুখী মোরা—ব্রজগুপীর ভাব।

২৬২। এই জগৎ ভগবানের অধীন। তিনিইত জগৎ চালাচ্ছেন। ভগবৎ কৃপা ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়েনা।

২৬৩। যিনি রোগ দিয়েছেন—তিনিই রোগ নিতে পারেন। যে রোগ দেয় নাই—সে রোগ নেয় কি করে?

২৬৪। আত্ম—সুখ-দুঃখ গোপী না করে বিচার। কি নির্ম্মল—উদার। কৃষ্ণ-সুখ-তরে। জগৎ ছাড়া ভাব—জগতে নাই। কৃষ্ণ-সুখ তরে করে সব ব্যবহার। আত্মসুখ তরে না করে বিচার। কৃষ্ণ সুখে সুখী।

২৬৫। তুমি সুখময়—তুমি সুখে থাক। আমি ভষ্ম হ'য়ে যাই—তাতে ক্ষতি নাই। তুমি সুখে থাক। হিংসা করতে নাই।

২৬৬। মায়া রাক্ষসী—মায়ার হাত থেকে কি এড়ান সহজ? মায়া রাক্ষসী। মায়া রাক্ষসীকে এড়াইতে না পারলে—মরণ।

২৬৭। আনন্দের সংসার করবে—লাভা-লাভের দিকে চাইবে না। গুরুর সংসার—সব সময়ই আনন্দে থাকবে। দেওয়া তাঁর নেওয়াও তাঁরই। লাভ-লোকসান গুরুর। লাভ-লোকসান আমার না। এ সংসার আমার না। আমার আঙ্গিনার ধূলিকণাও আমার না। লাভ-লোকসান গুরুর। বাধা না পর—সে দিকে লক্ষ রেখে সংসার কর। অবিদ্যার সংসার কর না। লাভালাভ গুরুর। আমার দুঃখ করার কিছু নাই। বিপদে অধীর হ'তে নাই। আমার কি বিপদ। আমার বিপদ নাই। লাভ-লোকসান আমার না। আমার বিপদ হ'বে কি করে গুরুর সংসার—লাভ-লোকসান গুরুর। আমার বিপদ নাই। সুখের স্পৃহা রাখবে না—বিপদেও উদ্বিগ্ন হ'বে না। এই ভাবে সংসার করবে। যেখানে আমি নাই—সেখানে তুমি আছ। যেখানে তুমি—সেখানে আমি নাই। নির্লিপ্ত সংসারী হও। নির্লিপ্তভাবে সংসার কর। এমন অনাশক্ত হয়ে সংসার করবে—লোকে বলবে—কি মোর সংসারীরে! বুকে লাগবে না। বাইরে আশক্তি—মনে কোন কিছুতে মোহ নাই। এই ভাবে সংসার করতে হবে। বাইরে দেখতে যেন—খুব কর্ম্মী। কিন্তু মনে পরিষ্কার—কোন কিছুতেই লিপ্ত নয়। এই ভাব নিয়ে সংসার করতে পারলে—জন্ম-মৃত্যু রহিত হ'বে বর্হিদৃষ্টিতে ঘোর সংসারী—মন নির্লিপ্ত—মোহশূন্য। আমরা সংসারে মুক্ত হ'বার জন্য এসেছি। অবিদ্যার সংসার বন্ধের কারণ বিদ্যার সংসার কর-বন্ধনের কারণ হবে না।

২৬৮। দানেন প্রাপ্যতে স্বর্গম্—দানেন প্রাপ্যতে শ্রীম্। স্বর্গলাভ করতে ইচ্ছা থাকে—দান কর। দানেন প্রাপ্যতে স্বর্গম্।

২৬৯। গুরুতে আত্ম-সমর্পন করার আগেই বিচার—পরে আর বিচার করা চলে না। একবার গুরুতে আত্ম-সমর্পন হ'লে—আর তার বিচার চলে না।

২৭০। সন্দেহের তুল্য পাপ নাই—সন্দেহ করতেই নাই।

২৭১। ভাগ্যকে এড়াতে পারবে না। তোমার ভাগ্যে যা আছে—তা পাবেই। যা ভাগ্যে নাই—তা কিছুতেই পাবে না। নিজের ভাগ্যের দিকে চেয়ে থাক।

২৭২। দোনো নাহি মিলে—রবি রজনী এক ঠাই। যাহা রাম—তাহা কাম নাহি মিলে। যাহা কাম—তাহা রাম নাহি মিলে।

২৭৩। মোর বিষয়ী। গুরুগত প্রাণ—গুরুতে আত্ম সমর্পন—গুরুতে স্নেহ মমতা। ফুলই ছিটাইল—প্রসাদই খাইল—ঘন্টিই লাড়ল বিশ বৎসর। বড়ই দুঃখের বিষয়ী।

২৭৪। তা মা ধা তিনটা বস্তুই দিতে হবে গুরুর চরণে। মন দেওয়া কঠিন। গুরু তখনই পাকাপাকি—যেদিন শিষ্য গুরুর চরণে তন মন ধন সমর্পন করে। রসগোল্লা খাও—খাইলে শিষ্যের শান্তিলাভ হয়—কৈলাসবাসী হইতে পারে। রসগোল্লা খাওয়াইয়া স্বর্গলাভ হইতে পারে। নিবর্বাণলাভ হয় না। আসা যাওয়া থাকবেই। এক রাজা রাজত্ব গুরুর চরণে সমর্পন করে দিল। গুরু পাইয়া বলে—বাবা! এই হাঙ্গামা আমি করতে পারব না। আমার রাজ্য আমার মনে কইরা তুমি রাজত্ব চালাও। আমাকে অনেকে বাক্স খুলে দেয়—বলে বাবা—যা খুসি নেন। আমি কি সব নেই? আমি কি মুঠে মুঠে নেই? বলি—যা নিয়া যা। আমি যা নিবার নিলাম।

২৭৫। কৃষ্ণ প্রাপ্তি হবে কবে? 'আমি' যাবে যবে!

২৭৬। সবর্বতোভাবে দুঃখ নাশ করতে হ'লে—ভক্তি মহারাণী চাই। 'আমি' থাকতে 'তুমি' নাই। 'তুমি' থাকতে 'আমি' নাই। জোরাতালি দিয়া হয় না। হিসাব কিতাব করে করতে হ'বে। 'আমি' নিয়া 'আমি'। 'আমি' দিন দিন বড় হ'য়ে যায়। আমি ব্রজানন্দ প্রতিষ্ঠা করেছি। ঘুরে ঘুরে কাল বাদরের মুখই দরশন হয়। তীর্থ করি—ব্রত করি—ভোগ ভাণ্ডারা লাগাই—ঘুরে ঘুরে কাল মুখই দরশন। দীক্ষা শিক্ষা সবই হয়-কাল বাদরের মুখই মনে পরে। একি জ্বালা—কাল মুখ—বাদরের মুখই চোখে পরে। চরণ ধূলি মাখি—চরণামৃত খাই প্রসাদ খাই—ঘুরে ঘুরে কাল বাদরের মুখই। ঘড় ছাড়লাম—বাড়ী ছাড়লাম—দেশ ত্যাগী হইলাম। সন্ন্যাসী হ'লাম—এক ঘড় ছাইরা অন্য এক ঘড়ে আইলাম। আগে ছিলাম

পাড়াগায়—তা ছাইড়া আইলাম মঠ মন্দিরে—আগে সাদা ধুতি চাদর এখন গেরুয়া—এখন মঠ মন্দিরে থাকি—ঘড় ছাড়লাম কৈ? ঘুরে ঘুরে ঐ কাল বাদরের মুখ। আগে ছিল সতীশচন্দ্র—এখন ব্রজানন্দ। 'আমি' ছাড়লাম কৈ? ছাড়লাম কি? কিছুই ছাড়ি নাই। ঘুরে ঘুরে কাল বাদরের মুখ মনে পরে। তখন সাদা ধুতি—এখন গেরুয়া—ছাড়লাম? ব্রজলাল শুকল—এখন স্বামী ব্রজানন্দ। কি ছাড়লাম? আগেও আমি—পরেও আমি। হ'বে না?

২৭৭। ধর্ম্ম করলে—ধন আপনিই হয়।

২৭৮। গুরুতে মানুষ জ্ঞান যেই জন করে সে জন নারকী—মনে দুঃখের সাগর।

২৭৯। ভক্ত আমার আপন জন। ভক্তের হৃদয় আমার বালাখান ভক্তের হৃদয় আমার আসন পাতি।

২৮০। ব্রজানন্দের সংকল্প সত্য। ব্রজানন্দ যা সংকল্প করে—তা সত্যে পরিণত হয়। ব্রজানন্দের সংকল্প মিথ্যা হয় না। ব্রজানন্দের বেদধবনি।

২৮১। যার কেউ নাই—তার আমি আছি। পতিত পাবন।

২৮২। গুরুর সাথে সম্পর্ক রাখতে হয়—যেমন ছেলে—মায়ের সাথে। গুরুর প্রতি সেই রকম টান হওয়া চাই। গুরুর খোঁজ খবর করতে হয়।

২৮৩। সুখে অহংকারে স্ফীত হ'বে না। সুখে দুঃখে সমান থাকবে।

২৮৪। নিস্বার্থভাবে কর্ম্ম করবে। ফলের আশা করবে না। ফলের আশা না করে কর্ম্ম করে যাবে।

২৮৫। ছয়টা সম্পত্তি আমাদের—টাকা পয়সা, জায়গা জমি ইত্যাদি। সম্পত্তি হ'ল মনকে জয় করা—বাহ্য ইন্দ্রিয়কে দমন করা—সহ্য করা—সহিষ্ণুতা—সহনশীলতা—তিতিক্ষা—বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস—গুরুবাক্যে বিশ্বাস ইত্যাদি।

২৮৬। মানুষ দোষগুণে যুক্ত। দোষও আছে গুণও আছে। দোষ দেখে কাহাকেও উপেক্ষা করতে নেই। স্বামী দেবতা। দোষ করে এলেও পূজ্য। ধান দুবর্বা দিয়া বইরা নিবে—এই স্ত্রীর ধর্ম্ম। দোষ দেখে অবহেলা করবে না।

২৮৭। কামনা বাসনা জন্মের কারণ। কামনা বাসনা নিয়ে সংসার করি—তাই পুনঃপুনঃ জন্ম হয়। কামনা রহিত হলে পুনর্জ্জন্ম হ'বে না। আমার আচরণ দেখ—বাইরে ঘোর বিষয়ী—মনে কিছু নাই। পরিষ্কার।

২৮৮। ভাব আসা কি সহজ? শিশুর মত সরল না হ'লে—ভাব হয় না। মন শুদ্ধ না হ'লে—ভাব হয় না—অভীষ্ট পূর্ণ হয় না।

২৮৯। যজ্ঞাবশিষ্টের অধিকারী যজমান—সর্ব্ব প্রথম প্রসাদ পায়।

২৯০। বৈষ্ণবের চোখে থাকা—ভাগ্যের কাম। বৈষ্ণবের চোখে পড়লে কামাইও মন্দ হয় না।

২৯১। বৈষ্ণব মেয়ে বিয়ে দিয়ে—খোঁজ নেয় না। শ্বাশুরী বলে—বিয়া দিয়া গেল—খবর নেয় না। মেয়ে পুনঃ পুনঃ পত্র লেখে বাপেরে। বাপে হরিনাম করতে করতে এল। বিয়াইন মূর্ত্তি দেইখা আশ্চর্য্য—দেইখাই অগ্নিঅবতার। রাত্রে একটা ভাঙ্গা ঘরে দিছে শয়ন করতে। তার পরে বৌকে জিজ্ঞাসা করে—বাবা কি নিয়ে এলেন? বৌ উত্তর করে না, কাঁদে। পিতার কাছে গিয়ে বলে—কেন তুমি এলে আমাকে কাঁদাতে? পিতার দুঃখ হইল শুনে। শ্রীহরি লক্ষ্মীকে বলেন—এর বাড়ী ভরে ভোগের জিনিষ-পত্র এনে দেও। লক্ষ্মী বৈষ্ণবের বাড়ী ভোগের মাল-পত্র এনে দিলেন বৈষ্ণব সেবার জন্য যত প্রয়োজন। বৌ-এর পিতা বৈবাহিকাকে বলেন—আপনার আত্মীয়-স্বজন সবাইকে নিমন্ত্রণ করুন আপনার যত আত্মীয়-স্বজন আছেন। এত দ্রব্য-সামগ্রী বৈষ্ণব গ্রামের সবাইকে নিমন্ত্রণ করলেন। গ্রামের সকলেই সেবা করে ধন্য ধন্য-মহা কাণ্ড কারখানা। বৈবাহিকা আর লজ্জায় ঘর থেকে বার হ'ল না। বৈবাহিককে আর মুখ দেখান না লজ্জায়।

২৯২। ভগবানের নামে যা অর্পণ করা যায়—তা অমৃত হয়ে যায়।

২৯৩। গোবিন্দের ভোগ—সব এক বারেই দিতে হয়। নিবেদন না করে গ্রহণ করি না। তা না হলে সব মিথ্যা। খাওয়া না ভোগ। গোবিন্দের ভোগ জানবে—খাওয়া মনে কর না—গৃহস্থের ভাব। আর দুটা অন্ন দেই—আর একহাতা ডাল দেই—গৃহস্থের ভাব। গোবিন্দের ভোগ এক বারেই সব নিবেদন করতে হয়।

২৯৪। ছয় মাস যাবৎ মৃত্যু যোগ। যম আশে পাশে ঘুরছে ছয় মাস যাবৎ। মটর একসিডেন্টে মৃত্যু যোগ। পাকিস্থানী সৈন্যের দুইবার বন্দুক উঠান মৃত্যু যোগ। ছয় ছয়টি শিষ্যের একযোগে পাকিস্থানী সৈন্যের গুলিতে মৃত্যু-বরণ—যেমন তেমন ব্যাপার না। ঐ ছয় জনের কল্যানের জন্য মনে হ'ল—একটা শুদ্ধ অনুষ্ঠান—খাদ্যাদি প্রদান করতে হয়। উজানচর যখন ছিলাম ভারত প্রত্যাবর্ত্তন পথে—এই শুভ বাসনা মনে উদয় হয়েছিল। মনে পীড়া দিতে লাগল। পথে আঘাত পাইলাম। বিষয়টি চাপা পরল। এই এক মাস প্রেতাত্মা আবার পাছে আসা যাওয়া করে। একদিন দেখছি কোন প্রার্থনা নাহ-একজন গোলাপ ফুল

নিয়া আসল। যে ফুল নিয়া আসল, মূলত তারে দেখলাম। মুকুন্দকে দেখলাম কাঁদছে। কি করব—এই দুজনাকে দেখলাম।

২৯৫। কর্ম্মফল ভুগ্‌তে হবেই। তবে ঈশ্বরের নাম করলে যেখানে কাল সঁধুত সেখানে ছুঁচ ফুটবে। ভোগ ভুগতেই হবে তবে ভগবানের নাম করলে এই হয়—যেখানে একজনের পা কেটে যাবার কথা ছিল সেখানে একটা কাঁটা ফুটে ভোগ হোল। ঈশ্বরের স্মরণাগত হলে তাঁর নিজের কলম নিজ হাতে কাটতে হয়।

২৯৬। ব্যাধি ও তপস্যা একই জিনিষ; তপস্যার মত ব্যাধিতেও কর্ম্মক্ষয় হয়।

২৯৭। গুরুর কৃপা হলে কিছু ভয় নাই। গুরু জানিয়ে দেবেন তুমি কি তোমার স্বরূপ কি। কৃপা হলে হাজার বছরের অন্ধকার এক মুহূর্ত্তে দূর হয়। সদ্‌গুরু লাভ হলেই জীবের উদ্ধার।

২৯৮। সংসারে থেকেও জানবে এ আমার ঠিক ঘর নয় একটা বাধা মাত্র। শ্রীশ্রীব্রজানন্দের পাদপদ্মই আমার আসল ঘর। যে কোন প্রকারেই হোক সেথায় আমাকে যেতে হবে। শ্রীবৃন্দাবনে মহানিশায় আধ্যাত্মিক তরঙ্গের প্রবাহ চলতে থাকে। সেই সময় সেখানে জপ, ধ্যান করলে প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায়।

২৯৯। বিপদকে যে ভয় করে সে যেন ব্রজানন্দকে না ডাকে। যার উপর তাঁর যত কৃপা তার তত বিপদ জনিত।

৩০০। গুরুশক্তি। যিনি আশ্রয় দিয়েছেন তিনি কোন কালে রুষ্ট হন না। গুরু ইষ্ঠ এবং নিজেকে এক বলে জানবে। ইষ্ট ও জীবাত্মা একই জ্যোতির দুই মূর্ত্তি।

৩০১। মায়ার আবদ্ধ হইওনা। আমাকে সাথী করে সব করবে। সংসার করবে ব্রজানন্দের সংসার। সে সংসার হবে ত্যাগীর সংসার ভোগীর সংসার নয়।

৩০২। ভক্ত আমার প্রাণ। ভক্তকে রক্ষা করা আমার ধর্ম্ম; ভক্তের মুক্তি আমার জীবন বেদ। শান্তি আশীর্ব্বাদ অমোঘ। অশান্তি থাকে না।

৩০৩। আমার এই আসন হতে ও যাহা পাবে, আমা হতেও তাই পাবে। জীব জগতের কল্যাণের জন্যই আসন প্রতিষ্ঠা। আসনই অনন্তকাল থাকবে।

৩০৪। গুরুর অধিক আর কেহ নাই; গুরু সর্বেশ্বর, সকলের নিয়ন্তা ও নির্ব্বাহ কর্ত্তা। তোমরা এই বোধে নাম কর, ধ্যান কর, গুরু চিন্তাকর, দর্শন কর, জপ কর, সেবা কর, পুজা কর, উপাসনা কর। তোমাদের অভীষ্ট লাভ হবেই। অভাব রাক্ষসটির তাড়না সহ্য করিতে হইবে না। কামনা বাসনা পূর্ণ হইবে।

বিপদ আপদ রোগ শোক দুঃখ কষ্ঠ দূরে যাবে। সাপে বাঘে খাইবে না। তোমরা সরল বিশ্বাস নিয়া দিনান্তে একবার অন্ততঃ জয় ব্রজানন্দ বলে আমাকে স্মরণ করিবে।

৩০৫। এ অনিত্য দেহ। তাই তোমাদের নাম দিয়েছি। নাম ধর পার হবে।

৩০৬। গুরুকে দ্বারমে কুত্তেকে মাফিক পড়ে রহো কুকুরের মত আমাদের প্রভুর দ্বারে একনিষ্ট ভাবে তাঁর স্মরণাগত হয়ে পড়ে থাকতে হবে। যে শেষ পর্যন্ত তাঁর আশ্রয়ে পড়ে থাকতে পারবে, তার উদ্ধার।

৩০৭। ব্রজানন্দই দুর্গা, কালী, রাম, শিব, শ্রীকৃষ্ণ আবার ব্রজানন্দই সেই নির্বিবশেষ শুদ্ধ চৈতন্য—সচ্চিদানন্দ।

৩০৮। গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ পারমার্থিক পিতাপুত্রভাব। সর্ব্বস্ব অর্পণ করিলেও গুরুর ঋণ শোধ করা যায়না।

৩০৯। গুরুতে যার সাক্ষাৎ ভগবান বলে বিশ্বাস, তার জন্ম শেষ। যে দিন গুরু মন্ত্র দেন সে দিন পুর্নবার জন্ম হয় এবং পূর্বের যত পাপ সব ধবংস হয়ে যায়। গুরুই সমস্ত পাপ গ্রহণ করেন।

৩১০। শ্রীচরণই যখন তোমার একমাত্র সম্বল তবে তো তোমার তরী ভব সাগর হতে সবচেয়ে আগে ফল পাইয়াছে। আর চিন্তা কি, নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত থাক। পারের তরীতো পেয়েছ।

ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি

ওঁ ব্রজানন্দায় নমঃ

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী চিরস্মরণীয় সাধক ও মহাপুরুষদের মধ্যে, ঠাকুর ব্রজানন্দের স্থান একটু স্বতন্ত্র। কারণ তিনি নিজেই সকলের উপাস্য এবং কোনো দেবতার সাধনা করেন নাই।

তিনি স্বয়ং সাধ্য-সাধক নহেন।

ওঁ নমঃ ভগবতে ব্রজানন্দায় নমো নমঃ

শ্রীশ্রীব্রজানন্দ — যুগাবতার

তরণীকান্ত বসু

যিনি চির-শরণ্য ও বিশ্ববরেণ্য, যিনি পুণ্যশ্লোক ও নিত্য স্মরণীয়, যিনি কুহেলিকাময় জীবনপথের দিশারী, যিনি আমাদের ভবজীবন সমুদ্রে দিগ্‌দর্শী ধ্রুবতারা, তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানিবার চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক, যদিও তাঁহার কৃপা ভিন্ন তাহা জানা অসম্ভব। সাধক রামপ্রসাদ গান করতেন, "কে জানে গো কালী কেমন, ষড়-দর্শনে না পায় দর্শন"। সাধক রামপ্রসাদ যেথায় তত্ত্ববিমূঢ়, বিষয়ী অজ্ঞ অসাধক আমার পক্ষে তাহা অতি দুর্বোধ্য, দুরধিগম্য ও দুরাবগাহ।

তবে আমাদের নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে না থেকে, যার যেরূপ ভাব ও শক্তি, সেই ভাব ও শক্তি পূর্ণভাবে প্রয়োগ করে তাঁহাকে বুঝবার চেষ্টা করা উচিত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষোত্তম ব্রজানন্দ মহাপ্রভুজীউর এই যুগ সন্ধিক্ষণে যুগোপযোগী আবির্ভাব নিরাকার পরব্রহ্মের সাকার মনুষ্য দেহধারী অবতাররূপে ধরায় অবতরণ — আমার এই বক্তব্য এই প্রবন্ধে পরিবেশিত হইল।

যুগ যুগ ধরিয়া বর্ষে বর্ষে শুভ মাঘমাস আমাদের জীবনধারায় একটা মহাশুভ তিথি বহন করিয়া আনে মাঘী পূর্ণিমা তিথি। এই অতি পবিত্র পুণ্যতিথিতে নির্মল পূর্ণচন্দ্রের মত সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা নিয়ে গোলকধাম হতে ধরার বুকে অবতীর্ণ হলেন নারায়ণ — নর দেহ পরিগ্রহ করে যুগাবতার ভগবান্ ব্রজানন্দ — শান্ত, স্নিগ্ধ, ভাস্বর — নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত।

হরে ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে, গৌর হরি বাসুদেব, রাম নারায়ণ হরে; এই নাম নিয়ে এক সময়ে যে দেশ শাস্ত্রজ্ঞানদীপ্ত ব্রাহ্মণকূল ভারত মাতার মুকুটে মধ্যমণির ন্যায় সমুজ্জল ছিল, সেই বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ প্রাধান্য কনৌজে এক সুখ্যাত ভক্ত ব্রাহ্মণ বংশে স্বামী ত্রিপুরানন্দের নন্দন ভগবান শ্রীশ্রীব্রজানন্দ শতাধিক বৎসর পূর্বে এই কলুষসঙ্কুল পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন। ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তাঁর মুখপদ্ম হতে "শিবোহহং" এই অমৃতময়ী বাণী নিঃসৃত হইল। উপস্থিত পুণ্যাত্মাগণ ও তাঁর পিতা ও দীক্ষা গুরু স্বামী ত্রিপুরানন্দ আচম্বিতে এই দিব্যবাণী শ্রবণে বিস্ময়বিহ্বল হলেন ও তাঁকে স্বয়ং "শিব"

জ্ঞানে পূজার্ঘ্য প্রদান করেন, এই দিব্য বাণীতে শ্রীশ্রীব্রজানন্দ আপনাকে "শিব" বলে জগৎ সমক্ষে প্রকাশ করিলেন।

পঞ্চ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মহাপ্রভুজীউর মাতৃবিয়োগ হওয়াতে তাঁর পিতা ও দীক্ষাগুরু স্বামী ত্রিপুরানন্দ মহাপ্রভুজীউকে সঙ্গে লয়ে সংসার ত্যাগ করেন ও সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করেন। প্রায় দুই বৎসর যাবৎ পরিব্রাজকরূপে ভারতের বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতে করিতে অধুনা পূর্ব পাকিস্তানস্থিত ঢাকা নগরীতে বুড়ীগঙ্গা নদী তীরবর্তী কোন এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে বিল্ববৃক্ষ নিয়ে সন্ন্যাসজীবন যাপন করিতে লাগিলেন। এ সময় এক দৈববাণী শ্রুত হইল, "স্বামী ত্রিপুরানন্দ, তোমার পুত্র স্বয়ং ভগবান্ বুড়াশিব। এই শহরের উত্তরাংশে রমনার গভীর অরণ্যে বুড়াশিবের প্রাচীন মন্দিরে আশ্রয় লও।"

সে সময় মহাপ্রভুজীউ সপ্তবর্ষীয় বালক। ত্রিপুরানন্দ স্বামী ও মহাপ্রভুজীউ রমনার শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যে জনশূন্য প্রাচীন বুড়াশিবের মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। শ্রীশ্রীব্রজানন্দের পরবর্ত্তীকালীন জীবন ঘটনাবলীর সহিত যে সমস্ত ভাগ্যবান্ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বা এখনও আছেন, শ্রীশ্রীব্রজানন্দের আদর্শ ও দর্শনের পুণ্যধারা বেয়ে যে সমস্ত ভক্তযোগী জীবনের পিচ্ছিল পথে অকুতোভয়ে দৃঢ় পদবিক্ষেপে মোক্ষের সন্ধানে চলেছেন, শ্রীশ্রীব্রজানন্দ মহাপ্রভুজীউ যে "ভগবান স্বয়ম্ভূ শিব" এ বিষয়ে তাঁরা সকলেই নিঃসংশয়। সেই সমস্ত পুণ্যশীল ভক্ত পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষে অথবা অনুভূতি লব্ধ প্রমাণ পেয়েছেন যে শ্রীশ্রীব্রজানন্দ ঈশ্বরকোটী অর্থাৎ অবতার বা অবতারের অংশ।

কলিযুগের উৎপত্তি হয়েছিল শুক্রবার মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে। ভগবান্ শ্রীশ্রীব্রজানন্দের আর্বিভাবও শুভ মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে। একই মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীব্রজানন্দের আর্বিভাব ও কলিযুগের উৎপত্তি — এক অপূর্ব তিথি সমন্বয়। বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, যখনই ভগবান্ সাকার দেহ পরিগ্রহ করে অবতার হয়ে পাপপঙ্কিলময় জগৎকে উদ্ধারকল্পে ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন, এরূপ বিশিষ্ট তিথিতেই জন্মপরিগ্রহ করেছেন যুগে যুগে। ইতিহাস পর্যালোচনায় ইহার গূঢ় তাৎপর্য এই প্রতীতি হয় যে যাতে জগদ্‌বাসী সহজেই উপলব্ধি করতে পারে যে কোন দেবপ্রতিম সিদ্ধ মহাপুরুষ জীবকল্যাণের নিমিত্ত ধরায় এসেছেন অলৌকিক ঘটনাসম্বলিত এই বিশিষ্ট তিথিতে। পুণ্য বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে ভগবান্ বুদ্ধদেব নবরূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব

ফাল্গুনী পূর্ণিমা প্রদোষকালে শুভ্র পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ভূমিষ্ঠ হন। কথিত আছে সে সময় অন্তরীক্ষে "হরি" নাম কীর্তন শ্রুত হয়েছিল। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের সময়ে প্রাচ্যদেশের আকাশে বিশিষ্ট নক্ষত্রের উদয় হওয়াতে তিনজন সুধী ও জ্ঞানী ব্যক্তির উপলব্ধি হয়েছিল যে কোন ভগবদ্ সদৃশ মহাপুরুষ জন্ম পরিগ্রহ করেছেন ধর্মের গ্লানি অপনোদনের জন্য। নানারূপ মহামূল্য উপহার সম্ভার নিয়ে ওই উদীয়মান নক্ষত্র পরিচালিত হয়ে তাঁরা যীশুখ্রীষ্টের জন্মভূমি বেথেলহেমে উপস্থিত হলেন ও যীশুখ্রীষ্টকে ভগবদ্জ্ঞানে পুজার্ঘ্য প্রদান করিলেন।

দ্বাপরযুগের অবতার ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণ রোহিণী নক্ষত্রাশ্রিত কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে অস্বাভাবিক দুর্যোগপূর্ণ গভীর নিশীথে সুপ্তিমগ্না ধরনীর বক্ষে অধর্মের অতন্দ্র-প্রহরীবেষ্টিত অবরুদ্ধ কারাকক্ষে অবতীর্ণ হলেন। মাতা দেবকী ও পিতা বসুদেব প্রত্যক্ষ করলেন দিব্য আভায় উদ্ভাসিত শঙ্খচক্র-গদাপদ্ম সমন্বিত নারায়ণের চতুর্ভূজ মূর্তি জন্ম পরিগ্রহ করিলেন পুত্ররূপে। ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্বে ও পরে নানারূপ দৈববাণী শ্রুত হয়েছিল।

ভগবান শ্রীশ্রীব্রজানন্দের ঐশ্বরিক পূতজীবনের অধিকাংশ অলৌকিক ঘটনাবলী ও কার্যকলাপ নিগূঢ় রহস্যাবৃত ও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। তাঁর ঐশী শক্তির প্রচ্ছন্ন লীলা যতদূর উদ্ভাসিত হয়েছে, ইহাতে নিঃসংশয়ে এই প্রতিপন্ন হয় যে শ্রীশ্রীব্রজানন্দ পাপী উদ্ধারের নিমিত্ত ও ধর্মসমন্বয়ের জন্য ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন ও অবতাররূপে পূজার্হ, বরেণ্য ও শরণ্য।

প্রায় ৪৫৫১ বৎসর পূর্বে মার্গশীর্ষমাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চ জন্য শঙ্খধ্বনি শ্রুত হয়েছিল। সেই দিব্য নিনাদ দিঙমণ্ডল প্রকম্পিত করে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ধর্ম ও অধর্ম সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হইল। অর্জুন জ্ঞাতিনাশ কুলধর্মের উচ্ছেদ আশঙ্কায় সংগ্রামবিমুখ হয়ে গাণ্ডীব পরিত্যাগ করে বিমর্ষ হয়ে রথে উপবিষ্ট রহিলেন। তখন দ্বাপর যুগের অবতার নবরূপী ভগবান সারথি শ্রীকৃষ্ণ রথারূঢ় সংগ্রামবিমুখ শ্রীঅর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে কতই না উপদেশ দিলেন — দেহীর দেহের নশ্বরতা, মৃত্যুজনিত শোকের অযৌক্তিকতা ও আত্মার অবিনশ্বরতা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিলেন; স্বধর্ম পালনই প্রকৃত ধর্ম — এ সম্বন্ধে বেদশাস্ত্রাদি নিঃসৃত উপদেশ দিয়া অর্জুনের মনে ক্ষাত্রতেজ উদ্দীপনার চেষ্টা করিলেন কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই বিফল দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনার অবতারত্বের অবতারণা

করিয়া বলিলেন — যখন যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি দেহ পরিগ্রহ করে সাকার হয়ে অবতীর্ণ হই; সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদের বিনাশ সাধন ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। আমাকেই সর্বজীবের সনাতন বীজ বলিয়া জানিবে। ("বীজং মাং সর্বভূতানাম্ বিদ্ধি পার্থ! সনাতনম্")।

আমার ভক্তের কখনও বিনাশ নাই। "কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি" সুতরাং তুমি মদগত চিত্ত, মদ্ভক্ত ও মৎপূজক হও। "মন্মনাভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু"। যোগমায়ায় আবিষ্ট বলিয়া আমি সকলের নিকট প্রকাশ নহি; মূঢ় ব্যক্তিরা আমার অব্যয় অজ পরমস্বরূপ না জনিয়া আমাকে দেহধারী মানব বলিয়া গণ্য করে।

"নাহং প্রকাশঃ সবর্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।
মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকোমামজমব্যয়ম্।।"

আমিই সর্বশক্তি সম্পন্ন ভগবান — সাকার নররূপে তোমার সম্মুখে বিরাজমান। হে গুড়াকেশ অর্জুন, আমার কথা বিশ্বাস করে নির্ভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ও পাপী, দুষ্কৃতদের বিনাশ সাধন করে ধর্মরাজ্য সংস্থাপন কর।

শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে অর্জুনের যুক্তিবাদী মন আস্থা স্থাপন করিতে পারিল না — নররপী শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন সাক্ষাৎ ভগবান ও অবতার বলে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। যদিও শ্রীকৃষ্ণের আপনার অবতারত্বের যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যায় অর্জুনের অবিশ্বাসের বাঁধন শিথিল হয়েছিল,তথাপি শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত অর্জুনের যুক্তিবাদী মন পাপী ধবংস করে ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের নিমিত্ত নিরাকার নিরুপাধি পরব্রহ্ম সাকার মূর্ত অবতার শ্রীকৃষ্ণরূপে মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়েছেন বলে গ্রহণ করতে কিছুতেই সায় দিল না। সে জন্য শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্ম স্বরূপ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অর্জুন ভক্তিনম্র চিত্তে বলিলেন, হে কমল পত্রাক্ষ, তোমার বিভূতি মাহাত্ম্য ও যাহা তুমি স্বীয় স্বরূপ সম্বন্ধে (ভগবানের অবতার) বলিলে, তাহা আমি বিশ্বাস করি, তথাপি তোমার ঐশ্বরিক রূপ দর্শনভিলাষী। অর্জুন যদি তাঁর অবতারত্বে পূর্ণ আস্থাবান না হন ও সংগ্রামে বিমুখ থাকেন, তাহলে দুষ্কৃতদের বিনাশ সাধন ও ধর্মরাজ্য সংস্থাপন হয় না। ভগবানের অবতার আড়ালে প্রচ্ছন্নভাবে তাঁর কাজ করে যান কিন্তু সেই কাজ সম্পাদনের জন্য ভাগ্যবানদের ভগবান "নিমিত্ত মাত্র" করেন এবং তাঁদের নিকট ভগবানের অবতার আপনার পরব্রহ্ম স্বরূপ প্রকটিত করেন। শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বে অর্জুনের পূর্ণ বিশ্বাসোৎপাদনের নিমিত্ত ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিব্যচক্ষু দিলেন ও স্বকীয় বিশ্বরূপ প্রদর্শন করে বলিলেন, হে সব্যসাচী, আমি পুর্বেই সমস্ত বীরদিগকে হত করে রেখেছি, তুমি এখন নিমিত্ত মাত্র হও।

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের ভয়াল বিশ্বরূপ দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের অবতার রূপে "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্" দৃঢ় বিশ্বাস করিলেন ও স্তুতি করিলেন।

একমাত্র অর্জুনই শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ ভগবানরূপে প্রত্যক্ষ করলেন ও তাঁকে চতুর্ভুজরূপে দর্শন পেলেন। শ্রীকৃষ্ণও এরূপ প্রত্যক্ষভাবে আপনাকে অন্য কাহারও নিকটে প্রকট করেন নাই। এই কথা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিজেই বলেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবদ্দশায় তাঁর অবতারত্ব (অবতার রূপে জন্ম পরিগ্রহ সম্বন্ধে) গার্গ্য যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাসাদি অতি অল্প সংখ্যক মুনি ও বিদুর, ভীষ্ম প্রভৃতি মুষ্টিমেয় জিতেন্দ্রিয় ঋষিকল্প ধার্মিক ব্যক্তিরই শুধু অনুভূতি গ্রাহ্য হয়েছিল। জনসাধারণ ইহার কোন আভাসমাত্র পায় নাই। ত্রেতাযুগেও আমরা রামায়ণে দেখতে পাই — ত্রেতাযুগের অবতার শ্রীরামচন্দ্রকে মাত্র দ্বাদশজন মুনি নারায়ণ রূপে অবগত ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের ভগবানের অবতার রূপে ধরায় আবির্ভাব সম্বন্ধে জনসাধারণ একেবারেই অবিদিত ছিল। সুতরাং ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র ও দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই প্রচ্ছন্ন অবতার ছিলেন। নির্গুণ অতীন্দ্রিয় ভগবান যখন সগুণ সাকার দেহধারী অবতার রূপে পৃথিবীর কল্যাণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হন, তাঁর কার্যসিদ্ধির জন্য অতি অল্প সংখ্যক পরম সৌভাগ্যবানের নিকট তিনি প্রত্যক্ষ ও প্রকট হন বা তাদের অনুভূতি গ্রাহ্য হন। জনসাধারণের নিকট ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় প্রচ্ছন্ন থাকেন।

ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র ও দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের জীবদ্দশায় ভগবানের অবতার রূপে জনসাধারণের নিকট প্রকটিত হন নাই। তাঁদের তিরোধানের পর তাঁদের মনুষ্য সাধ্যাতীত অলৌকিক কার্যাবলী ক্রমশঃ জনসাধারণের চিত্তে ভগবানের অবতারত্বের রূপরেখার প্রতিফলন করে এবং তাঁরা ভগবানের অবতার রূপে পরবর্ত্তীকালে পূজিত হয়ে আসিতেছেন। নিছক বিশ্বাসের ভেলায় স্মরণাতীত যুগ হইতে এই কলিযুগে এই অবতার পূজা আমাদের নিকট ভেসে এসেছে এবং আমরাও অকুণ্ঠিত চিত্তে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শ্রদ্ধা বিনম্রচিত্তে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের অবতাররূপে পূজার্ঘ দিয়ে থাকি।

"স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে" মহৎ শিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যে সমস্ত ধর্ম ও কর্ম অনুষ্ঠান করেন ও যাহা তাঁহারা প্রামাণিক বলিয়া গণ্য করেন, সাধারণ লোকে

তাহা শাস্ত্রীয় ধর্মীয় বা বৈদিক প্রমাণ বলে তাহারই অনুবর্ত্তী হয় কারণ শীর্ষস্থানীয় শিষ্ট, মহৎ ও সাধুব্যক্তিগণ বৈদিক ও ধর্ম সঙ্গত কর্মানুষ্ঠান করেন; কোনরূপ অবৈদিক বা অশাস্ত্রীয় কর্ম করেন না। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ দেব প্রভৃতিকে আমরা অবতাররূপে ভক্তিভরে পূজা করি। আমাদের এই অবতার পুজার ভিত্তি কোথায়? ইহা বুঝিতে কোন অসুবিধা নাই। ইহার ভিত্তি মহৎ, শ্রেষ্ঠ ও শিষ্ট সাধুব্যক্তিগণের বাক্যের উপর আমাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস। এই অকৃত্রিম অচল অটল বিশ্বাসই ধর্মজগতে অবাস্তবকে বাস্তবে পরিণত করে, অদৃশ্যকে দৃশ্য করে। নিরাকারকে সাকার রূপ দেয়, গুণাতীতকে গুণান্বিত করে।

অবতাররূপে শ্রীশ্রীব্রজানন্দকে বুঝতে হলে সম - সামায়িক ধর্ম-নীতি ও ধর্ম - সংস্কার প্রচ্ছদপটের উপর উপস্থাপিত করে দেখলে ভুলভাবে দেখা হবে — তার প্রতিটি কার্যকলাপের উপর গভীর অর্ন্তদৃষ্টি দিয়া তাঁকে বুঝতে হবে। সেই অর্ন্তদৃষ্টির অধিকারী হলেই ইহা সহজেই উপলব্ধি হবে যে তিনি ভক্ত বা সাধক নন; তিনি সাধ্য বা ঈশ্বরকোটী। অবতাররূপে তাঁর জীবদ্দশায় কার্যকলাপ গভীর রহস্যাবৃত ও প্রচ্ছন্ন। আজ যাহা রহস্যাবৃত ও প্রচ্ছন্ন, কালের ব্যবধানে তাঁর তিরোধানের পর তাহা প্রকটিত হবে সমুজ্জলরূপে জনসাধারণের নিকটে। কালের ব্যবধানগুণে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব বা শ্রীচৈতন্য বা যীশু খ্রীষ্টকে যত প্রকটভাবে ও সমজ্জলরূপে ভগবানের অবতার রূপে জনসাধারণ ভক্তি বিনম্রচিত্তে পূজার্ঘ্য দিয়ে থাকে, তাঁদের জীবদ্দশায় তাঁরা প্রচ্ছন্ন অবতার ছিলেন বলিয়া জনসাধারণ তাঁহাদিগকে ভগবানের অবতার বলিয়া জানিতে পারে নাই। নৈকট্যই অবতারের কার্যকলাপ বুঝবার পক্ষে জনসাধারণের পক্ষে প্রধান অন্তরায়। "It's distance that lends enchantment to the view."

দূরত্ব বা কালের ব্যবধান দ্রব্যগুণকে মহিমায় ও মাধুর্যেপুর্ণ করে আমাদের দৃষ্টিতে। এই দূরত্ব বা কালের ব্যবধান প্রভাবে যুক্তিবাদী সমালোচকদের মন অত্যাশ্চর্যরূপে বিশ্বাসের গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে ও ভক্তিনম্রচিত্তে সাকার নবরূপকে নিরাকায় পরব্রহ্মের অবতার রূপে পুজা করে। শ্রীশ্রীব্রজানন্দের যথার্থ পটভূমি দুঃখদৈন্যক্লিষ্ট ও নানারূপে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের দৈনন্দিন ইতিহাস। প্রত্যহ শত শত আর্ত্তি মানবের আবেদন হৃদয় খুলে নিবেদন হয় তাঁর শ্রীচরণে। ক্ষণকালের মধ্যেই প্রেমানন্দে শান্তিতে হৃদয় ভরে নিয়ে যায় গৃহে — রেখে যায় শত শত জন্মের কলুষের স্তুপ তাঁর আমোঘ শ্রীচরণতলে। এই অত্যাশ্চর্য দিনপঞ্জীর ইতিহাস সংকলন, কালের ব্যবধানেই

শুধু সম্ভবপর। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে বুঝতে হলে কালের ব্যবধান অপরিহার্য। তিনি আমাদের এত নিকটে যে সূর্যতেজের তীব্র ঔজ্জ্বল্যের ন্যায় তাঁর প্রচ্ছন্ন ও রহস্যাবৃত কার্যকলাপ আমাদের স্থূল চোখে ধাঁধার সৃষ্টি করে আমাদের গোচরীভূত হয় না। কোন বস্তুর সমগ্রভাবে সম্যক্ মূল্যায়ণ কর্‌তে হলে কিছুটা দুর হতে দৃষ্টিপাত করা একান্ত প্রয়োজন। আমরা স্থূল দৃষ্টিতে তাঁর যে সমস্ত কার্য অবান্তর বা অকিঞ্চিৎকর মনে করি, তা প্রকৃতপক্ষে কত তাৎপর্য্যপূর্ণ — ইহা শুধু কালের ব্যবধানই প্রকটিত করতে সমর্থ। তবে কি তাঁর অবতারত্বের প্রকাশ অসাড়ভাবে গতানুগতিক কালের ব্যবধানের উপর নির্ভর করে থাকতে হবে? যুগাবতার নিজেই এর উপায় করে যান। অবতারের স্বরূপ উদঘাটন, আচ্ছাদন উন্মোচনের নিমিত্ত প্রতিভাশালী মেধাবী ব্যক্তির জন্ম হয়। তাদের শুদ্ধ মনের সুদূরপ্রসারী কল্পনাশক্তির সাহায্যে সেই কালের ব্যবধান সৃষ্টি সম্ভবপর। মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ রচনা ও বেদব্যাসের মহাভারত প্রণয়ন (শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাসমুনি অবতাররূপে বর্ণিত) এখানে উল্লেখযোগ্য। শ্রীশ্রীব্রজানন্দের দেবপ্রতিম ঋষিকল্প প্রতিভাবান শিষ্য স্বামী ভূমানন্দ বিরচিত "শ্রীশ্রীবুড়াশিব মাহাত্ম্যম্" - এ শ্রীশ্রীব্রজানন্দের অবতারত্ব সম্বন্ধে বিশিষ্ট অবদান আছে। স্বামী ভূমানন্দের লেখনী নিঃসৃত উক্তি এখানে উদ্ধৃত হল।

"সে অচিন্ত্য অব্যক্ত - স্বরূপে,
দেখিয়াছি তোমা বিদ্যমান,
মহাজ্ঞানে পবিত্রিতে ধরা
হে শ্রীগুরো। তব অধিষ্ঠান।"

আমাদের মধ্যে আজ এ কথা যারা বুঝবে না, কাল বুঝবে না, তারা কালে বুঝবে যে শ্রীশ্রীব্রজানন্দ যুগাবতার। কালের ব্যবধানে ভগবানের অবতারের পটভূমিকায় প্রচ্ছন্ন কার্যকলাপ তাঁর পার্ষদবর্গের দ্বারা ক্রমশঃ প্রকটিত হইতে থাকে। অবতার স্বয়ং জীবতাবস্থায় লোকচক্ষুর অন্তরালে যে বীজ বপন করে যান, তাহা উত্তরকালে বিশাল মহীরুহতে পরিণত হয়ে কোটী কোটী জীবের আশ্রয়স্থল হয়।

ওঁ ব্রজানন্দ ওঁ

শ্রী শ্রীব্রজানন্দ বন্দনা

শ্রীরমণী দাস।

হে ব্রজানন্দ, সচ্চিদানন্দ, কৃষ্ণচৈতন্য, গৌরহরি!
তুমি বাসুদেব, রাম, নারায়ণ, ভুবন-ঈশ্বর-ঈশ্বরী! (কোরাস্)
খোদা, গড্, বুদ্ধ তোমাকেই কয়; সৃষ্টি-স্থিতি-লয় তোমাতেই হয়;
তুমি যুগে যুগে উদ্ধারিলে জীবে ধরাধামে অবতরি!
হে জীবনস্বামী, তুমি নাম-নামী; বিশ্বপিতা-মাতা; তুমি অর্ন্তর্যামী;
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তোমারি ধেয়ান করিছে দিবস শর্বরী।
হে সন্ন্যাসরূপী ত্রিপুর নন্দন, নবরূপে তুমি নিত্য নিরঞ্জন;
নদীয়াবিহারী ভক্তচিতচারী, জয় হে ব্রজের হরি!
রাধাপ্রেমেঋণী ছিলে দ্বাপরেতে; সে ঋণ শুধিলে গৌরাঙ্গ রূপেতে;
পুনরবতীর্ণ হ'লে কনৌজেতে ব্রজানন্দরূপে ধরি'!
পঞ্চ শতবর্ষ পরে নবদ্বীপ ব্রজাধামে তব পুনরাবির্ভাব
করিছে সুচনা কোন্ মহাভাব—বল,—লীলাময় হরি!
পাষুশু দু'ভাই জগাই মাধাই পেয়েছিল কৃপা পূর্ব্বে যেই ঠাঁই,
এবারো আসন তথা সংস্থাপন হ'ল কি সে লীলা স্মরি?
ধরণী মাঝারে নূতন বিধান পূর্ণতার তব আদর্শ মহান
অপূর্ণতা যত করুক পূরণ—চরণে প্রার্থনা করি।
অশনি নির্ঘোষে শোনাও এবার 'তত্ত্বমসি, মহাধবনি 'সোহঙ্কার'
চিনুক সকলে স্বরূপ সবার জীবনে তোমারে বরি'!
বেদনা, অবিদ্যা, ত্রিতাপ জালায় করে ছট্‌ফট্ বিশ্বজীব, হায়!
নয়নের জলে বুক যে ভাষায় সতত তোমারে স্মরি'!
বাঞ্ছা কল্পতরু, ওহে বিশ্বগুরু, কর সুশীতল দেহমন মরু
তুমি নিজগুণে কৃপাবারিদানে, দীন দয়াময় হরি!
দাও দরশন, দাও পরশন; কর সুধাময় দেহপ্রাণ মন
সার্থক হোক্ জনম-জীবন নাম রস পান করি।'
নাওহে করিয়া আমারে তোমার, হে পরমারাধ্য কৃপা পারাবার,
মোর তনু-মন-ধন সমর্পণ করিতে চরণোপরি।

A Glimpse into My First Impression

ABOUT GURUDEVA BARJANANDA, MAN-GOD

Tarani Kanta Basu

It is indeed an inconceivable divine blessing bestowed on my humble-self to be associated with **His Most Exalted Holiness Srimad Swami Brajananda Mahaprabhu** for about a quarter of a century. At the very first sight of His serene, calm and tranquil God-like appearance, I was deeply impressed when His Holiness appeared without our knowledge and knocked at the door of my residence at Ballygunge about twenty five years ago, uttering '**SIVA AHAM**'. I was completely bewildered to see Him as I could not recognise Him. (as I did not see Him before) I Then called out my wife to see the God-like Person who was uttering "**SIVA AHAM**" In a hurry my wife came and cried out in great joy, "BuraSiva Brajananda, How fortunate we are Brajananda Baba Himself has come "My wife at once Fell at His feet and asked me to bowdown at His feet, I became hesitant. My wife then cried out," why do you hesitate's Brajananda Baba is **GOD SIVA INCARNATE. HE is not Man**". Strangely enough, within a few days I saw His Holiness for the first time, He apeared before me in a vision as God Siva, and said "I am God Siva known as Bura Siva. I have come down again on earth to remove the sufferings of humanity and spread my Love and Peace Message. His Holiness then began chanting the most remarkable sloka from the Gita.

"Whenever there is decline of righteousness and there is predominance of unright eousness, I make my appearance. For the protection of the righteous, for the destruction of the sinful and for the regeneration and establishment of truth and righteousness, I humanise my Divine Self in every age".

In consecutive three nights His Holiness as God Siva appeared before me in a vision and advised me to remove my doubt about His Human Identity and have implicit faith in His Divinity of SIVA. I began to ruminate on the above thought **IS HE MAN-GOD?** Has Sree Krishna appeared again as Brajananda to substantiate the immortal saying of Sree Krishna in the above sloka of the Gita.

One day, when I was lonely brooding over such thoughts, I suddenly fell into a sort of trance and heard a voice saying : "Take DIKSHA Quickly (Ritual initiation with mantras by a preceptor) from **Brajananda** and overcome all troubles". All these miraculous events happened within a month or so and frightened me so much so I carried out all that was required of me immediately.

Subsequently, within a year the series of miraculous events that took place in quick succession in my family convinced me without a jot of doubt that His Holiness was none but **BURA SIVA HIMSELF**. It may sound absurd and incredible. But this miracle, though not unique in its kind in Indian myths and legends, tends to reveal the fact that such a holy communion with the Super natural Being in a vision or a dream is the product of individual perception born of intuitive introspection, and admits of no interpretation or expression as it is extremly abstruse. Faith is the only vehicle for conveying it to others. To my mind, it is a "Revelation". 'Truth is stranger than fiction'.

To cut short, after my initiation, His Holiness enjoined on me to lead a life of renunciation and abstention as far as possible for a worldly man with secular duties to perform.

"The value of Nama Sankeertan can never be overemphasised. Where there is **NAMA SANKEERTAN**, there is God as God's name is inseparable from Him. God is realisable through NAMA SANKEERTAN. God's name has infinite power inherent in it. Chanting and singing of God's Name with deep concentration of mind is a dynamic force which can work wonders in the world. It washes away all impurities from mind which becomes crystal clear to absorb the reflection of the Supernatural. God's name is the only panacea for destroying the evils in man and for establishing perennial peace in mind. So, Baba, you go on singing Brajananda's Name in season and out of season." – One sunday His Holiness was saying in this strain in my residence. All on a sudden He got up from His Ashan (Seat of Deer skin) and began to dance with His two arms raised upwards in an ecstasy of celestial joy in front of the Deity "Sri Radha Krishna" singing. "**Jai Brajananda, Jai Brajananda**, Jai Brajananda Jai, Haray, Haray" and I felt as if "Radhakrishna" being one – merged in "**Brajananda**" gave a practical demonstration – how to sing God's Name. It reconfirmed my conviction :

BRAJANANDA IS GOD BURASIVA HIMSELF CAMOUFLAGED AS A MAN.

"More things are wrought by prayer, Horatio,

Than your idle philosophy dreams of."

'গুরুধাম' প্রতিষ্ঠার অন্তরালে

পরিমল কুমার দাস

বর্ষশেষ — নূতনের পদধ্বনি, ১৯৬৯ তোমাকে বিদায়, ১৯৭০ — তোমাকে আবাহন করি, হৃদয় শঙ্খে নবীনের সঙ্গীত —

"হে নূতন,
দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ
হে নূতন,
তোমার প্রকাশ হোক কুজ্ঝটিকা করি উদ্‌ঘাটন
সূর্যের মতন।"

পুরাতন বৎসরের নিস্ফল সঞ্চয় আজ যেন নিঃশেষ হতে চলেছে। ঝড় যেমন ঘূর্ণীবেগে বিবর্ণ, বিশীর্ণ বৃক্ষপত্র, ধূলি ও তৃণদল অখণ্ড আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যায়, ঠিক তেমনি পুরাতনের দিকচক্রবাল সচল শুভ্র জীবনের জয় ঘোষণায় চতুর্দিকে ব্যপ্ত করেছে। এই নূতনের, নবীনের, এই মহাজীবনের আবির্ভাব। ঘোর রাজকীয় সমারোহে। তাই পরম বিস্ময়ে তাহাকে শ্রদ্ধা করি —

"রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ী রাজসম
গর্বিত নির্ভয়
বজ্রমন্ত্রে কী ঘোষিলে বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম
জয় তব জয়।"

হে নূতন, তুমি এমনি করে সকল জীর্ণতার মাঝে নব নব রূপে বারবার আত্মপ্রকাশ কর। সকল সৃষ্টির ইতিহাস তাই। পুরাতনকে পিছনে ফেলে নূতনের জয়যাত্রা। আজ চতুর্দ্দিকে নূতনের জয়ধ্বনি। তবু মন চায় অতীতের জীর্ণ অধ্যায়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে। "হে নূতন, তুমি ভুবনে ভুবনে কাজ করে যাও গোপনে গোপনে।" আমি আজ তোমার গোপন বক্ষপুটে অতীত ইতিহাসচারী।

পনেরো বছর আগে ১৯৫৫ ইং ১লা জানুয়ারী মহামিলনের তীর্থক্ষেত্র 'গুরুধাম' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যুগাচার্য্য শ্রীশ্রীব্রজানন্দ। আজ গুরুধাম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী মহোৎসবে আত্মপ্রসাদ লাভ করার দিন নয়, গুরুধাম প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য অনুধাবন করাই এই মহোৎসবের প্রধান কর্তব্য। গুরুধাম প্রতিষ্ঠাতার মর্ত্যে আবির্ভাব ও তাহার মহান উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করিলেই 'গুরুধাম' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য হৃদয়ঙ্গম সহজতর হবে।

মানুষের কল্যাণের জন্য প্রেমের ঠাকুর ব্রজানন্দের মর্ত্যে আবির্ভাব। মানুষের মনে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে সকল ব্যথা ও দুঃখ দূর করে জীবনকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি পথের সন্ধান দিয়েছেন। হিংসা, লোভ ও ক্রোধের বহ্নিশিখায় জর্জ্জরিত পৃথিবীর মানুষকে নূতন মানবধর্মে দিক্ষীত করার উদ্দেশ্যে ঢাকার সুপরিচিত বুড়াশিবধামাধীশ বিশ্বগুরু শ্রীশ্রীব্রজানন্দ প্রেম ও শান্তির স্বর্গরাজ্য "গুরুধাম" প্রতিষ্ঠা করেন।

ব্রজানন্দের জীবনই তাহার বাণী। তিনি আমাদের দেখিয়েছেন আধ্যাত্বিক উৎকর্ষতা লাভের নূতন উপায় — নূতন জীবন চেতনা ও পার্থিব জীবনের নূতন ব্যাখ্যা যাহা জীবনকে পূর্ণ করে তোলে — সর্ব্বপ্রকার মোহান্ধকার দূর করে মুক্তির আলো এনে দেয় জীবনের সর্বদিকে। চির বিচিত্র আনন্দরূপে সেই জীবন নাথকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই — মহান আধ্যাত্বিক জীবন লাভের উদ্দেশ্যে —

"আমার তুচ্ছ দিনের কর্মে
তুমি দিবে গরিমা
আমার তনুর অনুতে অনুতে
রবে তব প্রতিমা।"

আজ গুরুধামের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী দিবসে নতুন জীবনের দীক্ষা নেব। সকল গোঁড়ামি ও সংস্কার থেকে বন্ধনমুক্ত হয়ে উচ্চতর জীবনাদর্শ গ্রহণ করব। স্বপ্নময়, অলস, কীর্ত্তিহীন, পৌরুষহীন জীবন ত্যাগ করে অমৃতময় বৃহত্তর জীবনকে বরণ করব —

"যাব আজীবনকালে পাষাণ কঠিন স্মরণে
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় তাহা
সুখ আছে সেই মরণে।"

এই শুভদিনে সকল সংশয় দূর করে গুরুদেব ব্রজানন্দের রাতুল চরণে আত্মসমর্পণ করব —

"কেন এই সংশয় ডোরে বাঁধিয়া রেখেছ মোরে
বহে যায় বেলা,
জীবনের কাজ আছে — প্রেম নহে ফাঁকি
প্রাণ নহে খেলা"

আজ পুণ্য গুরুধামে হিংসা, দ্বেষ ভুলে প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা নেব। প্রকৃত প্রেম লাভ যে অনন্ত সম্পদ লাভ। যুগাচার্য্য ব্রজানন্দ সকল মানুষের মধ্যে শিবের সন্ধান

পেয়েছিলেন। তাই নররূপী নারায়ণের পূজা তাহার জীবনের প্রধান ব্রত ও ধর্ম। সেই মানবধর্মে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য তিনি চিরদিন সকলকে অনুপ্রাণিত করেন। স্বার্থান্বেষী মানুষ আমরা ভুলে যাই ঠাকুরের সেই বীজমন্ত্র — ভুলে যাই সকলের মাঝে বিরাজমান পরমাত্মারূপী — নারায়ণকে।

আজ আত্মস্থ হওয়ার দিন। সুখ, দুঃখ, আশা, নৈরাশ্যক্লিষ্ট, লাঞ্ছিত, ক্ষুদ্র জীবন নিঃশেষে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং তাহারই উপর ত্যাগের ও বৈরাগ্যের গৈরিক পতাকা উড্ডীন হোক — মহত্তম সত্যের জ্যোর্তিময় প্রকাশ হউক। ধবংস যজ্ঞের পর রুদ্র দেবতা শান্তির অমৃত বাণীতে নবযুগ ঘোষণা করুক —

"জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নিশিখা, লেহি লেহি বিরাট অম্বর
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর
করি ভস্মসার
চিতা জ্বলে সম্মুখে তোমার।"

আজ আত্মসমীক্ষার দিনে সত্যস্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হউক গুরুদেবের আশীর্বাদে 'গুরুধাম' নিখিল মানবের মহামিলনের — তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হউক। হে জীবনবল্লভ ব্রজানন্দ, আমাদের সব আবরণ উন্মোচিত ক'রে নতুন আত্মোপলব্ধি ঘটান —

"এ আমির আবরণ স্খলিত হয়ে যাক,
চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি
ভেদ করি কুহেলিকা
সত্যের অমৃতরূপ করুক প্রকাশ।
সর্ব মানুষ মাঝে
এক চিরমানবের আনন্দকিরণ
চিত্তে মোর হোক বিকিরীত।"

বিঃদ্রঃ ১৯৫৬ সন হইতে 'গুরুধাম' এ দরিদ্র নারায়ণের নিত্য সেবা পূজা হয়ে আসছে আজ অবধি, চলবে অনাদিকাল পর্য্যন্ত এ ভগবান ব্রজানন্দের মুখনিঃসৃত আদেশ। যাহা বর্ত্তমানে দেউন্দি বটতলা গুপ্ত বৃন্দাবন ব্রজানন্দ ধামেও প্রচলিত হয়েছে।

বর্তমানে 'গুরুধাম' তীর্থ ৫৯ এ পদার্পণ করেছে।

পুণ্যতীর্থ গুরুধাম

প্রমথ মিত্র

প্রথম দিন থেকে বাঙ্গুরে প্রবেশের সময় যে গুরু-মন্দির গুরুধাম সকলকে আকৃষ্ট করে — তার প্রতিষ্ঠাতা জীবন্ত ভগবান। ভগবান ব্রজানন্দের স্বীয় আদর্শানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত পুণ্যতীর্থ গুরুধাম। সকল ধর্মীয় গোড়ামি ও হিংসার পথ পরিহার করিয়া প্রেমমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিশ্ববাসীর মনে শাশ্বত আনন্দ অনাবিল শান্তি ও চির সুন্দরের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই ভগবান ব্রজানন্দের ধরায় আবির্ভাব।

প্রতিদিন গুরুধামে ঠাকুর শ্রীশ্রীব্রজানন্দের নাম সংকীর্ত্তন, উপদেশামৃত আলোচনা ও পূজা আরতি হয়। অসংখ্য ভক্ত-শিষ্য পূজা — ভোগ — আরতি দর্শন করেন। নিত্য দীন দরিদ্রের সেবা হয় — ভক্ত-শিষ্যরা প্রসাদ পান। শীত-বস্ত্র — গ্রীষ্ম কালের বস্ত্র দরিদ্র নারায়ণদের মধ্যে বিলি করা হয়। জাতি - ধর্ম নির্বিশেষে দরিদ্র নারায়ণের সেবা হয়।

প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে নাম সংকীর্তন এবং অব্যবহিত পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের চা ভোগ সম্পন্ন হয়। সমাগত ভক্ত শিষ্যগণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। অতঃপর ফল-মিষ্ট নানা উপচারে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্য ভোগ হয় পূর্ব্বাহ্ন নয় ঘটিকার সময়। পূজা আরতি ভোগ দর্শন করেন, গুরু-ভজন নাম - সংকীর্তন শ্রবণ করেন, প্রসাদ পান উপস্থিত ভক্ত-শিষ্যগণ। মধ্যাহ্ন এক ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যাহ্ন ভোগ হয় নানা উপাচারে। উপস্থিত ভক্ত-শিষ্যগণ পূজা দর্শন ভোগারতির ভজন — নাম সংকীর্তন এবং সেবান্তে প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় নাম কীর্ত্তন এবং পরে সন্ধ্যারতি ও সান্ধ্য ভোগ হয়। ভক্ত-শিষ্যগণ সন্ধ্যারতি দর্শন অন্তে অর্ঘ্যম পাঠ করেন এবং প্রসাদ গ্রহণ করেন। প্রতিমাসে ভক্ত-শিষ্য সম্মেলনে এবং প্রতিসপ্তাহে আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা হইয়াছে। মাসিক সম্মিলনীতে এবং সাপ্তাহিক আলোচনা চক্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন-দর্শন বেদবাণী প্রভৃতি আধ্যাত্ম বিষয় আলোচিত হয়।

প্রতি বৎসর বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে গুরুধামে উৎসব পালন করা হয়। পয়লা জানুয়ারী গুরুধাম প্রতিষ্ঠা-দিবস পালন করা হয়। শিবরাত্রি উপলক্ষে গুরুধামে ভক্ত-শিষ্য সারারাত্রি ব্যাপিয়া জাগরণ-ভজন-কীর্ত্তন করেন। পরের দিন পূজা-অন্তে সকলে প্রসাদ পান। শুভ মাঘী পূর্ণিমায় ভগবান ব্রজানন্দের আবির্ভাব উৎসব পালন করা হয়।

গুরু পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীঠাকুর স্থুলে উপস্থিত থাকিয়া ভক্ত-শিষ্যদের আশীর্ব্বাদ করেন। ভক্তগৃহে সেবা গ্রহণ করিয়া ভক্তের গ্রহশান্তি করেন। রথ যাত্রায় ঠাকুর জগন্নাথ বেশে রথারোহন করেন। ঝুলনযাত্রায় ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের বেশে দর্শন দেন। অন্নকুট আর একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব। নানা উপাচারে ঠাকুরের ভোগ দর্শনীয়। সকল উৎসবেই অগণিত ভক্ত-শিষ্য সমাগম হয় অবর্ণনীয় উৎসাহ উদ্দীপনা ও আনন্দের মধ্যে উৎসব সম্পন্ন হয়।

সম্প্রতি এই গুরু-মন্দির গুরুধামের উপর যে শঙ্খচূড়া নির্ম্মিত হয়েছে তার স্থাপত্য বৈচিত্র যে কোন দর্শককে অভিভূত করবে। প্রথমাবধি যে ঘরটিতে বসে বাবা বুড়াশিব তাঁর অসংখ্য ভক্ত-শিষ্যকে দর্শন ও উপদেশ দিতেন সেই ঘরের বা অন্যকোন সংলগ্ন ঘরের কোন পরিবর্ত্তন না করে প্রচুর অর্থব্যয়ে স্থপতি যে সুউচ্চ মন্দিরের নূতন রূপ ও নব কলেবর দিয়েছিল, তা যে কোন দ্রষ্টার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে। জীবন্ত ভগবানের মধুর হাস্য, ব্যক্তিত্ব, ঔদার্য্য এ মন্দিরের প্রতি অনুতে অনুতে বিদ্যমান।

"হরে ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে,

গৌরহরি বাসুদেব, রাম নারায়ণ হরে।"

গুরু-শিষ্য সংবাদ

(শিষ্য তরণীকান্ত বসুকে লিখিত গুরুদেবের পত্রের অংশ,
যাকে আমি তরণী জেঠামশায় বলে ডাকতাম)

শিষ্য ঃ বাবা, সংসার বড় বিষম স্থান। বাত্যাতাড়িত তরণীর মত মন সততই চঞ্চল; গন্তব্যস্থলে পৌঁছান বড়ই দুষ্কর। আমার ভক্তিও নাই;মানসিক শক্তিও নাই। কি করা কর্তব্য?

উত্তর ঃ "আমার সব কিছু বরণ করে নিলেই তোমার ভক্তি অচলা হয়ে যাবে। আমার ইচ্ছার সাথে তোমার ইচ্ছা মিলে গেলেই হয়। তোমার প্রকৃতির সাথে আমার প্রকৃতির মিল থাকলেই ত হয়ে যায়। আমার সব কিছুই তোমার মিঠা লাগা চাই, তা হলেই যে কোন সংশয় থাকে না। ভক্তি অচলাই থাকে, বিশ্বাস টলে না। বিশ্বাস অটুট রাখতে হ'লে Complete Surrender করতে হয় (সম্পূর্ণ শরণাগত)। নিজের অস্তিত্ব থাকা পর্য্যন্ত নয়। শুকদেব জনকের কাছে ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখে কি জনক কয়েকটি উলঙ্গ সুন্দরী যুবতী মেয়ে কোলে করে বসে। দেখেই তাঁর ঘৃণা হ'ল। এর কাছে উপদেশ নিব? তৎক্ষণাৎ ফিরে চললেন, ভক্তি বিশ্বাস তাঁর সেখানেই চট্‌কে গেল। জনক টের পেয়ে তৈলপূর্ণ একটী বাটী দিয়ে বললেন, তুমি আমার রাজপুরীটা দর্শন করে এসো, দেখো তৈল যেন এক ফোঁটা মাটিতে না পড়ে;তা হ'লে তোমার শিরচ্ছেদন হবে। এই প্রহরী তরবারী হস্তে তোমার পিছনে রইলো। শুকদেব আর পুরী দেখবেন কি? তাঁর মন তো বাটীর উপর। তেমনি আমার মন গুরুমুখী হয়ে আছে। আমার কাছে স্ত্রীই বা কি, আর পুরুষই বা কি;উলঙ্গই বা কি, কাপড় পরাই বা কি? বাবা তরণী, তবেই দেখ, সবই মনে। মন পাখীকে এবার "জয় গুরু" বলে ধবংস করে ফেল"।

শিষ্য আপনি আমাদের ভুলে থাক্‌লে আমাদের দুর্গতি দূর হবে কি করে? সংসারের ঘূর্ণীপাকে নাজেহাল হয়ে পড়ছি।

উত্তর ঃ ভক্তের কাঙ্গাল কি ভক্তকে ভুলতে পারে? যার জন্য আমাকে এই হাড় মাংসের দেহ ধারণ করতে হলো। গুরুতে মন রেখে বিদ্যার সংসার কর্‌তে হবে। আর অবিদ্যার সংসার রিপু নিয়ে সংসার। বিদ্যার সংসারের নাশ নাই। গুরুতে বিশ্বাস রাখ, মনপ্রাণ সমর্পণ কর, সব হবে। আমি বিশ্বাস রেখেছি, মনপ্রাণ সমর্পণ করেছি, তাই অমর লোকে বাস কর্‌ছি। তুমিও আমার মত হও।

শ্রীশ্রী বুড়াশিব ধাম
রমনা, ঢাকা
১৩।৬।৬৬

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ।

যা চেয়েছি তা পেয়েছি

রামকৃষ্ণ পাল

ছোটবেলা হতেই আমি গান - বাজনায় যেতাম, এমনকি — কোন জায়গায় নামকীর্তন, মনসামঙ্গল, হরিকীর্তন, পাঠ ও মহোৎসব হলে খুব আনন্দের সহিত যেতাম, সাধুদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতাম, সাধুরাও আমার সঙ্গে বেশ আলাপ করত। তখন ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই বুঝি না, তবে একটু ভাল লাগত। স্কুলের পড়া শেষ করে গ্রাম থেকে ঢাকা শহরে আসি এবং কর্মজীবন আরম্ভ করি। দেশের মত ঢাকাতেও হরিসভায় রামকৃষ্ণ মিশনে, মধ্য গৌড়ীয় মঠে যাতায়াত করি। কোন প্রকার উৎসবাদির সংবাদ পেলেই সেখানে চলে যাই এবং ওখানকার সাধু - সন্ন্যাসীদের বক্তৃতা শুনি, ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই বুঝি না।

ঢাকায় ওয়াইজ ঘাটে থাকি। শাখারী বাজারের কয়েকটি ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্বভাব, সামনে ছিল শিবরাত্রি, তাদের সঙ্গে বুড়াশিববাড়ী শিবরাত্রি উৎসবে ভলাণ্টিয়ারি করতে যাই। খুব ভীড়, ধাক্কাধাক্কি করে পুণ্যার্থী আবাল - বৃদ্ধ - বনিতা দলে দলে শিবের মাথায় জল ও পূজা দেওয়ার জন্য মন্দিরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মন্দির হতে ঘন ঘন ধবনি হচ্ছে "জয় বুড়াশিব কি জয়"! "জয় বুড়াশিব কি জয়" অগণিত নরনারী সমস্ত রাত্রি প্রহরে প্রহরে পূজা দেয়, বহুদূর দেশ থেকেও অনেক পুণ্যার্থী পূজা দিতে আসে। আমরা মাঝে মাঝে সাধু বাবার কাছে গিয়ে প্রসাদ চেয়ে নিতাম। বেশির ভাগ সময়ই তিনি বসে থাকতেন পরণে শুধু একটু নেংটি। এবারই আমি প্রথম তাঁহাকে দেখি।

কোন সময় পল্টন বাজার কি রমনা গেলেই একবার ওই নেংটা সাধুর মন্দিরে যাই, কোন কোন সময় ভিতরে গিয়ে প্রণাম করি, আবার কোন কোন সময় লোক জন দেখে বাহির থেকেই চলে আসি। বাড়ি থেকে একখানা চিঠি পেলাম বড়দাদা ও দিদি দীক্ষা নিবেন আমাকে বাড়ি যেতে হ'বে। বাড়ি গেলাম দীক্ষার আড়ম্বর ও গুরুদেবকে দেওয়ার জিনিষপত্র দেখলাম সে এক বিরাট ব্যাপার। কয়েক বৎসর পরে আমার দিদি আমাকে দীক্ষা নিতে বলেন। বাড়িতে আমি তাহাদের গুরুদেবের ২।৩ খানা পূরাতন চিঠি দেখি ওই চিঠিতে লেখা ছিল তোমার গুরুভাইয়ের পৈতা হবে এসময় ৫০্ টাকা পাঠাবে। আর এক চিঠিতে লেখা ছিল তোমার গুরুদেবের চরণ খালি তার জন্য ১ জোড়া বিনামার প্রয়োজন এবং আরও অনেক কিছু। তখন থেকে আমার মনে সংসারী

গুরুর উপর ভক্তির ভাব কম। মনে মনে ভগবানকে বলি — "হে ভগবান তুমি আমাকে ত্যাগী ও সন্ন্যাসী গুরু মিলাইয়া দিও।" অর্থাৎ যে গুরুর কোনরূপ চাহিদা থাকিবে না এইরূপ গুরু যেন পাই। ঠিক তাই হল, একদিন শিবরাত্রি উপলক্ষে আমি ও আমার স্ত্রী শিব মন্দিরে পূজার জন্য যাই শিবলিঙ্গে জল ফুল দিয়ে ওই নেংটা সাধুর মন্দিরে যাই এবং চরণ ধূলা গ্রহণ করি, তখন সাধু বললেন — বস। কিছুক্ষণ পরে আমরা বললাম এখন যাই — তখন তিনি বল্লেন প্রসাদ নিয়া যাও — আবার এসো। প্রসাদ নিলাম এবং চলে আসলাম। আমার স্ত্রী মাঝে মাঝে আমাকে দীক্ষা নেওয়ার কথা বলাতে আমি রাগ করিতাম এবং বলতাম বেশতো নেব এত ব্যস্ত কেন — গুরু দেখিয়া দীক্ষা নিতে হয়। স্ত্রী দীক্ষা নেওয়ার জন্য খুব ব্যাগ্র হয়ে গেল তখন আমি তাকে নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে, মধ্য গৌরীয় মঠে নিয়ে ওই মঠের নিয়ম কানুন অবগত হই। আর ২।১ জন গৃহী গুরুর কথা বলি। তখনও আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি "হে ভগবান তুমি আমাকে ত্যাগী গুরুর সন্ধান দিও" তা হলে আমার জীবন ধন্য মনে করব। তখন মোটামুটি ঠিক হইল মিশন থেকেই দীক্ষা নিব।

ভগবানেরই ইচ্ছা — কোন কারণে একদিন ভোর বেলা স্ত্রীকে বলি — চলো শিববাড়ি যাই — শিববাড়ি গেলাম সাধু বাবাকে প্রণাম করাতে তিনি বললেন বস বাবা — প্রসাদ নিয়া যাও, স্ত্রীকে বলল বস মাই — প্রসাদ নেও। দীক্ষার কথা বলাতে স্ত্রীকে বলি যে গুরু সহজ নয় এবং খুব চিন্তা ভাবনা করিয়া গুরু ঠিক করতে হয়। তখন আমার স্ত্রী বলল আর বেশী ভেবে কোন লাভ নাই চল আমরা ওই শিববাড়ির সাধু বাবার নিকট, দীক্ষা দিবেন কিনা তাহা প্রথম জিজ্ঞাসা করে দেখি। স্ত্রীর ব্যাকুলতায় একদিন সন্ধ্যার পর দুইজনেই শিববাড়ি যাই এবং সাধুবাবাকে প্রণাম করে প্রসাদ নেই। তখন দীক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন বেশতো নিবে। তখন আবার জিজ্ঞাসা করলাম কী কী লাগবে — তিনি বললেন — কিছুই লাগবে না — এটাতো দোকান নয় যে পয়সা দিয়ে জিনিস কিনতে হ'বে। তোমাদের প্রাণ চায় ত চলে আসবে। এই কথা বলিয়াই তিনি উপরের কোঠায় উঠিতেছিলেন পিছনে পিছনে গিয়ে আবার বললাম দিন দেখিয়া দিন। তিনি দিন করে দিলেন এবং বললেন স্নান করে শুদ্ধ মনে চলে এস। তখনও মনে আমার, বহুদিনের আকাঙ্খিত ত্যাগী গুরুই ত আমি চেয়েছিলাম।

বাসায় এসে স্বামী - স্ত্রীতে চিন্তা করছি যে কি ভাবে খালি হাতে একটা মন্দিরে যেয়ে দীক্ষা নিব। দীক্ষার পূর্বের দিন হঠাৎ আমার স্ত্রীর একটা কথা মনে হইল সে

আমার পাওনাদারের স্ত্রীর নিকট গেল এবং সেখানে দীক্ষার কথা বলাতে ওখান থেকে ১০৲ (দশ টাকা) পেল, আমি অন্যত্র যেয়ে ১০ (দশ টাকা) পেয়ে আসি, তখন আমাদের মনে একটু আনন্দের আভাষ এল। এর পরেও স্ত্রীর লুক্কায়িত ও গচ্ছিত টাকা কিছু বাহির হইল। তাহা দ্বারাই মন্দিরের ভোগের জন্য কিছু চাউল-ডাইল তরি-তরকারী নিয়া মন্দিরে পৌছাই। ঠিক সময় মতই তিনি আমাদিগকে উপরের ঘরে নিয়া গেলেন দুজনকে বসায়ে পূজা-অর্চ্চনা করে দীক্ষা দিলেন। তখন তিনি বললেন বাবা রামকৃষ্ণ, বীণা মাই আজ থেকে তোমরা আমার সন্তান তোমাদের সমস্ত দায়িত্বই আমি গ্রহণ করলাম, আজ থেকে তোমরা ধন্য হ'য়ে গেল, তোমাদের আর চিন্তা নাই আরও অনেক কিছু। সন্ধ্যা আরতির পর ভোগের প্রসাদ পাই এবং বিদায় নেই। যাহারা দর্শনে আসেন তাহারা সকলেই "বাবা" সম্বোধন করে কথা বলেন। এর-পর থেকে আমরাও "বাবা" সম্বোধন করি। সর্বদা মুখে যেন মধুর হাসি লেগে আছে কত লোক কত ভাবে কথা জিজ্ঞাসা করছে একের পর এক উত্তর দিতেছেন। কিইবা স্মরণ শক্তি আর কিইবা ধৈর্য। বাবার ধৈর্যের কথা বলা অসম্ভব। সর্বদা ভোর ৭টা থেকে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত একভাবে এক আসনে বসে আছেন ভক্ত-শিষ্যরা যাহা ভোগের জন্য আনিতেছেন বাবাও তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া উপস্থিত ভক্তশিষ্যদের প্রসাদ দিতেছেন। বাবার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাবা কোন সময়েও কাহার নিকট হইতে কিছু চাহিয়া নেন না। ভক্ত-শিষ্যরা আপনা হইতেই দিতেছেন; বাবা বলেন শিবের ভাণ্ডারে কোন জিনিসের অভাব নাই, প্রকৃতই আমরা তাই দেখেছি। ভোগের জন্য ভারায় ভর্তি জিনিস আসিতেছে।

বাবার নাম ব্রজানন্দ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রজের সকলকে আনন্দ দিয়েছেন, — বাবাও তাই — আমাদের ভক্ত-শিষ্যদের আনন্দ দিতেছেন। তাঁর শ্রীচরণ দর্শন স্পর্শনে দেহে কোনরূপ ব্যধি থাকে না, পেটে ক্ষুধা থাকে না — কী যেন অপার মহিমা। বাবার অনেক অলৌকিক ঘটনা আছে তাহা অনেক ভক্ত-শিষ্য জানেন। ছোটদের সঙ্গে গোপালের মত ব্যবহার, বিরক্তের ভাবে মোটেই নাই। যেন নিশ্চল শিবলিঙ্গ।

যখন ঢাকায় ছিলাম তখন প্রায়ই শিবধামে যেতাম, যদি ৩।৪ দিন বাদ পরত বাবা সংবাদ দিতেন, যাওয়ার মুহুর্তেই জিজ্ঞাসা করতেন কি বাবা রামকৃষ্ণ এ কয়দিন যে দেখি নাই, বাবার আদেশ নিয়াই ঢাকা ছেড়ে আসি।

গুরুদেব শ্রীশ্রীব্রজানন্দ পশ্চিমবঙ্গবাসী ভক্ত-শিষ্যদের একস্থানে মিলনের জন্য

কলিকাতাস্থ বাঙ্গুর এভিনিউতে বহু অর্থব্যায়ে সুউচ্চ সুন্দর, মনোরম 'গুরুধাম' মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন, এই মন্দির বর্ত্তমান যুগের শিল্পকলার নিদর্শন স্বরূপ। বাঙ্গুর এভিনিউতে প্রবেশ করার পথে প্রথমেই মন্দির। ভক্ত-পথচারীরা-যাতায়াতে শ্রীশ্রীব্রজানন্দের প্রতিকৃতিতে মাথা নত করেন।

বিজয়া সম্মিলনীর পর থেকেই এখন প্রতি রবিবার বেলা ৫টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত ভগবান শ্রীশ্রীব্রজানন্দের লীলা বর্ণনা হয় এবং কীর্ত্তন হয়। এই দিন আমাদের গুরু-ভাই-বোনদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ভাতৃ - বন্ধন দৃঢ় হয়। এখন থেকে আমাদের ভক্ত-শিষ্যদের মন্দিরের সকল রকম কাজের প্রতি সর্ব বিষয়ে লক্ষ্য রাখা এবং যাহাতে ভগবান শ্রীশ্রীব্রজানন্দের নাম প্রচার হয় তাহার ব্যবস্থা করা অতি প্রয়োজন। যাহাতে ধামের সুনাম হয় তাহার দিকে লক্ষ রাখিতে হইবে। হে ভগবান ব্রজানন্দ তুমি আমাদের মনের মলিনতা দূর করিয়া সৎপথে মতি দিও, তোমার নামের 'গুরুধাম' যেন চীর উজ্জল হ'য়ে থাকে। বিশ্ববাসী যেন তোমার জয়গান গায়। আমি মূর্খ আমার কোনরূপ লেখার অভ্যাস নাই, শুধু মনের আবেগে শ্রীশ্রীব্রজানন্দের শ্রীচরণ ভরসায় সামান্য ভাব প্রকাশ করিতে চাহিয়াছি। আমার শেষ কথা এই যে, আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে, আমি যেন একজন ত্যাগী গুরু পাই। তাই যা চেয়েছি তা পেয়েছি।

"জয় ব্রজানন্দ হরে"

বিঃদ্রঃ এই পরমভক্তই বৃন্দাবন বুড়াশিব ব্রজানন্দধাম এর সেবায়েত ছিলেন, তিনি বৃন্দাবন ধামেই ঠাকুর ব্রজানন্দের পাদপদ্মে আশ্রিত হয়েছেন। ধন্য তুমি বাবা রামকৃষ্ণ ধন্য তোমার আরাধনা। প্রণাম তোমায় -

---

ব্রজানন্দ ধর্ম ও আদর্শ

শ্রীরমনীমোহন দাস

জ্বালা। — জ্বালা। — শুধু জ্বালা। অন্তহীন জ্বালা ও দুঃসহ বেদনায় জর্জরিত বিশ্বমানব আজ নিপীড়িত ও বিপর্যস্ত। এ জ্বালা — এ বেদনা তার অন্তরে বাহিরে। কোথাও ইহা ফল্গুধারার ন্যায় অন্তঃসলিলা, — আবার কোথাও ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মতই গর্জন মুখর। শুধু আমাদের সমস্যা সঙ্কুল পশ্চিমবঙ্গেই বা ভারতবর্ষেই নয়, লক্ষ্মী কুবেরের ঐশ্বর্য ভাণ্ডার আমেরিকা অথবা বিশ্ব সাম্যবাদের পীঠভূমি রাশিয়া, চীন, জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে — অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বত্রই দুঃখ, বেদনা, অশান্তি, নিরানন্দক্লিষ্ট মানুষের করুণ অসহায় অবস্থা চিন্তাশীল সমাজ - সচেতন মানবের নয়ন-মনের পক্ষে পীড়াদায়ক হবে নিশ্চয়ই। ভীত, সন্ত্রস্ত, বিভ্রান্ত বিশ্বমানব আজ যেন তার জীবনের সকল সুষমা, সকল বৈভব হারিয়ে ফেলেছে। জীবনের প্রতি নেই তার কোনও শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, মমত্ব ও মর্যাদাবোধ। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ আজ, তাই, তিক্ত, কপট ও অবাঞ্ছিত। তদুপরি জ্ঞান সমুদ্র মন্থন করে বিজ্ঞান নিখিল মানব সমাজের জন্য যে রত্নরাজি আহরণ করছে — তার সঙ্গে নিয়ে আস্‌ছে ভীতি, হিংসা, বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের মথিত মরণশীল হলাহল — বিশ্ববিধ্বংসী শক্তিশালী পারমাণবিক বোমা, হাইড্রোজেন গ্যাস্ প্রভৃতি মারণাস্ত্র প্রতিযোগিতা। অসীম-শক্তি ক্ষমতার অভিমানে মোহান্ধ, উন্মত্ত, ক্ষুদ্র মানবের হস্তে আজ সৃষ্টি ধ্বংসক্ষম প্রজ্বলিত মশাল। এ কোন্ আসন্ন মহাপ্রলয়ের পুর্বাভাস কে বল্‌তে পারে? বিপর্য্যয় — জীবনের প্রতিক্ষেত্রে — ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে, শিক্ষায় সংস্কৃতিতে। — দুর্য্যোগ বিশ্বপ্রকৃতিতে। সুন্দর এ ধরণী সুর বিরোধী অসুরের প্রলয়-তাণ্ডবে হয়ে উঠেছে অসুন্দর নোংরা আবর্জনার - স্তুপ। সৃষ্টির এ দুর্দশা অভূতপুর্ব। সমগ্র পৃথিবী আর কখনও এরূপভাবে সামগ্রিক ধ্বংসের সম্মুখীন হয় নি। সভ্যতার এরূপ সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে — বিশ্বসমাজের এম্ববিধ বিস্ফোরক পরিবেশের মধ্যেই — "পরিত্রানায় সাধুনাং, বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্, ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" বলে নেমে আসেন এ মাটির পৃথিবীতে মানুষের প্রাণের ঠাকুর মহাবিপ্লবী 'সত্য - শিব - সুন্দর' — সুন্দর তার বিপন্না সৃষ্টিকে রক্ষা করবার জন্যে। বিশ্বের বিভিন্ন অংশে, বিভিন্ন যুগে, বিভিন্নরূপে এভাবে কতবার যে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ দেব, মহাবীর জৈন, যীশুখ্রীষ্ট, হজরত মহম্মদ, কন্‌ফুসিয়াস্, জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য,

নানক, কবীর, চৈতন্য মহাপ্রভু প্রমুখ যুগন্ধর মহামানবদের মধ্যে আমরা আমাদের ধ্যানাতীত, জ্ঞানাতীত সাধনার ধন জীবন দেবতাকে দর্শন করে কৃতার্থ মনে করি নিজেদের।

সব কিছু ধারণ করে ধরণী; আর ধরণীকে ধারণ করে আছে ধর্ম। ধৃ ধাতু + মন্ প্রত্যয় যোগে ধর্ম শব্দের উৎপত্তি। মেরুদণ্ডী প্রাণীর মেরুদণ্ডের মত ধর্ম জগতের গতি শক্তি তথা অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য্য।

ভগবান ব্রজানন্দ বলেন, বিশ্ব কল্যাণধর্মী কর্ম ও অনুশাসনই হচ্ছে ধর্ম। যে কর্ম ও নীতি দ্বারা বিশ্বজনীন কল্যাণ সাধিত হয়;— যাহা শুধু কোন দেশ, জাতি, সম্প্রদায়, সমাজ, দল বা ব্যক্তির পক্ষেই কল্যাণকর নয়, সমষ্টির পক্ষে সামগ্রিকভাবে কল্যাণকর! অর্থাৎ যে কর্ম ও নীতি সুন্দর এ ধরিত্রীকে আরো সুন্দর, আরো মধুর, আরো পরিপুর্ণ করে;হিংসা, দ্বেষ, বিভেদ, বৈষম্য, শোষণ, হনন, অভাব, অভিযোগ, অত্যাচার, অবিচার, অনাচার, রিপুর প্রভাব প্রভৃতি পাপ, তাপ, জ্বালা, অশান্তি, নিরানন্দের কবল থেকে রক্ষা করে, — তার অস্তিত্বকে দৃঢ়তর করে — তাই হচ্ছে ধর্ম-যা সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে তিনি অবতীর্ণ হন। সহজ ভাষায় আদর্শ হচ্ছে — বিশ্বের পরিপূর্ণতা। আর আদর্শ রূপায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম ও নীতিই হচ্ছে ধর্ম। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ও ধর্মের কোন পরিবর্তন নেই — এ হচ্ছে শাশ্বত সনাতন। বিভেদ বৈষম্য যা কিছু দেখা যায় সবই মানুষের গড়া। মানুষ তার শিব ভাব ছেড়ে, জীব ভাব নিয়ে স্বভাব সিদ্ধ সংকীর্ণ ও অনুদার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সত্য - শিব - সুন্দরকে অসত্য-অশিব ও অসুন্দর রূপে গ্রহণ কর্‌ছে। আর তার ফলশ্রুতিই হচ্ছে আদর্শ-বিচ্যুতি ও ধর্ম্মভ্রষ্টতা — যা সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন মতাদর্শের সহিষ্ণুতা-বিহীন বিরোধ; — এবং যে বিরোধের ফলের ভেতরেই রয়েছে বিশ্বধ্বংসের সর্বনাশা বীজ পারমাণবিক অস্ত্র, হাইড্রোজেন গ্যাস ইত্যাদি মারণাস্ত্র প্রতিযোগিতা। বিশ্বপরিবেশ আজ সবিশেষ অগ্নিগর্ভ; মানবজাতি বিভ্রান্ত ও দিশেহারা অসহায় ভাবে। সভ্যতার এ হেন চরম বিপর্যয়ের যুগে যুগাবতার ভগবান ব্রজানন্দ মহাপ্রভু উদাত্ত কণ্ঠে বল্‌ছেন, "হে মানব, হে নারায়ণ, মাভৈঃ, মাভৈঃ! 'তত্ত্বম্‌সি'! — ভয় নাই, — ভয় নাই। তুমিই সেই পরমপুরুষ। আত্মানম্ বিদ্ধি — নিজেকে জান! বল, "শিবো হম!" শিবোহম! — আমিই শিব, আমিই শিব! জোর করে প্রাণ ভরে বল, — আমি ব্রজানন্দরূপী ব্রহ্ম!" — দেখ্‌বে সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়; — 'বসুদেব কুটুম্বকম্', সবই তোমার আপন জন — ঘরে ঘরে তোমার প্রাণপ্রিয় জ্ঞাতি।

বিশ্বপিতার সন্তান তোমরা — শান্তি-প্রেম-আনন্দের ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করে আহরণ কর মৃত্যুনাশী অফুরন্ত সুধাভাণ্ড — অনন্ত ঐশ্বর্যরাশি আর - হয়ত তৎসঙ্গে উঠে আস্‌বে ত্রিলোকবিধ্বংসী অবাঞ্ছিত গরলরাশিও। এমতাবস্থায় পিতৃ আদর্শ, ঐতিহ্য ও বৈভবের সঙ্গে তোমাদের যৌথ প্রয়াসে আহৃত যা কিছু লাভ ক্ষতিকে তুল্যাংশে ভাগ করে নাও সবাই। হে মানুষ, হে অমৃতের সন্তান, বাঁচবার শক্তি ও অধিকার তোমাদের আছে। ওগো মহাবিপ্লবীসত্বা, চলমান ঘটনার ধ্বংসাভিমুখী দুর্বার প্রবাহে অসহায় ভাবে ভেসে যাওয়ার জন্যে আসনি তোমরা এই ধরণীর বুকে। এ প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত, কল্যাণমুখী করবে তোমরা। গভীর নৈরাশ্যের অন্ধকারে তোমরাই জাল্‌বে আশার সুউজ্জল আলো — শুরু কর্‌বে মানব সভ্যতার গৌরবপূর্ণ জয়যাত্রার পথে এক চির নবীন চির ভাস্বর, সুমহান অধ্যায়! জীবনের সর্বস্তর থেকে জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ্, রাজনীতিবিদ্, শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক, শ্রমিক, মালিক, শাসক, শাসিত, প্রেমিক, ধার্মিক, সাধক, চিকিৎসক প্রভৃতি সকল চিন্তানায়কগণ, তোমরা সম্মিলিত হও — সংঘবদ্ধ হও বাঁচবার তাগিদে — ত্যাগে-ভোগে জীবনকে নিবিড়ভাবে আস্বাদন কর্‌বার প্রেরণায়। গভীর হতাশা ও নিদারুণ-আতঙ্কগ্রস্ত, বিপন্ন উদ্‌ভ্রান্ত মানবজাতির সম্মুখে উপস্থাপিত কর বিশ্বজনীন কল্যাণধর্মী এক সুমহান উন্নততর জীবনাদর্শ অনন্তকাল ধরে যা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মত সব কিছুকে আকর্ষণ করেই চল্‌বে! পৃথিবীর সর্বাংশে সর্বদেশে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে এ মহাভাবের বীজ ছড়িয়ে দাও — যে আমরা সবাই এক পরম পিতার সন্তান, যৌথ পরিবারভুক্ত। আমাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ হবে সহজ, সরল, মধুর ও অকপট। আমরা এক ধর্ম, এক দেশ, এক জাতি এক সভ্যতা ও এক সমাজ ভুক্ত। জীবনের বিকাশের সুযোগের তুল্যাংশ ভাগী। — দেখ্‌বে সব কিছু হবে মধুময় — অমৃতময়।

অহেতুকী কৃপা

বীণা রাণী পাল

আমি ঢাকাতে যখন ছিলাম তখন একবার স্বামী স্ত্রীতে শিবরাত্রির উপবাস করি। ঢাকা নগরীতে বুড়াশিবের মন্দির জাগ্রত শুনে সেই মন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢালিতে যাই। মন্দিরে যাইয়া শিবের পূজা করিয়া পরে সাধুর মন্দিরে গেলাম এবং সাধুকে প্রণাম করিলাম। দেখিতে পাইলাম গৌরবর্ণ নেংটি পরণে এক স্থুলকায় দেহধারী। দেখিয়া মনে হইল প্রকৃতই সাধু নচেৎ স্ত্রীপুরুষের কাছে কিভাবে নেংটি পরিয়া দিন কাটাইতেছেন। সাধুকে প্রণাম করিয়া যখন বিদায় লই তখন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন "মাঈ প্রসাদ নিয়া যেও" আমি বলিলাম যে, আজ উপবাস করিয়াছি, তখন তিনি আমাকে একটি বেলপ্রসাদ দিলেন তাহা নিয়া বাসায় আসিলাম।

আমার পিতা মহাশয় মাঝে মাঝে ঐ সাধুর নিকট যেতেন, তিনি আমাকে বলিলেন বুড়াশিব মন্দিরে একজন সিদ্ধ পুরুষ আছেন, তাঁহার নিকট যে যাহা চায় তাহাই পায়। সেই দিন হইতে আমার বারবার মনে পড়িতে লাগিল ঐ সাধুর কথা এবং তাঁহাকে আবার দেখিবার জন্য আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাই আমার স্বামীকে প্রায়ই বলিতাম আমাকে একদিন বুড়াশিব বাড়ী নিয়ে যাবে? সে বলিল, — যাব একদিন। দিনের পর দিন চলিতে লাগিল সেই মন্দিরে আর যাওয়ার সময় হইয়া ওঠে না। ঠাকুরের এমনই ইচ্ছা যে আমার বড় ছেলের চক্ষু দেখাইতে মেডিকেল কলেজে যাইতে হইল। ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনেই বুড়াশিব বাড়ী। আমার স্বামী আমাকে বলিলেন তুমি না বুড়াশিব বাড়ী যাইতে চাহিয়াছিলে? এখন চল সামনেই আছে। আমরা মন্দিরে যাইয়া সেই সাধুকে প্রণাম করিলাম। তখন তিনি বাল্যভোগ সেবা করিতেছিলেন। দক্ষিণ হাত উপরে উঠাইয়া "শান্তি শান্তি" ধ্বনিতে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "মাঈ প্রসাদ নেও" — আমরা প্রসাদ নিলাম। সকলেই দেখি সাধুকে বাবা বলিয়া ডাকে তখন আমিও বলিলাম "বাবা, আমার কি জীবনে দুঃখ ঘুচিবে না?" গোবিন্দের চরণে আমার মনের কথা কত বলি তবুও ত শান্তি পাইতেছি না। তখন বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন — "মাঈ দীক্ষা নিয়েছ" —? আমি বলিলাম "না"। তখন তিনি বলিলেন "মাঈ অদীক্ষিতের দেহ মন অপবিত্র থাকে, যতই কাঁদ না কেন তুমি, ভগবান তাহা গ্রহণ করেন না।" কারণ বলি শোন ঃ—

নারদ ছিলেন, নারায়ণের প্রিয় ভক্ত; নারায়ণের কাছে প্রায়ই নারদ আসিয়া বসিতেন। নারদ চলিয়া যেতেই নারায়ণ লক্ষ্মীকে বলিতেন "নারদ যে জায়গায়

বসিয়াছিল সেই জায়গাটা গঙ্গাজল দিয়ে শুদ্ধ করে দেও।" লক্ষ্মীও গঙ্গাজল এনে যায়গাটা শুদ্ধ করে দিতেন। লক্ষ্মী একদিন নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু — নারদ তোমার প্রিয় ভক্ত, সে যে যায়গায় বসে সে উঠিয়া গেলে ওখানে গঙ্গাজল দিয়ে শুদ্ধ করিতে বল কেন?" তখন নারায়ণ লক্ষ্মীকে বলিলেন, "নারদ যে অদীক্ষিত, সে যে জায়গায় বসে সে জায়গাটাও অপবিত্র হয়ে যায়।" তাই বুঝিতে পারিলাম দীক্ষা না নেওয়া পর্য্যন্ত দেহ ও মন অপবিত্র থাকে।

তখন আমি বাবাকে বলিলাম মনের মত গুরু যে পাই না কোথা থেকে দীক্ষা নিব। বাবা বলিলেন, "ভাল গুরু বেছে তাড়াতাড়ি করে দীক্ষা নেও, দুঃখ ঘুচিবে"। তখন আমরা বাবাকে প্রণাম করিয়া বাসায় রওনা হইলাম, পথে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলাম কোথা থেকে দীক্ষা নেবে। তিনি বলিলেন, "রামকৃষ্ণ মিশন থেকে অথবা অন্য কোন আশ্রম থেকে নেওয়া যেতে পারে"। আমাদের কোনদিনই সংসারী গুরু থেকে দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা ছিল না, তখন আমি বলিলাম যে আমরা ভুল করিলাম, বাবাকে দীক্ষা দেওয়ার কথা বলিতে পারিতাম, তখন স্থির করিলাম কালই বুড়াশিব বাড়ী যেয়ে বাবাকে বলিব, আপনি আমাদের দীক্ষা দিন। পরদিন শিববাড়ী চলিয়া গেলাম। যেয়ে দেখি বাবা শয়নে আছেন। মন্দিরে বসিলাম। ওখানে বিদ্যামাঈ নামে একজন ব্রহ্মচারিনী আমার সামনে আসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবা কখন উঠিবেন, তিনি বলিলেন আধা ঘন্টার মধ্যে উঠিবেন। তাহার পর আমি বাবার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবা কি বাঙ্গালী? ঐ মাঈটি বলিলেন - না, তখন আমি বলিলাম বাবার দেশ তবে কোথায় ছিল, তখন তিনি আমাকে বলিতে লাগিলেন — বাবার দেশ ছিল কনৌজ, বাবার ২।৩ বৎসরের সময় মা মারা যান, তাঁহার পিতা ছিলেন একজন বড় সাধক, তিনি তখন বাবাকে নিয়ে নানা দেশ ঘুরিতে ঘুরিতে ঢাকায় আসিলেন। তখন এই জায়গায় কোন মন্দির ছিল না, শুধু জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গলের মধ্যেই বাবাকে নিয়ে তাঁহার পিতা বাস করিতে লাগিলেন।

সেই জঙ্গলের মধ্যে একটি জায়গায় প্রতিদিনই বেলা ১টা-১।। টার সময় একটি চিল এসে পাখামেলে বসে থাকত। একদিন ভোরবেলায় ঐ রাস্তা দিয়া ২ জন কাঠুরিয়া যাইতেছিল, তখন বাবার পিতা ঐ লোক ২টিকে ঐ চিল বসার জায়গাটি দেখাইয়া বলিলেন, "দেখত ঐখানে কি আছে?" তাহারা জঙ্গল পরিষ্কার করিতে করিতে দেখিল ওখানে ১টি কাল রংয়ের পাথর। তাহারা ভাল করিয়া মাটি খুড়িয়া দেখিতে পাইল ওইটি একটি শিব লিঙ্গ। সেইদিন রাত্রিতে বাবার পিতাকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন আমি

বুড়াশিব আমাকে জাগ্রত করে তোল, তাহার পরদিন হইতে ওই জায়গাটা ভাল করে পরিষ্কার করিয়া তুলিলেন। এই কথা শেষ হইতে না হইতে বাবা উপর থেকে নীচে আসিলেন, আমি প্রণাম করিলাম, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "মাই শিব দর্শন করেছ?" বাবা তখন পায়চারী করিতেছিলেন আমিও সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিতে লাগিলাম, বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মাই আজ আবার কি মনে করিয়া আসিয়াছ?" তখন আমি বাবাকে বলিলাম "আপনি আমাদের দীক্ষা দিবেন?" তিনি বলিলেন "বেশ — তবে কাল এসো।" তখন আমি বলিলাম এখন যে আমি সন্তানসম্ভবা, বাবা তখন বলিলেন "তাতে কোন দোষ নেই মাই, একের সঙ্গে দুইই উদ্ধার হয়ে যাবে।" মৃণাল আমার গর্ভে।

রাত্রিতে যখন আমার স্বামী আমাকে আনিতে মন্দিরে গেলেন আমি তাঁহাকে বলিলাম বাবা কালই দীক্ষা নিতে আদেশ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন হাতে ত একটিও টাকা নেই, কাল কি করে দীক্ষা নেওয়া হবে। তখন আমি বাবাকে বলিলাম — আমাদের কাল দীক্ষা নেওয়া হ'বে না কারণ আমাদের কাছে টাকা পয়সা কিছু নাই। তখন বাবা আমাকে বলিলেন "আরে মাঈ বাবা কোথায়!" তখন আমি আমার স্বামীকে বাবার নিকট ডেকে দিলাম। বাবা তখন তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা, দীক্ষা নিতে টাকা লাগে না? এটা দোকানদারি করিতে বসি নাই। শোন বাবা — প্রহ্লাদ যখন গুরুর নিকট দীক্ষা চেয়েছিল তখন গুরু তাঁহাকে বিনা পয়সাতেই দীক্ষা দিয়েছিল। আমিও তোমাদেরকে দীক্ষা দিব। তোমরা শুধু ভক্তি, বিশ্বাস, শুদ্ধ মনে বনের পুষ্প নিয়ে আসিও।"

তার পর আমাদের দীক্ষা দিলেন ঠাকুর — শাখারী বাজারে থাকি, মৃণাল আমার গর্ভে। বাদরের উৎপাতে একদিন দোতলা হইতে সিড়ি দিয়া গড়াইয়া পড়িয়া যাই। খুবই অসুস্থ হইয়া পড়িলাম, বাবাকে শুধু চোখের জলে স্মরণ করিতেছি, তার পর আবার শ্রীশ্রীবুড়াশিব ধামেতে যাই স্বামীর সঙ্গে ও সকল বিষয় জানাইলাম, গুরুদেবকে, উনি বলিলেন আমি আছি মাঈ তোমার কোন চিন্তা নাই, তোমার গর্ভে যে আছে তার দায়িত্বও আমার। আজ ওর দায়িত্ব নিলাম সারা জীবনের জন্য। জয় হোক মা ও সন্তানের। মৃণাল এর ভাল ভাবেই জন্ম হল। আমাদের বিশ্বাসের নীড় আরও শক্ত হলো।

ঢাকার বুড়াশিব ধামে ধবংসলীলা

সুনীল রায় পালধি

২৫শে মার্চ ইং ১৯৭১ সন। রাত্রি ১০-৩০ মিঃ। যথারীতি শ্রীশ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া বিদায় লইয়াছি।

কিছুদিন যাবৎ রাজনৈতিক গোলমালের সূচনা হওয়াতে এই রাতে আর কেহ উপস্থিত ছিলেন না। আমিই শেষ যাত্রী। একটু আগে গুরু ভাই চিত্ত দাদা বিদায় লইয়াছেন।

শ্রীমৎ মুকুন্দানন্দ বাহিরের বন্ধ দরজা খুলিয়া বিদায় দিলেন।

পথে লোক-জন বিশেষ নাই। তবে কিছু লোক রাস্তায়, যাহাতে যান বাহন চলাচল করিতে না পারে তার জন্য বাধা সৃষ্টি করিবার প্রয়াস করিতেছে। যাহা হউক বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সন্ধ্যা জপ শেষ করিয়া পরে আহারান্তে শয়নে গেলাম।

বোধ হয় তন্দ্রার মত আসিয়াছিল, কিম্বা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার জননী আসিয়া ডাকিতে লাগিলেন এবং বলিলেন "তুই এখনও ঘুমাইয়া, ঢাকা শহর বোধ হয় শেষ হইয়া গেল"। তখনি যেন বৃষ্টির শব্দের মত গুলির আওয়াজ এবং তার ফাঁকে ফাঁকে মেশিনগান, মটার ও হাত বোমা ফাটিবার আওয়াজ হইতে লাগিল। সারা রাত্রি ধরিয়া এই সব চলিল, শহর ভরিয়া অগ্নিকাণ্ড হইতে লাগিল। অবশেষে কাল রাত্রি প্রভাত হইল এবং সান্ধ্য আইন জারি করা হইল।

এই সব গোলমাল রাজনৈতিক কারণে সৃষ্ট, ইহাতে আমরা কোন কালেই যোগদান করি নাই। কাজেই তখন চিন্তার কোন কারণ দেখি নাই। তবে শ্রীশ্রীবুড়াশিব ধামের চারিপাশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস। তাহার চারিপাশেই গোলমাল হওয়া স্বাভাবিক। সেইজন্য শ্রীশ্রীবুড়াশিব ধামের জন্য চিন্তা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তবে পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইতে জানা যে আবহমানকাল হইতে শ্রীশ্রীবুড়াশিব ধাম যে কোন রাজনৈতিক গোলমাল হইতে মুক্ত এবং সেইজন্য চিন্তার কারণ হইলেও দুঃশ্চিন্তার কারণ হয় নাই। কাজেই ২৬শে মার্চ বাড়ীতে বসিয়াই কাটাইলাম।

২৭শে মার্চ। সান্ধ্যা আইন ৬ ঘন্টার জন্য শিথিল করা হইল। এই সুযোগ যেহেতু শ্রীশ্রীধামের চারিপাশে ভয়ানক গোলাগুলি চলিয়াছে সেইজন্য কতিপয় ভক্ত শ্রীশ্রীগুরুদেবের খোঁজ নিতে গিয়াছেন। আমাদের গুরুভাই বাহারাম শ্রীশ্রীগুরুদেবের আদেশে আমাদের বাড়ীতে সকালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন শ্রীশ্রীগুরুদেব আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে সুনীলের বাড়ী ওদিকে অনেক গোলাগুলির

আওয়াজ পাইলাম দেখিয়া আস সকলে কি রকম আছে। তারপরই কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ব্রজপাতের মত সংবাদ দিলেন যে শ্রীশ্রীগুরুদেব ভিন্ন আর সকল সাধু ও সেবাইতদের পাকিস্থানি সৈন্যরা গুলি করিয়া মারিয়াছে। একমাত্র যশোদা দিদি আছেন। আর আমাদের আরেক গুরুভাই তার দাদা গোলমালের সময় স্থান ত্যাগ করাতে প্রাণে বাঁচিয়াছেন।

আমরা স্থানুর মত হইয়া রহিলাম। ঘৃন্য রাজনীতি যে এভাবে শ্রীশ্রীধামকে আক্রমণ করিতে পারে তাহা কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নাই। তখনি আমরা কয়জন ভাই বোনে রওনা হইলাম শ্রীশ্রীধাম অভিমুখে। শ্রীশ্রীবাবাকে দেখিলাম উপস্থিত ভক্তদের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন। যশোদা দিদি এক হাতে চোখের জল মুছিতেছেন, আর এক হাতে শ্রীশ্রীবাবার ভোগের ব্যবস্থা করিতেছেন। এর ভিতরই আমরা শ্রীশ্রীবাবার মহাপ্রসাদ পাইলাম এবং সান্ধ্য আইন শুরু হওয়ার আগেই রওনা হইলাম।

শ্রীশ্রীধামে শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে শুনিলাম সৈন্যরা আসিয়া শ্রীশ্রীবাবার দেহের উপর বন্দুকের নিশানা করিয়াছিল এবং সেই সময় তিনি নিজের শ্রীদেহকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—"দেখ্ ইয়ে আল্লাকা ঘর হ্যায়"। তাহাতে সেই বন্দুকধারী নিরস্ত্র হয় এবং শ্রীশ্রীবাবার পকেট ঘড়ি ও পেন পকেটে পুরিয়া রওনা হয়। শ্রীমৎ মুকুন্দানন্দ ও অন্যান্য সেবাইতদের নিয়া গেল বধ্য ভূমিতে (জগন্নাথ হলের মাঠে)।

শ্রীশ্রীগুরুদেব ইহাদের কোথায় লইয়া যায় দেখিবার জন্য শয়ন মন্দির হইতে দুর্গামন্দিরের বারান্দায় উপস্থিত হন। সেই সৈনিকটি শ্রীশ্রীবাবাকে দেখিয়া বলে "তুম্ জয় বাংলা বোলতা"—শ্রীশ্রীবাবা উত্তর দেন "নেহি হাম্ জয়শিব বোল্তা"। "আব হঠ যাও" বলিয়া সৈনিক অগ্রসর হয়। শ্রীশ্রীবাবা তবুও আগাইতে থাকেন। তখন সৈনিকটি আবার বন্দুক নিশানা করায় শ্রীশ্রীবাবা দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়ান ও পরে আসনে ফিরিয়া আসেন।

২৭শে মার্চ রাত্রিতেও গুলির আওয়াজ ও অগ্নিকাণ্ড হইতে লাগিল।

২৮শে মার্চ অতি প্রত্যুষে আমাদের গুরুভাই সমর দাদা আসিয়া উপস্থিত। তিনি শ্রীশ্রীগুরুর কৃপা বলে শ্রীশ্রীধামের নহবত ঘরের কাছাকাছি থাকায় ঘাতকদের হাতে নিহত হন নাই। তিনি আসিয়া বলিলেন,—শ্রীশ্রীবাবাকে শীঘ্র সরান। কারণ গত রাত্রে রমনা কালি বাড়ী মর্টার দিয়ে ধবংস করা হইয়াছে এবং মন্দিরে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের হত্যা করা হইয়াছে। রাত্রে শ্রীশ্রীধামের সিংহ দ্বারে বিস্ফোরক দিয়া উড়াইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবার কৃপাবলে কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও তাহারা পারে নাই। কাজেই শ্রীশ্রীবাবাকে অনুরোধ করিলাম স্থান ত্যাগ করার জন্য। কারণ হিন্দুদের ও

তাহাদের ধর্মস্থানগুলির উপর দস্যুদের ক্রমাগত আক্রোশ হওয়ার জন্য। শ্রীশ্রীবাবা যদিও এসব কিছুর বাহিরে তবু যেহেতু তিনি কৃপা করিয়া হিন্দুদের মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন, সেইজন্য তাঁহার স্থানান্তরে যাওয়া উচিত এবং আমাদের বিশ্বাস শ্রীশ্রীবাবা থাকিলে আমাদের সব কিছুই থাকিবে। তবুও শ্রীশ্রীধাম ছাড়িতে রাজী হইলেন না। তখন শ্রীশ্রীবাবাকে বলিলাম গোলমাল কিছুটা কমিলে আবার আসিবেন এখন একটু চোখের উপর হইতে দূরে থাকা ভাল।

যাহা হউক শ্রীশ্রীবাবা কৃপা করিয়া এই অধমের বাড়ীতে আসিয়া রাত্রি যাপন করিলেন। সেটা ২৮শে মার্চ। সারা রাত্রি শ্রীশ্রীবাবার কাছে ছুটিয়া গিয়াছি, গোলাগুলির আওয়াজ পাইয়া ঘুমাইতে পারি নাই।

পরের দিন সকালে শ্রীশ্রীবাবা উঠিয়াই শ্রীশ্রীধামের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীশ্রীধামে রওনা হইয়া গেলেন।

ওখানে সেই দিন ২৯শে মার্চ শ্রীশ্রীধামের সাধু রামধনি, যিনি পীড়িত হইয়া হাসপাতালে ছিলেন, তিনি আসিয়া উপস্থিত। তাহাতে শ্রীশ্রীবাবা যেন বল পাইলেন।

সেই রাত্রি শ্রীশ্রীবাবা শ্রীশ্রীধামে কাটাইলেন। পরের দিন পুনরায় শ্রীশ্রীবাবাকে ধরিলাম স্থান ত্যাগ করার জন্য। তিনি পুনরায় এই অধমের গৃহে আসিয়া রহিলেন রাত্রির জন্য।

সেই রাত্রেই আমাদের বাড়ীর কাছে শান্তি নগর বাজারে আগুন লাগানো হইল। সেই সঙ্গে গুলি বর্ষণ। আমরা সকলে গিয়া শ্রীশ্রীবাবার অভয় চরণে পড়িলাম। তিনি শ্রীমুখে বলিলেন বাড়ির চারিকোনা ভিতর হইতে দেখিয়া আস। দেখিয়া আসিয়া বলিলাম কোন গোলমাল নাই। শ্রীশ্রীবাবা শ্রীমুখে বলিলেন "আর ভয় নাই"।

শ্রীশ্রীবাবা পরদিন প্রাতে উঠিয়া আবার শ্রীশ্রীধামে গেলেন, কারণ পীড়িত সাধু শ্রীশ্রীধামেই ছিলেন। সেইদিন বৈকাল বেলায় অফিস হইতে সোজা শ্রীশ্রীধামে গেলাম এবং দেখিলাম শ্রীশ্রীবাবা, যশোদা দিদি ও সমর দাদা বাহিরে আসিতেছেন। শ্রীশ্রীবাবা দেখিয়া শ্রীমুখে বলিলেন "বাবা আমি এক জায়গা হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়াছি, সেইখানে চলিলাম হরিজন শিষ্যদের বস্তিতে।"

সেইখানে শ্রীশ্রীবাবা অবস্থান করিয়া ২রা এপ্রিল রওনা হইয়া গেলেন আবদুল্লাপুর গ্রামে আমাদের গুরুভাই জয় গোপাল দাদা ও অমৃত দাদার অনুরোধে। কারণ হরিজন বস্তিতে কিছু বর্ণ হিন্দুরা আশ্রয় নেওয়ায় তাহাদের বিপদের কারণ হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীবাবার ভোগ তখনও উনানে রান্না হইতেছিল কিন্তু শ্রীশ্রীবাবা সময় নষ্ট করেন নাই কারণ যানবাহনের খুব অসুবিধা ছিল।

যাহা হোক শ্রীশ্রীধামে পীড়িত রামধনি সাধু রহিয়া গেলেন, কারণ তিনি আর

কোথাও যাইতে চাহিলেন না। শ্রীশ্রীবাবার এক মুসলমান ভক্তের সাহায্যে অন্তত একবেলার জন্য সাধুর সেবার বন্দোবস্ত হইল আর শ্রীশ্রীধামের গাভীর দুগ্ধ ত ছিলই।

পরে ২৪শে এপ্রিল স্থানীয় লোকদের সহায়তায় সেই পীড়িত সাধুকে অপসারণ করিয়া সৈন্যরা লইয়া যায় ও হত্যা করে।

তার পরদিন হইতে শ্রীশ্রীধামের বিগ্রহাদি সহ সমস্ত মালামালের লুট আরম্ভ হয় এবং ক্রমাগত সাত দিন ধরিয়া লুট চলে। পরে আস্তে আস্তে জানালা, কপাট, কড়ি ও বড়গা এমনকি দেওয়ালের পেরেক পর্য্যন্ত লুট হয়।

এর কিছুদিন পরে একটি ছেলে আমাদের বাড়ীর খোঁজ করিয়া আমাদের সঙ্গে দেখা করিয়া জানায়, যে শ্রীশ্রীবাবা এখন অমুক জায়গায় আছেন এবং শ্রীশ্রীধামের খবরের জন্য অস্থির হইয়া আছেন! আমরা তাহাকে সাধু রামধনির হত্যার খবর ও শ্রীশ্রীধাম লুটের খবর বলিলাম এবং শ্রীশ্রীবাবা যেন আমাদের উপর কৃপা দৃষ্টি রাখেন এই কথা শ্রীশ্রীবাবাকে জানাইবার জন্য বলিলাম।

তারপর ২৫শে মার্চ হইতে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত যে নারকীয় লীলা সমস্ত দেশময় হইতে লাগিল তাহা এখন অন্যের কাছে উপকথা অথবা উপহাস বস্তু ছাড়া কিছুই নয় একমাত্র ভূক্ত ভোগীছাড়া।

যাহা হোক এই অবস্থায় যখন দিন কাটিতেছে, তখন খবর পাইলাম শ্রীশ্রীবাবা নিরাপদে শ্রীশ্রীগুরুধাম বাঙ্গুরে শুভ পদার্পণ করিয়াছেন।

এই সংবাদে আমরা সকলে স্বস্তি পাইলাম। দেশমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা সকল সময়ই অনুভব করিতাম শ্রীশ্রীগুরুদেব এই অধমের গৃহে অশেষ কৃপা করিয়া রাত্রি বাস করিয়াছিলেন, আমাদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তাঁহার নিজের জন্য নহে। আমাদের সমূহ বিপদ হইতে কি ভাবে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার কৃপা ভিন্ন বুঝিবার উপায় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুর স্মরণে আমাদের দিন কাটিতে লাগিল। তখন আমরা ঠিক বাঁচিয়া আছি না মরিয়া গেছি তাহা ঠিক করিতে পারিতাম না, একরকম যন্ত্রের মত ভাবশূণ্য হইয়া চলাফেরা করিতাম।

তারপর হঠাৎ আগস্ট মাসে শ্রীশ্রীবাবার নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ পত্র পাইলাম যাহা লন্ডন হইয়া ডাকে আসিয়াছিল। সেই পত্রে লেখা ছিল "এই যে দেশে ধ্বংস লীলা হইল তাহা আমারই যজ্ঞ এবং এই মহান যজ্ঞে আমি সব কিছু বিসর্জন দিয়া আসিয়াছি। তোমরা মনে কোন দুঃখ করিও না। যে সমস্ত সাধু ও সেবাইত প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন তাঁহাদের আত্মার ঊর্ধ্বগতির জন্য সর্ব্বদা চেষ্টায় থাকিব। তবে ঘাতকদের বিচার একদিন হইবেই। ব্রজানন্দের বিচার সুক্ষ্ম বিচার।"

এই পত্র পাওয়ার পর হইতেই মনে হইল হাওয়া ঘুরিতেছে এবং ক্রমে ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তি দিবস আসিয়া উপস্থিত হইল।

আমরা লুকানো জায়গা হইতে শ্রীশ্রীগুরুদেবের ফটো আসনে বসাইলাম।

এর কিছুদিন পরেই রাত্রি দুইটার সময় দরজায় করাঘাত। শুনিতে পাইলাম, আমরা শ্রীশ্রীগুরুধাম বাঙ্গুর হইতে আসিয়াছি, দরজা খুলুন। খুলিয়া দেখি শ্রীমৎ হরিহরানন্দ ও সঙ্গে চিত্তদাদা ও সমরদাদা।

তার পরদিন হইতে শ্রীশ্রীবুড়াশিব ধামকে জঞ্জাল হইতে মুক্ত করা হইতে লাগিল এবং বাহিরের লোক যাহারা শ্রীশ্রীধামে আশ্রয় লইয়াছিল তাহাদের অন্যত্র যাইতে বলা হইল।

শ্রীশ্রীবুড়াশিব ধামের ধুনিঘর যেখানে ত্রিযুগের ধুনি অবস্থিত সেই স্থান প্রথমে মুক্ত করিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের ফটো, একখানা জলচৌকির উপর স্থাপন করিয়া ভোগ রাগ পূজা আরম্ভ করা হইল। ঠিক যেখানে শ্রীশ্রীগুরুদেব প্রথম আসন পাতিয়াছিলেন শ্রীশ্রীবুড়াশিব ধামে আপন লীলা প্রকট করিবার জন্য।

শ্রীমৎ হরিহরানন্দ বলিলেন শ্রীশ্রীবাবা বলিয়াছেন শিবমন্দিরের বারান্দার ছাদে শিব লিঙ্গ আছে এবং শিবমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ছাদের উপর উঠিয়া পাওয়া গেল না।

তবে আমার কাছে আমাদের হরিজন গুরুভাই হরিলাল ও তাঁহার স্ত্রী প্রায়ই আমাদের বাসায় আসিয়া খোঁজ নিতেন, শ্রীশ্রীগুরুদেব কোথায় কিভাবে আছেন। তাহারা সরকারী ঝাড়ুদার বলিয়া তাহাদের কোন ভয় ছিল না। তাহারা সর্ব্বদা শ্রীশ্রীবুড়াশিবধামের অবস্থা তখন শ্মশানের মত হইলেও খোজ আনিয়া দিত, দিনে দিনে কি হইতেছে। তার কাছেই জানিয়া ছিলাম জনৈক পশ্চিমা হিন্দু ভক্ত শিব লিঙ্গ রাস্তার ধার হইতে পাইয়া শ্রীশ্রীবুড়াশিব মন্দিরের সামনে যা শিবগঙ্গা নামে পরিচিত সেই জলাশয়ের মধ্যে একস্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছেন।

আমরা তখন তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম তুমি এখন শিব লিঙ্গকে সেই ভাবেই রাখ। তবে জায়গাটা চিনিয়া রাখিও আমরা বলিলে বাহির করিবে। শিব মন্দির মুক্ত করিয়া যখন শিব লিঙ্গ স্থাপন করা হইল তখন দেখা গেল শ্রীশ্রীগুরুদেব কথিত সেই ছাদের উপরকার শিব লিঙ্গই।

শ্রীশ্রীবুড়াশিব ধামে শ্রীশ্রীগুরুর অশেষ কৃপা বলে শ্রীপঞ্চমীর দিন হইতে পুনরায় শ্রীশ্রীবুড়াশিব লিঙ্গের পূজা আরম্ভ হইল।

জাহাঙ্গীর বাদশার আমল হইতে শ্রীশ্রীশিবের পূজা কখনও বন্ধ হয় নাই। এইবার বোধহয় প্রথম সাড়ে দশ মাসের জন্য ভক্ত মনুষ্য লোকের জন্য পূজা বন্ধ হইয়া অসুর লোকের পূজা স্থান হইয়াছিল।

যাহা হোক পুনঃ পূজা চলিতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে শ্রীশ্রীগুরুর অশেষ কৃপা দৃষ্টিতে সব যেন আগের মত রূপ নিতে লাগিল।

শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীগুরুর ফটো সেই আদি ধুনির স্থান হইতে আনিয়া একখানা তক্তপোষের উপর রাখিয়া শ্রীশ্রীবাবার আসন মন্দিরে স্থাপন করা হইল। পরে শ্রীশ্রীঝুলণপূর্ণিমার দিন নূতন সিংহাসনে শ্রীশ্রীগুরুর ফটো স্থাপন করা হইল। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সমস্ত শিবধাম শ্রীশ্রীগুরুর পদার্পনের যোগ্য হইয়া উঠিল।

এই শিবধাম সংস্কার সাধনে আমাদের গুরুভাই স্বর্গত সুশীল মজুমদারের দান শ্রীশ্রীগুরুকৃপা বলে অসামান্য।

শ্রীশ্রীগুরুর অশেষ কৃপা বলে অন্যান্য বহু ভক্তের মত প্রাণে বাঁচিয়া আছি।

তাই এর উপসংহার শ্রীশ্রীগুরুদেবের একটি বাণীর কথা বলিতে চাহিতেছি। তাহা হইল, এই ধবংস লীলার আগে রাজনৈতিক গোলযোগ যখন পাকাইয়া উঠিতেছে তখন শ্রীশ্রীবাবাকে একদিন বলিলাম "বাবা আমরা কি এই গোলমালে পড়িব? আপনাকে সাক্ষাৎ রাখিয়াও কি পরিত্রাণ পাইবো না?" শ্রীশ্রীবাবা উত্তর করিলেন "সকলেই গোলমালে পড়িবে। তবে তোমার সাক্ষী হইয়া থাকিতে দোষ কি?"

শ্রীশ্রীগুরুর রাতুল চরণে এই প্রার্থনা তিনি যেন আমাদের নির্মল চক্ষু দান করেন এবং যাহার দ্বারা আমরা তাঁর সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের লীলার সাক্ষী হইয়া তাঁহার পূজার উপকরণের মত নিজেদের ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জন করি শ্রীশ্রীগুরুনাম ও শ্রীশ্রীগুরুসেবার মধ্য দিয়া। এক যুগের ভিতর অন্য যুগের অভ্যুদয় ঘটানো শ্রীশ্রীগুরুরূপী ভগবান ব্রজানন্দের অনন্ত লীলার একটি লীলা মাত্র এই মহান যজ্ঞ।

তবে আমাদের অনেকেরই বিশ্বাস যদি আমরা শ্রীশ্রীগুরুর কৃপা বলে নির্মল দেহমন লইয়া জগৎময় শ্রীশ্রীগুরুর লীলার সাক্ষী হইয়া থাকিতে পারি তবে তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে আর দেরি করিবেন না।

তিনি সেইজন্যই গোলক হইতে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

আমরা মোহে পড়িয়া তাহার কার্য্য দেরি করিয়া দিতেছি। শ্রীশ্রীগুরুরূপী ভগবান ব্রজানন্দ আমাদের ক্ষমা করুন। মঙ্গল করুন। শান্তি দান করুন। ইহাই আমাদের সর্বকালের প্রার্থনা শ্রীশ্রীগুরুর রাতুল চরণে।

"ভাঙ্গা মন্দির বানানেওয়ালা
ভগবান ব্রজানন্দ জিউ কি! জয় .....

ঠাকুর ব্রজানন্দের জয়োধ্বনি

বোল একবার ভগবান জগৎ গুরু আচার্য ব্রজানন্দ জিউ কী! জয়.....
বোল একবার একাধারে রাধাকৃষ্ণ স্বরূপে ভগবান ব্রজানন্দ জিউ কী! জয়.....
বোল একবার গৌরাঙ্গ স্বরূপে ভগবান ব্রজানন্দ জিউ কী! জয়.....
বোল একবার বুড়াশিব স্বরূপে ভগবান ব্রজাননন্দ জিউ কী! জয়.....
অনাদির আদি সর্বসৃষ্টিকারী ভগবান ব্রজানন্দ জিউ কী! জয়.....
বোল একবার নারায়ণ স্বরূপে ভগবান ব্রজানন্দ জিউ কী! জয়.....
বোল একবার দুর্গা স্বরূপে ভগবান ব্রজানন্দ জিউ কী! জয়.....
বোল একবার ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু শ্রী ব্রজানন্দ জিউ কী! জয়.....
বোল একবার সপ্তধামেশ্বর ভগবান ব্রজানন্দ জিউ কী! জয়.....
ঢাকা বুড়াশিব ধাম কী! জয়.....
বাঙ্গুর গুরুধাম কী! জয়.....
নবদ্বীপ বুড়াশিব ব্রজধাম কী! জয়.....
বৃন্দাবন ধ কী! জয়.....
মানিকগঞ্জ পূর্ণানন্দ ভবন কী! জয়.....
দেউন্দি বটতলা গুপ্তবৃন্দাবন ব্রজানন্দধাম কী! জয়.....
ব্রাহ্মণডুরা বুড়াশিব ব্রজানন্দ ধাম কী! জয়.....
বোল একবার গুরু মহারাজ কী! জয়.....
ভবপারের কান্ডারি ভগবান ব্রজানন্দজীউ কী! জয়.....

শাক খাও, সুক্ত খাও,
আর খাও ভাজি।
ব্রজানন্দের প্রসাদ খেয়ে,
মন কর রাজি।।
লুট বিহারী ভগবান ব্রজানন্দজীউ কি! জয়.....

"ব্রজানন্দের লীলার কথা"

ধামেশ্বরী মাঈ

(দেউন্দি বটতলা গুপ্ত বৃন্দাবন ব্রজানন্দ ধামের প্রতিষ্ঠাত্রী)

গত ১৩৬৮ বাং ৭ই বৈশাখ আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে আশ্রয় পাই। তারপর হইতে যে যে লীলা দেউন্দি চা-বাগানে হয়েছে তার অনেকটা স্মরণে আছে তাই আমি লিখে রেখেছি। যদি কেউ জানতে চান জানতে পারবেন। অবশ্য লেখার মত আমার জ্ঞান নাই; তথাপি মনের আবেগে লিখে রেখেছি। ঠাকুর নিজেও সেগুলো দেখেছেন এবং ছাপানোর জন্য বলেছিলেন। আমার ভাগ্যে আর তা হয়ে ওঠে নাই। বুড়াশিব বাড়ীর (ঢাকা) চিত্তদা জানালেন, "গুরুধাম" পত্রিকা আবার প্রকাশ করা হবে। যদি কেউ কিছু লিখতে চান তবে পাঠাবেন।" পাঠক-পাঠিকা নিজগুণে দোষত্রুটি ক্ষমা করবেন।

সাম্প্রতিক কালের দুই একটা লীলার কথা লিখছি। ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪ সাল শ্রীশ্রীঠাকুর এখানকার বটতলায় উৎসব করেন। এক শ্রীহস্তে ত্রিশূল স্থাপিত করেন। ত্রিশূলের তলে শ্রীশ্রীঠাকুরের পদ চিহ্ন রাখা হয়। তারপর হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর দেউন্দি শুভাগমন করিলেই বটতলায় উৎসব হয়। বিরাট উৎসব। গত ১৩৮২ শিব চতুর্দশী দিন আসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইতি পূর্বে আসন ছিল না। ওই বৎসর আমাদের বাগানের শ্রীযুত রমেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী নিজ খরচায় ঠাকুরের মন্দির তৈয়ার করে দেন। তিনি আগে ছিলেন সুপারিণটেনডেন্ট অফিসের বড় কেরানি। বর্তমানে ঠাকুরের অসীম কৃপায় তিনি আমাদের দেউন্দি কোম্পানির প্রশাসক হিসাবে কাজ করেন। এই কাজ তিনি সংগ্রামের পরেই পেয়েছেন। ঠাকুর যে কত দয়ালু আমাদের ভাব ধারার মধ্যে আনবার শক্তি নাই। আসন প্রতিষ্ঠার পর হইতে রোজ বট তলায় সেবা পূজা দেওয়া হয়। প্রত্যেক পূর্ণিমাতে লুট দেওয়া হয়। শ্রীশ্রীশিবরাত্রিতে ওই বট তলায় উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। উদয় অস্ত "হরে ব্রজানন্দ হরে। হরে ব্রজানন্দ হরে। গৌরহরি বাসুদেব। রাম নারায়ণ হরে।" নাম সংকীর্তন করা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অপর একটি আশ্চর্য লীলা। ১৩৮২ সাল হঠাৎ একদিন আমার

চোখে পড়ল—বট গাছের নীচে একটা জায়গায় শ্রীশ্রীমা কামাক্ষ্যা দেবীর পীঠ স্থানের আকৃতি। দেখে কয়েকদিন নীরব রইলাম। অম্বুবাচির সময় রোজ পূজা দিতে গেলাম এবং লক্ষ্য করতে থাকলাম। গুরু কৃপায় আমার সেই জায়গা অন্য রকম মনে হতে লাগল। আমি সত্যি মার পিঠস্থান জ্ঞানে দর্শন করেছি। আরো কয়েক জনকে দর্শন করিয়েছি। সবাই তাই অনুমান করেছেন। ঠাকুরের কৃপায় আমার কামাক্ষ্যা একবার দর্শন হয়েছিল—তাই অনুমান করতে পেরেছি। তাও মার কৃপা। হয়ত কেউ এটা বিশ্বাস নাও করতে পারেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস এমন একদিন আসবে, অনেক দূর দেশ থেকে মানুষ দরশণ করতে ছুটে আসবে। ঠাকুর নিজে শ্রীমুখে বলেছেন "বটতলা সিদ্ধ পিঠ"। তা কি কখনও মিথ্যা হতে পারে? এতদিন ঠাকুরকে এই কথা লিখি নাই। কারণ ভেবেছিলাম দেউন্দি শুভাগমন করলেই নিবেদন করব। কিন্তু শুভাগমন কবে করবেন, সে অপেক্ষা করবার ধৈর্য রাখতে পারলাম না তাই আজ ঠাকুরকে লিখেছি। ঠাকুর ত অন্তর্যামী, সবই জানেন।

ঠাকুর নিজে শ্রীমুখে বল্‌ছেন "রাধা-কৃষ্ণ একাধারে দর্শন কর। বিশ্বাস কর।" কই আমরা কি বিশ্বাস করি? আজ চোখে আঙ্গুল দিয়ে বট-বৃক্ষের মধ্যে তার প্রমাণ দেখাচ্ছেন। তবুও এমনি অন্ধ আমরা দেখিয়াও দেখিনা, বুঝিয়াও বুঝিনা। আমার দীক্ষার পর একখানা বই লিখেছিলাম ঠাকুরের লীলামৃত। সেই বই-এর নাম দিয়েছিলাম "শ্রীশ্রীব্রজানন্দের গুপ্ত বৃন্দাবনের লীলা কথা।" এখন দেখছি, সত্যি গুপ্ত বৃন্দাবন। সব লীলা লেখবার মত ক্ষমতা আমার নাই। এইবার কার্তিক মাসের পূজার দিন বটতলায় বিরাট উৎসব হয়। তাও ঠাকুরের অলৌকিক লীলা। আমার দীক্ষার পর থেকেই কার্তিক মাসে নিয়ম সেবা দেই এবং ভোরে ঠাকুরকে মঙ্গল আরতি দিয়া নগর পরিক্রমা করা হয়। বটতলা একমাস পর্য্যন্ত পূজার সময় সামান্য ভাবে উৎসব করা হয়। ঠাকুরের ধামেই। এইবার সব গুরু ভাই বোনরা মেতে উঠলেন বটতলা উৎসব করার জন্য। গুরু ভাই বোনরা যে যা পারেন চাঁদা তুলতে আরম্ভ করলেন, কিছু যোগাড় হলো। কিন্তু সকলের মন ভেঙ্গে গেল এই নিয়ে যে বটতলা কীভাবে উৎসব হবে? একদিন নগর পরিক্রমার সময় আমাদের গুরু বোন "পুতুল মনি" দেখতে পেল একজন সন্ন্যাসী গেরুয়া পরা কমণ্ডলু হাতে খরম পায়ে কীর্তনের পেছনে গুনগুন করে গান গেয়ে চলেছেন। সে দেখে ভয় পেয়ে সরে গেল। পরদিন আমাকে কথাটা বলল। আমি তখনি বল্‌লাম— আর চিন্তা নাই। ঠাকুর ভিক্ষায় বের হয়ে গেছেন। সত্যি কি ভাবে

যে সব যোগাড় হলো চিন্তাই করা যায় না। চতুর্দ্দিক থেকে টাকা, জিনিষ পত্র আসতে আরম্ভ হলো ধারণার বাইরে। কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন উৎসব আরম্ভ হল উদয় অস্ত নামযজ্ঞ মাইক দিয়া। সে কি বিরাট মেলা, দেখলে বিশ্বাস হবেনা। ওই দিন আমাদের বাগান ছুটি দেওয়া হল। আমাদের কাছে বাগান আরো ২টা তাও ছুটি হলো। চার পাশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই এসে বটতলা হাজির হলো। লোকে লোকারন্য। নামের যে কি মহিমা আমাদের সাধারণ জ্ঞানে বুঝবার উপায় নাই। আমাদের বাগানের মুসলমান উপরস্থ অফিসারেরা পর্য্যন্ত এসে উৎসব দর্শন করেছেন। কি যে আনন্দের বন্যা ছুটেছিল লিখে ব্যাক্ত করার মত ভাবা নাই। হংরেজ সাহেব পর্য্যন্ত আনন্দে কেউ ১০০, কেউ ২০০ টাকা বার করে বটতলা দিয়ে এসেছেন। হিন্দু মুসলমান কোন ভেদ ছিল না। ১০।১২ মন ডাল চাউল সিদ্ধ হয়েছে। ছোট খাটো আর কত কি আছে লেখবার শক্তি আমার নাই। কেবল ঠাকুর অসীম কৃপা করছেন বলে এইটুকু লিখতে সাহস পেয়েছি। লিখতে গেলে অনেক জ্ঞানের দরকার সেই জ্ঞান আমার নাই। তথাপি ঠাকুরের লীলা কীর্তন করতে প্রাণ আনন্দে নেচে উঠে। তাই কিছু লিখে ফেলেছি। বড় ভাই-বোনেরা ভুল ত্রুটির জন্য আমাকে কৃপা করে রক্ষা করবেন।

BURASHIB DHAM

Shib Bati Road

Dacca 1

15.10.67

My effectionate Rameshananda,

"Brajananda Ashirbad chiranjib" I got your letter in time, In this "Bejoya Pranam," I found that you prayed for Indians food, clothes, education Nationalism, peace, and prosperity etc,

I bless you to have these all for Indians but you are to move more and more with my Constant religion, economics, philosophy and science. Then, you will have the Indian and I am with you. Don't worry and despair.

Isaw your book and got much pleasure. No more to-day.

Ohm Peace, Peace, Peace,

Ever yours.

Swami Brajananda.

The Speech of Swami Brajananda For Us From OMNIPOTENT

Speech of Swami Brajananda the present incarnation of the new age can eassily defined as "Shiboham" which he always says. This speech is the cordial and own speech of India. This speech is upanished, Vedantya and philosophy of India in brief. The Indian are suffering much from variouse troubles as they forgot their own speech. So Swami Brajananda announcing in a stentorian voice from door to door, "Oh people," "Think once, Who are you? "Atyanam bidhya". You are sufferer man, why you are moving from door to door for finance, glory and regard. "Look once to your own hearted-room. There are many gems in your heart. Why do you made yourself a begger? Why do you made desire for rich, prestige and power, for what! For happiness! But peace and happiness are not out. Peace exist in heart and soul. Peacein exist in soul and God. Surty says, "Soul is favourite that fortune, dearer than son and it is the most dearest of all things. So all happi-ness exist in soul."

First of all you know wheather soul is your own. You are suffering from various troubles as you do not know the soul. The troubles of death, disease, proverty– These problems are never problems of mankind. Being suffered from troubles the menkind ask the question to be free, The Almighty God appeared at the world to solve these problems being man from time to time. To seek to the question's answer Prince Boddha left wealth, throne every thing and became worshiper. Swami Brajananda appeared in disguise at the world to suggest disciples and people about the originity of constant religion. "Oh infetuating people, oh amnesia and caught in a net people, you are the "Shivam," once be free from amnesia See God Brajananda came here as a worshiper in disguise. "You are lion, why you remain in sleep?" Being the son of lion you are doing as like as that of ram. Once look at your own shape. You are in bond of affection for that you are in slaves of man. Be free from bond of affection and achieve the Shivam That is your real freedom and Liberty – Hence enclaves is the animalism and free from bond of affection isthe Divinity. If it is guided in bond of affection is the animalism and be coming free bond of affection is .... called shivam or Divinity. When man is guided by sexulal desire, greed etc. Than he is regarded as animal. And when he is free from sexual disire anger greed etc, is called shivam or duirnity. In a single it is called when man is controlled by power. And when power is controlled by man is colled Divinity. Shastra says Bond of affection is called animalism and free from bond of affection is regarded as Divinity. Hence caught in nose is animal and free from gross or tie is shivam or Divinity. Hate, teror, fear, Shame Blame, Race, character and Respect. These eight are the

net or bond of affection of animal. For this, these are called net or tie in Shastra. Who is free from these Eight ties or net, He is shivam or God. The worshiper being sad with bond of affection said, "That the people being affected to the ties or net or family affairs suffering much to fulfill their desire" Shape of God, animal soul and the great-soul are same. When the animalness be off from heart than the great soul amalgamate with animal soul. Till he would not lives in this true shape means till he achieves the Godness then would not enjoy the ful-peace or complete pleasure. When the man convince the animal world and justify the Lord ship with deep thinking then he achieves the all pervading Divine-soul. Either the people which are in darkness they must have to suffer much due to their short of knowledge about the Lord. The worshiper sang a song being sad for the sorrow of the people.

"O man you the spectator of the nature
but
remain in joy for beauty, woman,
happiness and grief."

Indeed when a man can realise the thoughtness of nector-son, no weapons can kill, fire can not burn him he is immortal, is there any troubls to him? If enemy slays him, yet he knows it very well, that He is not the owner of his body. His soul would not be destroyed if He has been killed. He got his invisible soul. He is the real prophet who sees the soul with his own eyes–No family affairs can guide him. Oh Indian once the Arians said, with affection about the love-nectar, Oh nected people of the world listen to word, If you wanted to be immortal by drinking knowledge-nector then you take shelter to the Almighry Brajananda the God-"Shivam." If you wanted to love then you sacrifice "Oh creature, there is no way except shis," I remember, the arians. worshipers of India, they tried to be free from the hand of the grief and proverty of the world. Where is the way to be free in this impossible world in this qustion, being aimless they astonished and said, A boy of sixteenth uttered vigorously, "Oh people of world "Listen to me, Listen the son of nector the God the inhabident of Heaven. I knew him, the huminous Almighty God," "you people know him first, There is no way to save from die with out His kindniss."

To day, God Brajananda Swami saying that forgoten noble speech of India, "Oh bond of affected people come to him and want the shelter on this creamson feet this is your only Way. If you could not feel yourself to this ideal then your political freedom, social freedom and others desire will be invalied. You should try to free yourself first, then you try for others. The freedom of the world will be appear to your door. Otherwise all invain. Poet

said, "Oh death India, only this way to be free." I am coming to that point, again, if you were to a divine juice to be immortal. Then you too present incarnated God Brajananda who is saying always "Shivoham." If you wanted to love then you sacrifice completely to the graciome to the faithful, sanctifier of unholly, beloved exquisitely beautiful God Brajananda. If you wanted beauty, then be forgetful to see the great beauty of present incarnatd God Brajananda. If you wanted beauty, then be forgetful to see the great beauty of present incarnated God Brajananda And if you want Divine-Juice, then you take the diverson-Juice of the present incarnation on God Brajananda. And say with great love, "Oh thou the father and mother. Thou the friend and compenion. Thou the education and supreme spirit or God-omni-potent."

Om, Peace, Peace, Peace.

Lord Shib Murty Darshan

By Rameshananda Saraswati

It was in the year 1955 I paid a visit to Burashib mandir at Dacca. Baba Brajananda advised me to have a meditation at mid-night. From that day, I began to have a meditation for two of three hours regularly at Night. That was a new moon or Amabashya in the month of september in 1964 while I was in meditation a shadow of man entered into my room by the upper edge of the hedge of the room and sat on the Ashan i, e, Throne of Brajananda Guru Maharaj. I prostrated myself before Him. He was lord Shivam. In a low but sweet voice, lord, asked me, "What do you want, Ramesh?" 'I do not want anything' said I, Then the lord said, "Why not my boy"! "That is my wish," said I, God Shivam said, "you are at liberty to ask, whatever you like, and it will be given to you."

But I refused to ask anything. Then lord said, "I shall be with you always" and then disappeared.

Ohm, Peace, Peace, Peace.

Lord Gouranga Murty Darshan

By Rameshananda Saraswati

On the occassion of Rash Purnima I went to Nabadwip to see Lord Gouranga and His Holly birth place with some devotees of my locality. When we reached there in the house of Hari Das Rajbangshi of No 1 Sri Gouranga colony of Nabadwip. Dt. Nadia of West Bengal in the Platform of Rly. Station we found Lots of devotees present there and rush in the roads & streets of Nabadwip.

Next when we got out on the road to see the Holy Temples we found a galaxy of Temples there, Sribhash Angina golden Gouranga, poramatola, Sri Goshai's Temple, Nitya Nandya Temple, Last of all we reached at Mayapur we found there one Neemtree where Sri Gouranga was born. Nrishingha Murty, Rash Murty, Laxmi priya Murty, Bishnu priya Murty and Lord Gouranga Dev. Then we visited Mayapur and saw the poramatola and returned to the house of Haridas Rajbangshi. After day's journey we were tired. We took our meals, went to bed early.

I dreamed a dream that Lord Gouranga came to me gave a flower and said, take this Nirmalya, put it with you, I am the Lord Brajananda, Don't worry, I am always with you. Then loguhted loudly, the dream broken. I got up from the bed and found it was dawn. I called my companions and got out for Rly. Station return home.

Ohm, Peace, Peace, Peace.

Laxmi Narayan Murty Darshan

By Rameshananda Saraswati

In one mid-night while I was in meditation, a heavy blast of wind dashed against room. It was about to be dazed the ground and I was fightened and was trambling with fear.

Suddenly a focus of light fall upon my head through the window. It was a winter night. There was silence all around, no sounds, no horn of Motor can and even not the sound of falling leaves from tree were heard. That circular light was as circular as the sun when sets in the West. After a while that light took the form of Basuki Nag and beneath the Nag there was mother Laxmi Devi & father Naryan. I requested them to sit on the Ashan. After that I asked them "Do you know, the Swami Brajananda Sarswaty"? Narayan said, I am God Brajananda Then and then the Mother Laxmi and Father Narayan united to-gather to turn to Swami Brajananda God Omnipotent. He gave me the one Nirmalaya and blessed me so to win India in the name of His religion.

Ohm Peace, Peace, & Peace,

ঠাকুরের কিছু প্রয়োজনীয় ভজন

কথা ও সুর ভক্ত সচীন
সুর : ভৈরবী—তাল : একতালা

জাগো জাগো জাগরে মন, বল ব্রজানন্দ হরে হরে।
বল ব্রজানন্দ নাম, বলরে অবিরাম, কলুষ যাইবে দূরে।
ব্রজানন্দ হরি, ভব পারের কাণ্ডারী, পতিতে পার করেন কৃপা করে।
জাগো জাগো জাগরে মন, বল ব্রজানন্দ হরে হরে।
সময় থাকিতে, চল ভব পারে, বল ব্রজানন্দ হরে হরে।
বল ব্রজানন্দ নাম, চল ব্রজানন্দ ধাম, সংসার বাসনা ছেড়ে।
জয় জয় ব্রজানন্দ, চিন্ময় পরমানন্দ, চৈতন্য চিদানন্দ পরম ব্রহ্ম হরে।
শ্রীগুরু ব্রজানন্দ, নমো নারায়ণ, সন্ন্যাসী জগৎ গুরু, গাও সমস্বরে।
জাগো জাগো জাগরে মন, বল ব্রজানন্দ হরে হরে।

অর্ঘ্যম্

কথা ও সুর : ভক্ত কুমার

নিত্যং পূর্ণং পরমাত্মরূপম্
নিরঞ্জনং তং দেবাদিদেবম্।
যোগিজনবাঞ্ছিতং পরমার্থপ্রদম্
ভজামি ব্রজানন্দ পদারবিন্দম্।। ১

লম্বোদরং তং শ্যামতনুধরম্
জানুলম্বিত বর্ত্তুল যুগ্মকরম্।
দয়ানিধিং সাধুজনৈক গতিম্
ভজামি ব্রজানন্দ পদারবিন্দম্।। ২

ভবভীতি হরণং ভবরোগ নাশনম্
ত্রিতাপ দহনং কলুষ শোষণম্।
অভীষ্ট দাতারং শঙ্কট ত্রাতারম্
ভজামি ব্রজানন্দ পদারবিন্দম্।। ৩

চন্দন চর্চ্চিত প্রশস্ত ভালম্
বক্ষঃ বিলম্বিত কুসুম হারম্।
কটীবাস শোভিতং সিদ্ধাসনস্থম্
স্মরামি ব্রজানন্দ পদারবিন্দম্।। ৪

বরাভয় করং প্রেমাশ্রু নেত্রম্
পতিতোদ্ধারে ভূশমাদ্রচিত্তম্।
করুণাবতারং শিশোরিব স্বভাবম্
স্মরামি ব্রজানন্দ পদারবিন্দম্।। ৫

ধর্ম্মার্থ কামান্ সদাবিতরণম্
ভক্তভক্তানাং ভবভীতি হরম্।
শরণাগতানাং শরণং পুণ্যম্
স্মরামি ব্রজানন্দ পদারবিন্দম্।। ৬

হরিকথা কীর্ত্তনে সুমধুর কণ্ঠম্
হরিকথা শ্রবণে পুলকিতমঙ্গম্।
হরিগুণ মননে নিশ্চল দেহম্
নমামি ব্রজানন্দ পদারবিন্দম্।। ৭

শিবোহহং শিবোহহং চিরং কূজন্তম্
মহতো মহীয়ান্ গতোহসি শিবত্বম্।
প্রফুল্ল বদনং ব্রজরাজ তুল্যম্
নমামি ব্রজানন্দ পদারবিন্দম্।। ৮

নাহং জানে তব মহিমানম্
ক্ষমস্ব কৃপায়া মম অপরাধম্।
নিত্যং ভজামি স্মরামি নিত্যম্
নমামি ব্রজানন্দ পদারবিন্দম্।। ৯

মানুষ হয়ে বসে আছ

কথা ও সুর ভক্ত তুলসী

মানুষ হয়ে বসে আছ, জীবে চিনে না
ধরা দিলে না, ধরা দিলে না, জীবে চিনে না।
হে ব্রজানন্দ বুড়াশিব, জীবে জানে না।
একুল ওকুল দুকুল খেয়ে, জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে নিয়ে
শিব হয়ে বসে আছ, জীবে চিনে না।
ভক্তির ছড়া ছড়িয়ে দিয়ে জীবের মন টেনে নিয়ে
বাঁশী হাতে বসে আছ, জীবে চিনে না।
অগাসুরা, বগাসুরা, কংস আর শিশু ছোড়া
বীর দর্পে কুরুক্ষেত্রে, অসুর কুল ধবংস করে
গোপীর প্রেমে লাথি খেয়ে রাজা হয়ে বসে আছ মনে
পড়ে না।
জীবের মঙ্গল তরে, অবতীর্ণ শিবধামে,
ভক্তি বিশ্বাস বিলিয়ে দিচ্ছ জীবে বুঝে না।

শ্রীশ্রীমৎ ব্রজানন্দ স্বামীর ভোগ আরতি ভজন

কথা ও সুর : ভক্ত ডাঃ বরদাপ্রসাদ ভৌমিক

ভজ গোবিন্দ মাধব ব্রজানন্দ হরি,
ব্রজানন্দ ব্রজানন্দ ব্রজানন্দ হরি,
রাধাকৃষ্ণ একাধারে হের নয়ন ভরি।
ভজরে ভজরে মন ভজ ব্রজানন্দ,
জয় শম্ভু জয় শম্ভু বল শ্রীরাধাগোবিন্দ।
বৈঠল বৈঠল ঠাকুর বৈঠল ভোজনে,
মাঈরা আনে নানা দ্রব্য হরষিত মনে।
বেত অগ্র, ভাজা বড়া, বেগুন কালিয়া,
ছিম পাতরী, ডাল রস, শুক্‌ত রাঁধিয়া;
দধি দুগ্ধ ছানাবড়া খাইতে খাইতে—
মিষ্টানের বাটী (প্রভু) নিল নিজ হাতে।
খাস্তা লুচি খাজা গজা রুটি আর পরটা,
রসগোল্লা রসকদম্ব সন্দেশ ও মণ্ডা।
সেবা অন্তে ব্রজানন্দ আচমন করিল,
চারু মাই চারু মাই বলে ফুকারি উঠিল।
হুড়াহুড়ি করে সবে মাইরা আসিল।
নগ্ন শিশু পিছে পড়ে কাঁদিতে লাগিল।
একে একে ব্রজানন্দ প্রসাদ বিতরিল,
প্রসাদ নিয়ে ভক্তেরা সব দণ্ডবৎ করিল।
ভজরে ভজরে মন ভজ ব্রজানন্দ
কাঙ্গাল বেশে অবতীর্ণ শ্রীরাধাগোবিন্দ।
ভজরে ভজরে মন, ভজ ব্রজানন্দ,
জয় শম্ভু, জয় শম্ভু বল শ্রীরাধাগোবিন্দ।

লুটের ভজন

কথা ও সুর - বেলঘরিয়ার জনৈক ভক্ত

লুট পড়লো লুট পড়লো লুট পড়লো রে।
ব্রজানন্দের প্রেমের হাটে, লুট পড়লো রে।
ভক্তবৃন্দ যত ছিল ছুটে এলো রে
ব্রজানন্দের প্রেমের হাটে-মিলিলোরে।
নামের সন্দেশ নামের চিনি লুট পড়লো রে
রসিক যারা ছিল তারা লুটে নিলো রে।
চিনির মুণ্ডা, ফুল বাতাসা লুট পড়লো রে
ভক্তবৃন্দ যত ছিল লুটে নিলো রে।
পাপী তাপী যত ছিল উদ্ধারিল রে,
কারো কারো ভাগ্য দোষে পড়ে রইল রে।
প্রেমানন্দে বল সবে ব্রজানন্দ হরে,
যাবে যদি ব্রজধামে ছুটে এস রে।।

জয় ব্রজানন্দ জয়

কথা ও সুর - মধুসূদন ঘোষ, ঢাকা

আনন্দে বলরে, জয় ব্রজানন্দ জয়।
আনন্দে বলরে, জয় ব্রজানন্দ জয়।
পাপ তার দূর হবে, হবে কর্মক্ষয়।
জয় হবে, জয় হবে, হবে রিপুর লয়।
হে হরি মাধব করুণাময়,
ঠাকুর গুরুদেব শিব, গুরুদেব শিব।
আনন্দে বলরে, জয় ব্রজানন্দ জয়।
ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি।

শ্রীশ্রীগুরুনারায়ণের পাঁচালি

কথা ও সুর : রমনীমোহন দাস

হরে ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে।
গৌরহরি বাসুদেব, রামনারায়ণ হরে। (ধূয়া—'হরে ব্রজানন্দ হরে')
ভক্তিনিষ্ঠা সহকারে এ তারক ব্রহ্মনাম
লও যত ভক্তগণ হবে পূর্ণ মনস্কাম। (ধূয়া—'হরে ব্রজানন্দ হরে')
যুগে যুগে দেন প্রভু নব নব মহানাম;
সেই রস পান করি তৃপ্ত জীব অবিরাম। (ধূয়া—'হরে ব্রজানন্দ হরে')
নবতম এই নাম ভজ চিত্ত, কর সার,
যাবে দূরে তাপ জ্বালা হৃদয়ের অন্ধকার। (ধূয়া—'হরে ব্রজানন্দ হরে')
যাবে দূরে নিরানন্দ, পাবে শান্তি প্রেমানন্দ।
ভক্তি ভরে বল সবে, 'জয় জয় ব্রজানন্দ'। (ধূয়া—'হরে ব্রজানন্দ হরে')
ব্রজানন্দ-লীলা কথা অমৃত সমান।
যেবা পড়ে, বলে শোনে-সেই ভাগ্যবান। (ধূয়া—'হরে ব্রজানন্দ হরে')
যুগে যুগে হয় যবে ধরমের গ্লানি,
অর্ধমের অভ্যুদয়; আসে চক্রপাণি। (ধূয়া—'হরে ব্রজানন্দ হরে')
ন্যায়, নীতি, ধর্ম, কর্ম দিয়া বিসর্জন
সহিংস তাণ্ডবে নাচে অসুর দুর্জন। (ধূয়া—'হরে ব্রজানন্দ হরে')
নব নব অস্ত্রে ধরা নাশিবারে চায়;
অসহায় নরগণ করে "হায়! হায়!" (ধূয়া—'হরে ব্রজানন্দ হরে')
শান্তিধাম ব্রজানন্দ করুণা আধার
হইলেন অবতীর্ণ তাইতো এবার। (ধূয়া—'হরে ব্রজানন্দ হরে')
অপর কারণ এক করিব বর্ণন—
স্বয়ং প্রভু হতে আমরা করেছি শ্রবণ। (ধূয়া—'হরে ব্রজানন্দ হরে')
দ্বাপরেতে রাধাপ্রেমে ঋণী হ'য়ে হরি
সেই ঋণ শুধিলেন গৌররূপ ধরি। (ধূয়া—'হরে ব্রজানন্দ হরে')
লীলা অবসানে কাঁদে যত ভক্তগণ—
তাহা দেখি মহাপ্রভু বিচলিত হ'ন। (ধূয়া—'হরে ব্রজানন্দ হরে')
"কেঁদো না, কেঁদো না সবে", বলে দয়াময়—
"তোমাদের তরে হ'বো কনৌজে উদয়। (ধূয়া—'হরে ব্রজানন্দ হরে')
রাধাকৃষ্ণ একদেহে হ'য়ে ব্রজানন্দ
বিতরিব তোমা সবে শান্তি ও আনন্দ। (ধূয়া—'হরে ব্রজানন্দ হরে')

—ঈশান কোণেতে হবে বুড়াশিবধাম
লীলাক্ষেত্র ঢাকা মাঝে মহা তীর্থস্থান। (ধূয়া—'হরে ব্রজানন্দ হরে')
হোতা হ'তে হ'বে মোর লীলার বিকাশ
ক্রমে ক্রমে ভক্তহৃদে পাইব প্রকাশ"। (ধূয়া—'হরে ব্রজানন্দ হরে')

জয় জয় ব্রজানন্দ গুরু নারায়ণ,
সবার আরাধ্য দেব নিত্য নিরঞ্জন। (ধূয়া—'জয় গুরু নারায়ণ')
অনাদি, অনন্ত, শান্ত, পরব্রহ্ম তুমি,
ধ্যানাতীত, জ্ঞনাতীত, প্রেমভক্তি ভূমি। (ধূয়া—'জয় গুরু নারায়ণ')
সৃষ্টির পূর্বেতে তুমি ছিলে নিরাকার;
লীলাখেলা স্থলে প্রভু হইলেন সাকার। (ধূয়া—'জয় গুরু নারায়ণ')
তুমিই পরমেশ্বর অনাথের নাথ
অগতির গতি তুমি, তুমি জগন্নাথ। (ধূয়া—'জয় গুরু নারায়ণ')
দেব আদিদেব, প্রভু, তুমি ইচ্ছাময়,
তোমার ইচ্ছাতে হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়। (ধূয়া—'জয় গুরু নারায়ণ')
ওহে ব্রজানন্দ তব মহিমা অপার
বিশ্বজীবে কর কৃপা কৃপার আধার। (ধূয়া—'জয় গুরু নারায়ণ')
হিংসা, দ্বেষ, ভেদজ্ঞান লউক বিদায়
হোক্ ধরা স্বর্গরাজ্য তোমার কৃপায়। (ধূয়া—'জয় গুরু নারায়ণ')
জীবের লাগিয়া তুমি সেজেছো কাঙাল,
অপরূপ লীলা তব হে দীনদয়াল! (ধূয়া—'জয় জয় ব্রজানন্দ')
কলিকাতা মাঝে ওহে পতিত পাবন,
গুরুধাম মহাতীর্থ করিলে স্থাপন। (ধূয়া—'জয় জয় ব্রজানন্দ')
শান্তি-প্রেম-আনন্দের আদর্শ তোমার
বেদনার্ত ধরা মাঝে কর হে প্রচার। (ধূয়া—'জয় জয় ব্রজানন্দ')
নিরানন্দ অশান্তির দাবানল যত
তোমার কৃপায় প্রভু হোক নির্বাপিত। (ধূয়া—'জয় জয় ব্রজানন্দ')
'তত্ত্বমসি', 'সোহঙ্কার' শোনাও তোমার,
চিনাও স্বরূপ শুদ্ধ জীবে আপনার। (ধূয়া—'জয় জয় ব্রজানন্দ')
সকলের মাঝে আছ আত্মারূপে তুমি,
তোমা মাঝে সব আছে, হে জগৎ স্বামী! (ধূয়া—'জয় জয় ব্রজানন্দ')
'কেবা কারে মারিবেক,—কেবা হত হবে'?—
যেন এই শুদ্ধ জ্ঞান বিশ্বজীব লভে। (ধূয়া—'জয় জয় ব্রজানন্দ')
প্রেম ভক্তি বিশ্বাসের শান্তি আশীর্ব্বাদ
দিয়ে দূর কর দুঃখ অশান্তি বিষাদ। (ধূয়া—'জয় জয় ব্রজানন্দ')

বাঞ্ছা কল্পতরু দেব, তোমার কৃপায়,
অপুত্রক পুত্র লভে, দীন ধন পায়।
বধির শ্রবণ করে অন্ধ দৃষ্টি পায়,
বোবা বলে, 'ব্রজানন্দ' তব মহিমায়,—
চিররোগী লভে স্বাস্থ্য, দুঃখী পায় সুখ,
তোমারে ভজিয়া কেহ হয় না বিমুখ।
ভকতি বিশ্বাস নিয়া যেবা সেবা করে,
সম্পদে বিপদে তুমি বাঁধা তার ঘরে।
সকল অভীষ্ট পূর্ণ কর হে তাহার,
অন্তিমেতে দাও শান্তি আনন্দ অপার।
পরম দয়াল তুমি, হে সচ্চিদানন্দ,
সকলের মাতাপিতা শ্রীরাধাগোবিন্দ।
রাতুল চরণে, প্রভু, প্রার্থনা আমার
শ্রীচরণে মতি গতি দাও গো সবার।
দীন, হীন, অভাজন নাহিক শকতি
প্রেম-ভক্তিসহ লহ সাষ্টাঙ্গ প্রণতি।
মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন, ভক্তিহীন আমি;
তুমিই তোমার পূজা করে নাও স্বামী!
হরে ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে।
গৌর হরি বাসুদেব রামনারায়ণ হরে।।

(ধূয়া—'জয় জয় ব্রজানন্দ')

(ধূয়া—'জয় জয় ব্রজানন্দ')

(ধূয়া—'জয় জয় ব্রজানন্দ')

(ধূয়া—'জয় জয় ব্রজানন্দ')

(ধূয়া—'জয় জয় ব্রজানন্দ')

(ধূয়া—'জয় জয় ব্রজানন্দ')

(ধূয়া—'জয় জয় ব্রজানন্দ')

(ধূয়া—'জয় জয় ব্রজানন্দ')

(তিনবার করার পর প্রণাম মন্ত্র পাঠ করবেন)

—ঃ প্রণাম মন্ত্র ঃ—

ওঁ সত্যং শিবং সুন্দরম্, সৃষ্টি স্থিতিলয়ঙ্করম্।
প্রেমভক্তিমন্দিরম্, আনন্দঘনবিগ্রহম্।
দ্বৈতাদ্বৈতমনন্তম্, সাকারং নিরাকারম্বা।
স্বভক্তিং প্রণমাম্যহম্, পরমব্রহ্ম ব্রজানন্দম্।।
ইতি সর্বার্থসাধনফলদায়ক
শ্রীশ্রী গুরুনারায়ণ পাঁচালি সমাপ্তম।

শ্রীশ্রীবুড়াশিব মাহাত্ম্যর কিছু স্মরণীয় লেখা ভূমানন্দমাঈইর

প্রারম্ভ

নমো নমো গণপতি সর্বসিদ্ধি দাতা।
গায়ত্রী সাবিত্রী সরস্বতী বেদমাতা।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রণমি চরণে।
একত্রে বন্দিনু আমি যত দেবগণে।।
শিবের মহিমা কিছু অপূর্ব কথন।
শ্রীগুরু প্রসাদে আজ করিব বর্ণন।।

শ্রীশ্রীবুড়াশিব আরতিস্তুতি

জয় বাবা বুড়াশিব নিত্যনিরঞ্জন,
আদিদেব মহেশ্বর পতিত পাবন।
তোমারি ইচ্ছায় হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়,
তুমি যে বিশ্বের কর্ত্তা সবর্ব শাস্ত্রে কয়।
তুমি ত রয়েছ সব ভূবন ভরিয়া,
মায়াতে রেখেছ সবায় আচ্ছন্ন করিয়া।
তাই সবায় অহঙ্কারে আমি আমি করে,
প্রকৃতির কর্মে যেয়ে বদ্ধ হয়ে পড়ে।
ঘুঁচাতে জীবের এই মায়ার বন্ধন,
বহু মত পথ তুমি করেছ সৃজন।
তুমিই যে একমাত্র সর্ব মূলধার
তুমি বিনে ত্রিভূবনে কেহ নাহি আর।

ভগবান শঙ্করাচার্য্যের
তীর্থযাত্রা ও মহালিঙ্গ দর্শন
ভূমানন্দ সরস্বতী মাঈ

মদন মোহন রূপে তেজে অংশুমান।
মূর্ত্তিমান জ্ঞানে যার দেহ নিরমাণ।।
সখারূপে আরাধিয়ে বেদান্ত বিজ্ঞান।
শঙ্কর আচার্য্যরূপী শিব ভগবান।।
আগম পুরাণ বেদ করি অধ্যয়ন।
কালিকাপুরাণ শেষ করেন দর্শন।।
অধ্যায়ে অশীতিতম দৃষ্টি অকস্মাৎ।
বৃদ্ধ গঙ্গাতীরে গঙ্গাধর বিশ্বনাথ।।
অনন্তর অন্তরে সুদৃঢ় বিচারিয়া।
শিষ্যসহ চলিলেন কাশী তেয়াগিয়া।।
বিশ্বনাথ শিব আগে করি দরশন।
ব্রহ্মপুত্র স্নানে যাব হইল মনন।।
কাশী হতে বুড়ীগঙ্গা শতেক যোজন।
শিষ্য সহ পদব্রজে করেন গমন।।
কত শত নদ নদী হেরে অগণন।
কত গ্রাম কত ধাম হল দরশন।।
ব্রহ্মপুত্র নদ সীমা প্রান্তরের দেশে।
মাতা বুড়ীগঙ্গা নদী শাস্ত্রেতে প্রকাশে।।
সেই স্থানে মহামতি শিষ্যসহ গিয়া।
কোথা সেই বিশ্বনাথ ভাবেন বসিয়া।।
চারিধারে বনাকীর্ণ দেখি ভয়ঙ্কর।
দেবতা মন্দির নাহি কিম্বা নারীনর।।
ভাবিয়া আচার্য্য কন শিষ্যগণ প্রতি।
স্নান ক'রে ভিক্ষা মাঙ্গি আন শীঘ্রগতি।।
গুরুদেব আজ্ঞা শুনি শিষ্য সমুদয়।

শিরোধার্য্য গুরুবাক্য করিয়া নিশ্চয়।।
স্নান করি ফলমূল আনি বন হ'তে।
এরূপ বিচারী বসি ভাবিতেছে চিতে।।
ইতিমধ্যে বন হতে ব্রাহ্মণের বেশে।
বৃদ্ধ দ্বিজ আসি' বলে আচার্য্য সকাশে।।
কেবা তুমি কি কারণে আসিলে হেথায়।
সত্বর করিয়া মোরে কহ পরিচয়।।
আচার্য্য বলেন আমি নামেতে শঙ্কর।
কাশীবাস করি আমি শুন দ্বিজবর।।
এ স্থানেতে বিশ্বনাথ করেন নিবাস।
অমোঘ বচন ইহা শাস্ত্রেতে প্রকাশ।।
না হেরি দেবতা স্থান না হেরি মানব।
ভাগ্যে বুঝি দরশন হল অসম্ভব।।
ইহা শুনি বৃদ্ধ কহে শুনহ বচন।
আজি মম গৃহে প্রভু কর আগমন।।
পত্নী সহ এই বনে করি আমি বাস।
কেহ নাই মম ঠাঁই এই মোর হতাশ।।
অতি বৃদ্ধা পত্নী মম অক্ষমা কর্ম্মেতে।
ক্ষুণ্ণমনা আছি আমি সেবা অভাবেতে।।
সেবার অভাবে আমি থাকি উপবাসী।
দেশের মানব কেহ জিজ্ঞাসে না আসি'।।
এ কারণে অতি দুঃখে আছি নিরন্তর।
চল এবে দয়া করি' তুমি মম ঘর।।
বহুকাল হ'তে তব করি অন্বেষণ।
খুঁজিয়া না পাই তোমা বিধির লিখন।।
কৃপা করি যদি মোরে দিলে দরশন।
আমারে উদ্ধার কর এ মোর বচন।।
তুমি বিনা কেবা মোরে করিবে উদ্ধার।
শঙ্কর রূপেতে তুমি এলে নরবর।।

এবে তুমি দয়া করি চল মম ঘরে।
আমি তোমা দেখাইব সে বিশ্বনাথেরে।।
ইহা শুনি মহামতি আচার্য্য শঙ্কর।
বৃদ্ধের সহিতে যান হইয়া সত্বর।।
কিছু দূরে গিয়া সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরে।
দৃষ্টির গোচরে আর কেহ নাহি হেরে।।
ইহা দেখি শিষ্যগণে বলেন শঙ্কর।
ওই বৃদ্ধ বুঝি সেই দেব পরাৎপর।।
এত বলি অগ্রসর হলেন শঙ্কর।
অশ্বত্থ নামেতে তথা এক বৃক্ষবর।।
দেখিয়া বিশ্রাম আশে হয়ে অগ্রগামী।
দেখিলেন লিঙ্গরূপে জগতের স্বামী।।
দর্শন করিয়া অতি হরষিত মন।
এই সেই বিশ্বনাথ দেব ত্রিলোচন।।
ভগবান বিশ্বনাথ কৃপা যে করিয়া।
ব্রাহ্মণ রূপেতে মোরে দরশন দিয়া।।
পথ দেখাইলে প্রভু যথা নিজস্থান।
মানবের সাধ্য কিবা পাইতে সন্ধান।।
এত বলি শিষ্যগণে কহেন যতনে।
অবস্থিতি কর আজ শিব সন্নিধানে।।
মহালিঙ্গ বিশ্বনাথ উদ্ধার কারণ।
একাগ্র মনেতে আমি করিব যতন।।

শ্রীশ্রী গুরুর আরতিস্তুতি ভূমানন্দ সরস্বতী মাঈ

জয় ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে,
ভব সাগর সে তার স্বামী পূরণ অবতারে,
জয় ব্রজানন্দ হরে; হরে ব্রজানন্দ হরে। ১।

সৎ চিত আনন্দ তুমহো, অজর অমর সায়ে
অচল অটল নিরগুণ কষ্ট হরণ হারে

জয় ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে। ২।

অখণ্ড ঘট ঘট বাসী, কহতে বেদ চারে,
জগমে তুম, তুম মে জগ, ফির জগসে ন্যারে
জয় ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে। ৩।

নিত্য নিরবন্ধন অসঙ্গ অবিকারে,
অলক্ষ্য নিরঞ্জন শিবহো ব্যাপক তুম্সারে,
জয় ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে। ৪।

নিত্য তৃপ্ত কৃত কৃত্য হো রাগ দ্বেষ জারে,
শরণাগত পতিতনকো ব্রহ্মলোক ভারে,
জয় ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে। ৫।

অধিষ্ঠান হো সবকে তুম্ অপরম পারে,
সৌখ্য স্বরূপ প্রকাশক পাণী খলতারে,
জয় ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে। ৬!

জিজ্ঞাসু ভকতন্কে কাম ক্রোধ মাবে,
লোভ মোহ মদ্ মৎসর ছল বল সবগারে,
জয় ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে। ৭।

স্বতন্ত্র হো অবিনাশী জনম মরণ তারে,
ভক্ত মুক্তকে কারণ বহুৎ রূপ ধারে,
জয় ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে। ৮।

ভক্ত মুক্ত যো চাহে ধ্যান ধরে সারে,
দৃঢ় বিশ্বাস কিয়ো যিন সর্ব ক্লেশ টারে,

জয় ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে। ৯।

আওয়া গমন ভয়ানক হ্যায় ভুজঙ্গাকারে,
লাভ ভ্রমর মে ঘুমে কর খেওয়া পারে,
জয় ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে। ১০।

মহানিশামে আরতি নিশ্চয় করিগারে,
আত্মানন্দ নিরন্তর নির্ভয় পদ পারে,
জয় ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে। ১১।

অথ ধ্যানম। - ভূমানন্দ সরস্বতী মাঈ

তব নিঃশ্বসিতং বেদাস্তব স্বেদোহখিলং জগৎ।
বিশ্বভূতানি তে পাদো শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষং লোমানি চ বনস্পতিঃ।
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যস্তব প্রভো।
ত্বমেব সবর্বং ত্বয়ি দেব সবর্বং স্তুতি-স্তোতা-স্তব্য
ইহ ত্বমেব। ঈশ! ত্বয়াবাস্য মিদংহি সবর্বং,
নমোহস্তু ভূয়োপি নমো নমস্তে।।

শ্রীধাম বর্ণন - ভূমানন্দ সরস্বতী মাঈ

দেখেন চাহিয়া, বনমধ্যে গিয়া,
চারিদিকে বৃক্ষবরে।
(অতি) বিশাল অশ্বত্থ বটবৃক্ষ সনে,
শাখায় শাখায় ঘেরে।।
(কত) বকুল চম্পক, নাগেশ্বর রাজি,
কদম্ব শোভিছে তায়।

কাঞ্চনের ফুলে, শোভা করে বন,
কিবা মনোহর হায়।।
তমাল পিয়াল, খর্জ্জুর রসাল,
তাল বৃক্ষ স্তরে স্তরে।
দেবদারু তাম্র, পনস শ্রীফল,
চারিদিকে আছে ঘেরে।।
(দেখ) মাধবী লতায়, শাখায় শাখায়,
শোভিছে আদর ভরে।
শিব অপরাধী, কেতকী কুসুম,
মনোদুঃখে আছে দূরে।।
(ঐ) ডালে ডালে বসি পাপিয়া কোকিল,
ধরিয়া মধুর তান।
শিব শিব বলি, ডাকিতেছে তারা,
শুনিয়া জুড়ায় প্রাণ।।
(বৃক্ষ) ফল ফুল ভরা, নতশিরে তারা
প্রভুর পূজন আশে।
(যেন) কার প্রতীক্ষায়, আছে দাঁড়াইয়া,
ঘেরিয়া চতুর পাশে।।
(ভীষণ) শ্বাপদ গণেতে, বেষ্টিত কান্তার
গভীর গর্জ্জন রবে।
ধীরে ধীরে তারা, বেড়িয়া কানন,
প্রদক্ষিণ করে শিবে।।
এতেক দেখিয়া, আচার্য্য শঙ্কর,
না করিলা কোন ভয়।
(জয়) বিশ্বনাথ বলি, দুটি বাহু তুলি,
কৃপা কর দয়াময়।।
(দেখেন) রাশি রাশি কত গলিত পাতায়,
স্তূপাকারে শিব মাথে।
নানাবিধ কীট, খেলিতেছে তারা,

সঙ্গীরূপে শিব সাথে।।
দেখিয়া এ ভাব, বুক ফেটে যায়,
একি দেখি লীলাময়!
কি তব ছলনা, বুঝিতে পারিনা,
কর কৃপা দয়াময়।।
লয়ে, বিল্বদল, বুড়ীগঙ্গাজল,
ফল ফুল রাশি আনি।
গন্ধ ধূপ দীপ, নানা উপচারে,
পূজিলেন শূলপাণি।।

মহালিঙ্গ উদ্ধারণ - ভূমানন্দ সরস্বতী মাঈ

ধ্যান মগ্ন যোগাসনে বসি অতঃপর।
তিন অহোরাত্র রহে আচার্য্য শঙ্কর।।
রাত্রিশেষে মহাশব্দ উঠে সেই স্থানে।
প্রলয়পয়োধি সম ভীষণ গর্জ্জনে।।
সমুদ্র মন্থন কালে মন্দর পর্ব্বতে।
উঠেছিল ভীম ধ্বনি ভয় দিয়ে চিতে।।
সেরূপ এ মহাধ্বনি অতি ভয়ঙ্কর।
শুনিয়া উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইল শঙ্কর।।
বুড়ীগঙ্গা জল প্রতি করে দৃষ্টিপাত।
মহাতেজ আবির্ভূত দেখিলেন হঠাৎ।।
সেই তেজ হেরে চিত্ত হল ব্যাকুলিত।
অন্ধীভূত দিশাহারা থর থর চিত।।
এত দেখি মোহপ্রাপ্ত হলেন শঙ্কর।
এ শাম্ভবী মায়া ইহা জানিয়া অন্তর।।
জানুদেশে ভূতলেতে পাতিত করিয়া।
একাগ্র মনেতে প্রভু নয়ন মুদিয়া।।
উচ্চৈঃস্বরে শম্ভুনাম করে উচ্চারণ।
স্তব শুনে তুষ্ট হন দেব পঞ্চানন।

প্রপন্ন জনের বন্ধু দুঃখ অপহারী।
মম প্রতি কর দয়া ওহে ত্রিপুরারি।।
বিশ্বেশ্বর বিশ্ববন্দ্য ওহে গঙ্গাধর।
অনাথেরে কর কৃপা ওহে দিগম্বর।।
সংসারের ভীতি হ'তে কর পরিত্রাণ।
তোমা বিনা নাহি গতি করুণা নিদান।।
ভূমিস্থিত যত বৃক্ষা লতা সমুদয়।
প্রলয় কালেতে হয় তোমাতেই লয়।।
তেমতি জীবেরে প্রভু উৎপাদন করি।
সংহার করহ তুমি কালরূপ ধরি।।
দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি যত সিদ্ধগণ।
সুরাসুর নরনারী তোমারি সৃজন।।
গঙ্গা আদি তরঙ্গিণী সমুদ্র সকলে।
তোমাতেই করে স্থিতি ওহে চন্দ্রমৌলে।।
'আমিত্ব' না ছাড়ি জীব মায়ায় মোহিত।
ভ্রান্তিবশে যেইরূপ শুক্তিতে রজত।।
তব মায়া কে বুঝিবে ওহে ত্রিলোচন।
তোমারই মায়াবশে জগতী সৃজন।।
ক্ষম মম অপরাধ ওহে দয়াময়।
দীন হীন আমি অতি হও হে সদয়।।
ইত্যাদি অনেক স্তব করেন শঙ্কর।
তুষ্ট হইল আশুতোষ পরম ঈশ্বর।।
শিবপদে প্রণমিয়া প্রফুল্ল অন্তর।
ভাবে গদ গদ চিত আচার্য্য শঙ্কর।।
কমল নয়ন দেব করি উন্মালন।
শীতাংশু সমান তেজ হল দরশন।।
যতই করেন দৃষ্টি সেই তেজ পানে।
ভূষণে ভূষিত বৃষ হেরে সে নয়নে।।
সাগর মথনোৎপন্ন নবনীত প্রায়।

শুভ্র বৃষ দরশনে পুলকিত কায়।।
শুদ্ধ স্ফটিকের সম দেহ কান্তি যাঁর।
কোটি দিবাকর সম জ্যোতির আধার।।
কোটি চন্দ্র যিনি দেহ সুশীতল অতি।
ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধায়ী সেই পশুপতি।।
সর্পরূপ উপবীত যুক্ত কলেবরে।
ভূষিত সে শিবতনু সবর্ব অলঙ্কারে।।
চপলা সদৃশ জটা পিঙ্গল আকারে।
নীলকণ্ঠ ব্যঘ্রচর্ম্ম উত্তরীয় ধরে।।
নানাবিধায়ুধ দশকরে বিরাজিত।
ত্রিলোচন যুবাশ্রেষ্ঠ হোরয়া মোহিত।।
সচ্চিদানন্দ মূরতি অতি মনোহর।
বৃষোপরি দরশন করেন শঙ্কর।।
সে বৃষের একদেশে পূর্ণচন্দ্রাননা।
নীলেন্দীবর লোচনা দেবী ত্রিনয়না।।
জগত জননী মাকে করি দরশন।
তুষ্ট অতি মহামতি আনন্দে মগন।।
বিন্ধ্য পবর্বতের সম উচ্চ কুচদ্বয়।
সেই ভারে অবনতা শোভে অতিশয়।।
তাঁহার অতীব সূক্ষ্ম মধ্য কটিদেশ।
রমণীয় আভরণ ধারিণী সুবেশ।।
দিব্য গন্ধে অনুলিপ্তা দিব্য মাল্যথরা।
দিব্য বস্ত্র পরিধানা অতি মনোহরা।।
মুখখানি সুশোভিত তাম্বুলের রাগে।
শিব অঙ্গে অঙ্গ ঢালি আলিঙ্গন মাগে।।
জগতের উপাদান স্বরূপে অরূপা।
সমস্ত সৌন্দর্য্যরাশি ধরে বিশ্বরূপা।।
ইহা দেখি আনন্দিত শঙ্কর সুমতি।
কৃতাঞ্জলি হয়ে ভক্তিভাবে করে স্তুতি।।

কৃতাঞ্জলি হয়ে ভক্তিভাবে করে স্তুতি।।

সন্ন্যাসী মাহাত্ম্য ভূমানন্দ সরস্বতী মাঈ

শিবলিঙ্গ সহস্রাণি শালগ্রাম শতানিচ,
দ্বাদশ কোটি বিপ্রাণি সপর্য্যমেক সন্ন্যাসী।
সন্ন্যাসী আরাধ্য দেব জগত পূজিত,
জগতের গুরুরূপী শাস্ত্রেতে বিখ্যাত।
ত্রিতাপে তাপিত জীব কেন হাহাকার,
চল কল্পতরু মূলে পাইবে নিস্তার।
বাহিরে সমস্ত বিশ্ব আসুক গর্জ্জিয়া,
তুমি ওই তরুমূলে থাক ঘুমাইয়া।
কত জন্ম জন্মান্তর সংসার কানন,
বন হরিণীর মত করিছ ভ্রমণ;
আশ্রয় পাওনি কোথা জুড়াবার স্থান,
ক্ষণেক বিশ্রামি হেথা শান্ত কর প্রাণ;
অবোধ শিশুর মত কল্পতরুমূলে,
সংসারের কান্নাকাটি দ্বন্দ্ব যাও ভুলে।
চন্দনের সঙ্গে বায়ু সুগন্ধিত বয়,
সাধু সঙ্গে জীব শিব হইবে নিশ্চয়।
এ নিদ্রা সুখের নিদ্রা; ভেঙ্গো নাকো আর,
জেগে যেন পুনঃ আর দেখো না সংসার।
গঙ্গাস্নানে পাপশূন্য হয় জীবগণ,
সাধুসঙ্গে সেইরূপ সফল জীবন।
অঙ্গারের ময়লা কাটে অগ্নির দাহনে,
মানবের মোহ টুটে সাধু সংমিলনে।
সপ্ত সমুদ্রের জল হয়ে একাকার,
উঠুক সমস্ত বিশ্বে প্রলয় হুঙ্কার;
একত্রে দ্বাদশ রবি উদিয়া গগনে,
পোড়াক সমস্ত বিশ্ব, প্রচণ্ড কিরণে;

করুক এ বসুন্ধরা ভেঙ্গে চুরমার;
কল্পান্তের মেঘমালা আসুক গর্জ্জিয়া,
তবু কল্পতরুমূলে থাক ঘুমাইয়া।
সে তরু আশ্রয় বিনা যেন কিছু আর,
আশ্রয় করিতে আশা কর না কাহার।
নীরবে ঘুমিয়ে থাক সেই তরুমূলে,
প্রীতি করুণার ফল পাইবে সকলে।
ওহে কল্পতরুবর সৌরভে তোমার,
হর মন-ইন্দ্রিয়ের চেতনা আমার
বড় শ্রান্তি, বড় ক্লান্তি, এসেছি লইয়া,
তোমারি চরণে ওগো ঘুচাব বলিয়া।
অনন্ত—অনন্তকাল, এ নিদ্রা আমার,
ভেঙ্গো না, মিনতি করি, জাগায়ো না আর।
বাহিরে অনন্ত সিন্ধু করুক গর্জ্জন,
আমি তব ছায়াতলে থাকি অচেতন।
এ নিদ্রা সুখের নিদ্রা ভেঙ্গো নাকো আর,
জেগে যেন পুনঃ আর দেখি না সংসার।

শ্রীশ্রীবুড়াশিব মাহাত্ম্য

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্।
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ।
বিদাম বেদং ভুবনেশমীড্যম।।

ভূমানন্দ
(ঁ কাশীধাম)

রমেশানন্দ মহারাজকে নাটকের বইটি প্রকাশের উদ্দেশ্যে ঠাকুরের আশীর্বাদবাণী

বাবা ব্রজানন্দ একদিন বললেন, "বাবা রমেশানন্দ! এই বুড়োশিব ধাম মহাতীর্থ, এই গুরুধাম গোলকধাম। ব্রজধাম গোপীগণের ব্রজলোক। আর ঐ বুড়োশিব ব্রজানন্দধাম সিদ্ধ ব্রহ্মলোক। তুমি কি ভাবছ এইবার বুঝে নাও আমি কে? আর তুমি কে? এবং এই ভক্তগণই বা কাহারা? কেন এখানে আসে? আর জানতে চেষ্টা করো, খুব ভাল করে চেষ্টা করো সবই জানতে পারবে। মন প্রাণ দেহ সব বিলিয়ে দাও শ্রীগুরুচরণে। আমিত্ব ছেড়ে দিয়ে ঐ শ্রীচরণে মিশে যাও, তাহলে তো ঠাঁই পাবে জানতে পারবে সবই কিছু, বাকী রেখো না।" তারপর বাবা গল্প বলিলেন সেটা নিম্নে বর্ণনা দিলাম। একদিন ভগবান রাজাধিরাজের পোষাক পরে নগরে বের হয়েছেন। সমস্ত নগরবাসীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাইছেন একটা উপলক্ষে এবং বলিতেছেন, 'যাহা দিবে তাহা সহস্রগুণ ফিরে পাবে।' সকলেই ভাবিল মহারাজ আবার ফিরিয়ে দেবেন কি? সকলেই ফাঁকি দিতেছে সুতরাং যৎ সামান্য কিছু দিয়ে বিদায় করো মহারাজকে। এমন সময় এক ভিখারী বৈষ্ণব সারাদিন ভিক্ষা করে গৃহে ফিরিতেছেন। তখন রাজাধিরাজ হাসিমুখে বৈষ্ণবকে কিছু দান করতে বলিলেন। বৈষ্ণবও হাসিমুখে এক মুঠো চাল দিলেন রাজাধিরাজকে। এবং যথারীতি গৃহে ফিরিলেন। পরদিবস প্রত্যুষে দেখতে পেলেন যে ভিক্ষান্নের মধ্যে এক টুকরো স্বর্ণ রহিয়াছে। বৈষ্ণব ভাবিলেন, নিশ্চয়ই কোন বালক-বালিকা ভুল করে ভিক্ষান্নেরও সাথে আমাকে ভিক্ষা দিয়েছে। নিশ্চয় অদ্য তাহার সন্ধান করিতে অবশ্যই কেহ আসিবে কিন্তু সারা দিন কেহ কোনরূপ খোঁজ করিতে আসিলেন না। তখন বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী মহা চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন কি হবে? কি হবে? অত মূল্যবান পদার্থ আমরা কি করিব? ভিখারী এত মূল্যবান স্বর্ণ নিয়ে স্যাঁকরার দোকানে গেলে পরে তো ধরে নিয়ে যাবে রাজার দরবারে, তারপর দিবে শূলে চড়িয়ে। এরূপ ভাবতেই হঠাৎ গভীর রাতে স্বপ্নাদেশ হলো যে, "ওটা কোন গৃহী তোমাকে দেয়নি, বৈষ্ণব ঠাকুর; ওটা তোমাকে স্বয়ং নারায়ণ দিয়েছেন। ঐদিন তুমি ভিক্ষা করে গৃহে প্রত্যাবর্তনের কালে যে এক মুঠো চাল ভগবানকে দান করিয়াছিলে এটা তার প্রতিদান ওই স্বর্ণ টুকরো। কাজেই তোমার কোনও চিন্তার কারণ নেই।" ভিখারী বৈষ্ণব ঠাকুর প্রত্যুষে দুঃখ করিতে লাগিলেন যে, "তখন যদি সমস্ত ভিক্ষান্ন

দিয়ে দিতুম তাহলে এই জনমে আর ভিক্ষা করতে হতো না বৈষ্ণবীকে। আমি কেন তখন সকল শূন্য করে দিলুম না"। তারপর বাবা বলিলেন, "এবার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো রমেশানন্দ।" জয় ব্রজানন্দ হরে।

আবার বাবাকে (গুরুদেব) জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার ঐ বুড়োশিব ধাম কিরূপ ছিলো যখন তুমি তোমার পিতার সাথে ঐ ধামে গিয়ে প্রবেশ করিলে? বাবা বলিলেন, "প্রকাণ্ড বন ওখানে বাঘ, ভাল্লুক সাপাদির ও পশু পক্ষীরই আবাস ছিলো।" তাহলে তোমরা থাকলে কি করে? ওখানেই ছিলুম একটা তালপাতার গৃহে। "আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও"

'তোমাকে অনেক দুঃখ করতে হল কেন তুমি তো ভগবান?' বাবা বলিলেন, "জীব শিক্ষার তরে অনেক কিছু করিতে হয়।" জীব উদ্ধার তরে সব সময় ব্যস্ত কিভাবে ভক্তদের উপরে টেনে তুলবো সেই চেস্টায় রত আছি অবিরত। আমি এসেছি এই ভারতে, এই জগতে যুগে যুগে, একবার এক পোষাকে অন্যবার অন্য পোষাকে অর্থাৎ একবার রাজা অন্যবার ভক্ত এই ভাবে। মূল বক্তব্য হলো ঃ—

'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়শ্চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।'

জগতে যখনই ধর্ম্মের উপর আঘাত এসেছে, ভক্তদের উপর হয়েছে অকথ্য নির্য্যাতন তখনই জগতে আসতে হয়েছে। তাইতো কলিযুগের শেষে এলুম ব্রজানন্দ বুড়োশিব হয়ে। রাম, কৃষ্ণ, হরি এবং গৌরাঙ্গ দেবের সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে জগৎ জীব উদ্ধার তরে। কারণ এই মহা কলিতে জীব উদ্ধার করতে অসীম ক্ষমতার দরকার। একা রামের ক্ষমতায় হবে না, একা কৃষ্ণের ক্ষমতায়ও হবে না এমন কি একা গৌরাঙ্গ দেবের ক্ষমতায়ও হবে না। তাই সকলের ক্ষমতা একত্রিত করে ব্রজানন্দ হয়ে আসতে হলো ভক্তের বাসনা পুরণ করতে। তাই আমি ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু হরি।

"বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থের বাণীর মধ্যেই আমার যুগোপযোগী বাণীগুলি পাবে। গীতায় আমার বাণী, রামায়ণে আমার বাণী আর পাবে চৈতন্য চরিতামৃতে। বর্তমান যুগের বাণীগুলি পাবে গুরুধাম পত্রিকাতে, 'বুড়োশিব মাহাত্মম' লীলা পরিচয়, গুরুর ভজন, অমৃত সাগর এবং ওমনিপটেন্ট এই সমস্ত বইগুলি থেকে সংগ্রহ করো, এবং যখন অভাব বোধ করবে আমি তো রয়েছি সেগুলো জেনে নেবে।" "রমেশানন্দ" ভয়

পেয়ে তুমি পিছিয়ে যেও না আমিতো রয়েছি তোমার ভয় কি? আরেকটা কথা বলছি শুনে রাখো কাজে দেবে। "কুরুক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলিলেন অর্জ্জুন যুদ্ধ করিল যে গাণ্ডীব দিয়ে, সে গাণ্ডীব দিয়ে কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চলে গেলেন। অর্জ্জুন পুররমণীদের নিয়ে গেলেন ভগবানকে দ্বারকায় পৌঁছে দিতে পথি মধ্যে ডাকাত ধরিল যুদ্ধ করতে অর্জ্জুন গাণ্ডীব তুলতে গেলেন কিন্তু সে গাণ্ডীব তুলতে পারলেন না। এবার চিন্তা করে দেখো ঐ যুদ্ধ কে করছে? অর্জ্জুন না শ্রীকৃষ্ণ? তবেই চিন্তা করো বই কে লিখবে তুমি? না আমি? রমেশানন্দ আর বিলম্ব করো না এবার আরম্ভ করো জয়গুরু জয় ব্রজানন্দ বুড়োশিব বলে।"

জয় ব্রজানন্দ হরে

জয়গুরু জয়গুরু জয়গুরু

ওঁশান্তি : ওঁশান্তি ওঁশান্তি

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

স্বামী রমেশানন্দ ঠাকুরের এই আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। "ঠাকুরের বেদবাণী ও আমার ঠাকুর প্রকাশের পূর্বে ঠাকুরকে জানাই, ঠাকুর তুমিই তো তোমার খোকনবাবাকে ক্ষমাপরানন্দে রূপান্তরিত করেছ। তুমিই সবই লিখছো ক্ষমার কলম ধরে। আশীর্বাদ করো ও গ্রন্থটি প্রকাশ করো। সকল ভক্তরা আবার নূতন করে তোমাকে বারে বারে দর্শন করুক। তোমার আশীর্বাদ অনুভব করুক। জয় ব্রজানন্দ হরি। জয় ব্রজানন্দ বুড়াশিব মহেশ্বর" জয় হোক তোমার ও ভক্তের।

ভজনাঞ্জলীর সিডির গান

তুমি জাগো

কথা সুর ঃ বীনামাঈ
রাগ ভৈরবী
তাল কাহারবা

তুমি জাগো, তুমি জাগো, তুমি জাগো—
আমার আরাধনার দেবতা তুমি জাগো।
জাগো নন্দদুলাল, তুমি যশোদা গোপাল,
ক্রিপুরানন্দন তুমি, যুগের অবতার, তুমি জাগো।
ব্রজসুন্দর গোপাল তুমি জাগো, তুমি জাগো,
তুমি জাগো গোপাল আমার।
জাগো, জাগো, জাগো গোপাল, জাগো ভক্ত প্রানে।
ভক্ত জাগালে জাগিবে তোমার নাম,
থাকিবে তোমার ধাম
তুমি জাগো, তুমি জাগো।
গোলক বিহারী তুমি, নদের নিমাই—
ভক্ত প্রাণনাথ তুমি ব্রজের কানাই
তুমি জাগো।

দরশন দাও গিরিধারী

কথা সুর ঃ বীনামাঈ

সুর মিশ্র

তাল কাহারবা

দরশন দাও গিরিধারী,

কৃষ্ণ মুরারী তুমি - ব্রজানন্দ হরি।

দরশন দাও গিরিধারী।

ভিখারিনী বীনা আছে একাকিনী,

কোথায় আছ কর তুমি, মোরে পূজারিনী।

দরশন দাও গিরিধারী।

না আছে আমার পূজার উপাচার,

না আছে হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার।

কি দিয়ে পূজিলে আমি, দেখা দিবে তুমি।

বল, বল, বল ওগো ব্রজানন্দ হরি।

দরশন দাও গিরিধারী।

ওহে মুরারী, গোবর্ধন ধারী,

মনপ্রাণ হরি, ওগো বংশীধারী।

কি দিয়ে পূজিলে আমি, দেখা দিবে তুমি।

বল, বল, বল ওগো ব্রজানন্দ হরি

দরশন দাও গিরিধারী।

বিশ্বব্যাপিয়া বিরাজিছো তুমি

কথা ও সুর ঃ বীনামাঈ

সুর মিশ্র

তাল দাদরা

বিশ্বব্যাপিয়া বিরাজিছো তুমি,
পাই না কেন গো খুঁজিয়া।
ওহে ব্রজানন্দ কোথায় রয়েছ,
দুটি আঁখি দ্যাখ মেলিয়া।
আমি পাই না কেন গো খুঁজিয়া,
বিশ্বব্যাপিয়া .....
অন্ধ নয়ন দ্যাখে না তো তোমায় —
কোথায় তুমি, কেউ বলে না তো আমায়,
আমি পূজিব চরণ এই নিবেদন,
দেখা দাও দয়া করিয়া।
আমি পাই না কেন গো খুঁজিয়া।
বিশ্বব্যাপিয়া .....
ডুবে যায় রবি, নাহি আর বেলা,
শেষ করো প্রভু এই নিঠুর খেলা।
আমি এনেছি কুসুম ভক্তি চন্দন,
ছিন্ন কর প্রভু মায়ারই বন্ধন।
নিয়ে চল মোরে তব পদতলে—
না নিলে যাব যে ভাসিয়া।
আমি পাই না কেন গো খুঁজিয়া,
বিশ্বব্যাপিয়া .....।

ওমা তারা ব্রহ্মময়ী

কথা ও সুর : বীনা মাঈ

রাগ : মালকোষ; তাল : তেওড়া

ওমা তারা ব্রহ্মময়ী, আমায় কর ব্রহ্মজ্ঞানী,
তোমার ধ্যানে বসায়ে মাগো আমায় কর
যোগিনী।
গেরুয়া ছাড়া কর সন্ন্যাসিনী,
মন বৈরাগী কর ভবতারিণী।
কখনও শ্যাম কখনো শ্যামা,
কখনও ব্রজানন্দ, তুমি মা উমা।
দূর্গে দূর্গতি নাশিনী, অসুর মর্দ্দিনী,
তুমি দুঃখ হারিনী।।
কোথায় আছ মা ভবতারা,
কেঁদে কেঁদে আমি হলাম সারা।
তবুও না পাই তোমার সাড়া,
ওগো মা ভবতারিণী।।

'গোলক ধামের নাইয়ারে'

কথা ও সুর : বীনা মাঈ

সুর : ভাটিয়ালী; তাল : কাহারবা

গোলক ধামের নাইয়ারে,
পার-লাগাও, পার-লাগাও নাইয়ারে।
তুমি আমার সাধন ভজন,
তুমি আমার প্রান।
আমার সর্ব কাজে সর্ব কর্ম্মে,
দাও গো এবার ত্রান, ওহে ভগবান।
ও নাইয়ারে - - - - -
নাই যে আমার কোন সম্বল,
নাই যে আমার প্রেমভক্তি।
শূন্য হাতে আছি পারে
নেও গো আমায় তুলে।
ও নাইয়ারে - - - - - - - - -

মিনতি আমার

কথা ও সুর : বীনা মাঈ

সুর : মিশ্র; তাল : কাহারবা

মিনতি আমার, চরণে তোমার,
রাখো ব্রজানন্দ মোরে।
দাও অন্ধ নয়ন মেলে, দিও জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে।
দরশন দাও প্রভু আমারে।
বড় আশা লয়ে নিয়েছিলাম তোমার স্মরণ,
পাব বলে যুগল চরণ।
দেখা যদি না দাও প্রভু,
কেন দিয়েছিলে আশা শুধু।
আমি আশায় বেঁধেছি বাসা,
হৃদয় কমলে শুধু যে নিরাশা
শূন্য হৃদয় কমল পূর্ণ কর প্রভু,
দরশন দিয়ে মোরে।

দীন দুনিয়ার মাঝিরে

কথা ও সুর : বীনা মাঈ

সুর : ভাটিয়ালী; তাল দাদরা

দীন দুনিয়ার মাঝিরে
আমার ভাঙ্গা তরী কেমন করে যাবে বেয়ে
ভব নদীর ওপারে।
কোথায় আছ মাঝি আমার —
জয় ব্রজানন্দ বলে —
ভাসাইলাম তরীখানি রে,
এবার তোমার তরী তুমি ধর,
নিয়ে চল ওপারে।
ভব নদীর মাঝিরে —

বুড়াশিবের ভজন

কথা ও সুর - দেবী মুখার্জী

সুর ঃ মিশ্র তাল কাহারবা

নিশি ভৈরবে প্রভু স্মরি গো তোমায়,
ভাল রেখো বুড়াশিব নমি গো তোমায়।
জয় বাবা ব্রজানন্দ নিত্য নিরঞ্জন,
তুমি বাবা বুড়াশিব অলখ নিরঞ্জন।

কৈলাসে তুমি বাবা ভোলা মহেশ্বর,
সকলেরই মাতাপিতা তুমি নীলেশ্বর।
দুহাত তুলিয়া নাচো বাবারই নামে
শঙ্খ উলুধ্বনি দাও বুড়াশিব নামে।
জয় বাবা ব্রজানন্দ নিত্য নিরঞ্জন,
ব্রজানন্দ বুড়াশিব অলখ নিরঞ্জন।

শান্ত শীতল রেখো ওগো প্রাণনাথ
সুস্থ সবল রেখো ওগো ব্রজনাথ।
আরতি করি তোমায় প্রদীপ ও ধূপে,
সুবাস ছড়ায়ে বাবা রাখিও সুখে।
জয় বাবা ব্রজানন্দ নিত্য নিরঞ্জন,
ব্রজানন্দ বুড়াশিব অলখ নিরঞ্জন।

করতালি দিয়ে নাচো বুড়াশিব নামে,
ভক্ত হৃদয় ভরে ওঠে সেই আনন্দেতে।
জয় বাবা ব্রজানন্দ নিত্য নিরঞ্জন,
ব্রজানন্দ বুড়াশিব অলখ নিরঞ্জন।

ফুল তুলসী দাও সবে বাবার চরণে
হৃদয় তিলক পর সব বুড়াশিব নামে।
জয় বাবা ব্রজানন্দ নিত্য নিরঞ্জন,
ব্রজানন্দ বুড়াশিব অলখ নিরঞ্জন।

কে আছ বন্ধু

কথা ও সুর ঃ দেবী মুখার্জী

সুর ঃ মিশ্র, তাল দাদরা

কে আছ বন্ধু নিয়ে চল যেথায়
গুপ্ত বৃন্দাবন
সেথায় ব্রজরাজ ব্রজানন্দ আমার
থাকেন সর্বক্ষণ
গুপ্ত বৃন্দাবন।
সেথায় দেউন্দি নামে আছে ব্রজধাম
যেথায় ব্রজনন্দ নামে
পাখি করে গান।
বাতাস বিলায় নামেরই গন্ধ
হরে ব্রজানন্দ নাম
হরে ব্রজানন্দ নাম
যেথায় গুপ্ত বৃন্দাবন।
সেথায় আছে শ্রীগুরুর চরণ
যে চরণে হয় পাপ বিমোচন।
(ঠাকুর) তোমারই নামে তোমারই গানে
হরে ব্রজানন্দ হরে
হরে ব্রজানন্দ হরে,
গৌর হরি বাসুদেব
রাম নারায়ণ হরে।
দয়াল গুরুর দয়ার তরে
ভক্তগণের অশ্রু ঝড়ে।
সেথা বুড়াশিব ব্রজানন্দ বলে
আকুল করে মন
গুপ্ত বৃন্দাবন, দেউন্দি গুপ্ত বৃন্দাবন।।

পার কর মোরে

কথা ও সুর ঃ দেবী মুখার্জী

সুর ঃ বাউল, তাল দাদরা

গুরু তুমি পার কর মোরে,
এই ভব সংসারে মন লাগে না
মন কেমন করে।
দয়াল তোমারই তরে,
গুরু তোমারই তরে
দয়াল বিনে ভবের মাঝে.....,
আপন বলে কেহ নাই রে.....,
তাই বলি মন থাক সর্বক্ষণ
ঐ রাঙা চরণ ধরে
ব্যাকুলভাবে ডাকলে তাঁরে দয়াল গুরু
না এসে আর কি থাকতে পারে।
বল ব্রজানন্দ নাম
হরে পূর্ণ মনস্কাম।
এই নাম বিনে যে কেউ কখনো
গুরুর দেখা পাবে না।

শম্ভু মহেশ্বর

কথা ও সুর ঃ দেবী মুখার্জী

সুর ঃ মিশ্র, তাল দাদরা

হে শিব শম্ভু, মহেশ্বর
কৃপা কর বাবা কৃপা কর
করুণা কর বাব করুণা কর।
হর হর মহাদেব, হর হর বুড়াশিব
হর হর মহাদেব,
বুড়াশিব রূপে ঢাকাতে উদয়,
তোমার ইচ্ছাতে হয় সৃষ্টিস্থিতি লয়।
ভক্তের লাগিয়া তুমি সেজেছো কাঙাল
অপরূপ লীলা তব হে দীনদয়াল।
হর হর মহাদেব
হর হর বুড়াশিব
হর হর মহাদেব
হর হর বোম বোম
একই দেহে বুড়াশিব শ্রীরাধাগোবিন্দ
শতরূপে বিরাজিছ হয়ে ব্রজানন্দ।
তুমি অনাদির আদি, তুমি সর্বশক্তিমান
ওহে বুড়াশিব তুমি ভক্তেরই প্রাণ।

বিঃদ্রঃ- এছাড়াও ঠাকুরের আরও কয়েকটি গানের একসাথে সম্প্রতি একটি সিডি প্রকাশিত হইবে। ভজনপিপাসু ভক্তগণ **8335877150** এই নম্বরে যোগাযোগ করে সিডিটি সংগ্রহ করতে পারবেন।

আয় সবে মিলে

প্রমীলা মাঈ

আয় সবে মিলে ব্রজানন্দ বলে
দু'বাহু তুলে নাচি গাই,
ব্রজানন্দ মোর ব্রজের ও কানাই
দেখবি যদি সবে আয় ছুটে ভাই।।
লইব স্মরণ রাতুল চরণে কৃপা
যদি করেন ব্রজের কানাই,
গোলক বিহারী ব্রজানন্দ হরি
হয়েছেন ভিখারী ডোর কোপিন পরী।।
পাপী উদ্ধারিভে প্রেম বিতাড়িতে
কাঙালের সাজে সেজেছেন কানাই,
দুহাত তুলিয়া দিতেছেন অভয়
তথাপি ও মোরা হই না নির্ভয়।।
ভক্ত বিশ্বাস হীন পাতকী আমরা
মায়া মোহে কেবল নাচি গাই।।
রাতুল চরণে প্রার্থনা জানাই ভক্তি
বিশ্বাস টুকু দিও হে কানাই
তব শ্রীচরণ তরী ভরসা করি
ভক্তি বিশ্বাস যেন ফিরিয়া পাই।

কবে গো কান্দিব আমি

কথা ও সুর - সুনীল বিশ্বাস

ব্রজানন্দ বলিয়া আকুল হইয়া
কবেগো কান্দির আমি।
আমার যদি থাকে লেখা হইবেক দেখা
প্রভু শ্রীচরণ জানি। ঐ
তুমি অনাথের নাথ ওহে প্রাণনাথ
তুমি হে অন্তর্জামী। ঐ
তোমায় কি দিয়ে পূজিব কি বলে ডাকিব
রিক্তনিঋস্ব আমি।। ঐ

শৈশবে আমার ঠাকুর ও দীক্ষা

ক্ষমাপরানন্দ সরস্বতী

জয় ব্রজানন্দ ঠাকুরের নামে বা বিষয়ে যা লিখলাম তা সবই ঠাকুর লিখিয়েছেন এবং লেখাচ্ছেন এবং প্রত্যেকটা ঘটনা সত্য।

বাবা-মার সঙ্গে শৈশবে বুড়াশিববাড়ি ঢাকাতে যাই তখন বিকেল এর সময় যতটা মনে হচ্ছে। ঠাকুর বুড়াশিবের মন্দিরের পাশে ফুলের বাগানে হাঁটছিলেন। বাবা-মা প্রণাম করলেন। আমি তখন হাঁটতে পারি, দৌড়তে গেলে প্রায় পড়ে যাই — মার মুখে শোনা। আমার ফুল চাই, ঠাকুর একদিন আগের ফুলগুলি ডাঁটি থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে আমার দিকে ছুঁড়ছিলেন। দুই-একটা ধরা ছাড়া বাকি সব মাটিতে পড়ছে। মা দৌঁড়ে আমাকে ধরতে আসছেন পড়ে যাচ্ছি বলে, ঠাকুর বললেন, "ওরে একা উঠতে দাও"। মায়ের মুখে এও শুনেছি যে আমি যখন মাতৃগর্ভে মা দোতলায় সাঁখারীবাজারে থাকতেন। বাঁদরের তাড়া খেয়ে সিঁড়ি দিয়ে পড়ে যান মা। ঠাকুরের কাছে বাবা নিয়ে এসেছিলেন মাকে। ঠাকুর সব শুনে বলেছিলেন, "আমি দৃষ্টি রাখলাম। ওর দায়িত্ব আমার অর্থাৎ কিনা মাতৃগর্ভে থাকাকালীনই ঠাকুরের দৃষ্টির মধ্যে আমি রয়েছি। "জয় গুরু"। জয় ব্রজানন্দ, ভাবলেও আশ্চর্য হই। তারপর জন্মাবার পর অন্নপ্রাশন ঠাকুর দিয়েছেন। হাতে খড়ি ঠাকুরই দিয়েছেন এক সরস্বতী পূজার দিন। আবার আর এক সরস্বতী পূজার দিন শৈশবেই দীক্ষা প্রদান করলে 'কৃষ্ণ' মন্ত্রে। দীক্ষা দিনের কথা এখনও ভুলিনি আর যেন না ভুলি। স্থান কলকাতা বাঙ্গুর 'গুরুধাম'। দোতলায় ছিল ছোট্ট একটা ঘর বাঁ দিকে ঠাকুরের শয়ন ঘর আর ডানদিকে একটু নীচে একটা ঘর, মাইদের থাকার জন্য। ধামে ছিলেন বলানন্দ মহারাজ। হরিহরানন্দ মহারাজ, রান্নার একজন ঠাকুরভাই, চারুমাই ও রমণীমোহন দাস অর্থাৎ রমণীকাকু, যিনি ঠাকুরের সিংহাসনের পাশেই থাকতেন এবং ঠাকুরের হয়ে চিঠি লিখতেন। দীক্ষা যাঁরা নিতেন, তাঁদের ঠাকুরের দীক্ষা মন্ত্র ছোট্ট কাগজে লিখে দিতেন। আমার তো ভীষণ আনন্দ আমাকে ঠাকুর দীক্ষা দেবেন, আমিও সবার সঙ্গে 'জয় গুরু' বলতে পারবো, পারবো জয় ব্রজানন্দ বলতে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল গুরুভাই হব। কী আনন্দ, আমাদের অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না, ঠাকুরের জন্য গুরুবরণ বস্ত্রও আমার

বাবা-মা দিতে পারেননি ঠাকুরকে কারণ ঠিক সরস্বতী পূজার আগের দিন মা আর অ

বাঙ্গুরে গিয়েছিলাম। ঠাকুর মাকে বললেন, "মাই ওরে (খোকন বাবারে) কাইল দীক্ষা দিমু। সকাল সকাল স্নান করাইয়া নিয়া আইসো"। মা যেন মুশকিলে পরলেন। আমরা থাকি শিয়ালদহের মুসলমান পাড়াতে একটা বস্তি বাড়িতে, বাবার বাইন্ডিংখানা সামনের বাড়িতে। নাম ব্রজানন্দ বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস। বাবাকে মা বললেন, খোকনরে ঠাকুর কালকে দীক্ষা দিবো, কিছু কিনতে হইবো। থাক্। গোবিন্দভোগ চাল, মুগডাল, সরিষারতৈল, ঘি, আটা, সুজি, আলু, বেগুন আর কিছু সবজি দিয়ে গুরুদেবের জন্য নৈবিদ্য সাজানো হলো। একটা কাঁসার থালা, বাটী ও গ্লাসও নেওয়া হল, আমি, মা ও বাবা সকাল সকাল স্নান করে গুরুধামে গেলাম। টাকা পয়সার টানাটানি ছিল বুঝতে পারলাম যখন বাসে আমার টিকিট বাবা কাটলেন না, কন্ডাক্টরকে বললেন, ওতো ছোট, কন্ডাক্টর স্বহৃদয় ভদ্রলোক রাজি হলেন। ঠাকুরও স্নান সেরে মাথায় একটা কি সুন্দর ক্রিম লাগালেন, বেশ ভাল গন্ধ। তারপর মাথায় যেকটা চুল ছিল ব্রাশ দিয়ে পরিপাটি করে সাজিয়ে নিলেন। ভগবানের মাথা সাদা একেবারে, এবার আমার আবদার হল ঠাকুরের কাছে, আমায় একটু দাও মাথায় মাখবো। কী লজ্জ আমার বাবা-মার, ঠাকুর রমণীকাকুকে বললেন যে ওরে একটু মাথায় দাও ও সাজতে চায়। আজ বুঝতে পারছি সেদিনের সেই কথা যে আমার সর্ব্বঅঙ্গ ঠাকুর ব্রজানন্দের নামে নিজেকে সাজাতে চাই। চাই যে ব্রজানন্দের পাদপদ্ম হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করতে আমি সেই সোহহমে মিলতে চাই। আমি তোমার সখা তুমি আমার সখা এই অনুভুতি উপলব্ধির জন্যই যে ঠাকুর আমার মধ্যে পরিবর্তন এনেছেন আমাকে সাজিয়েছেন ব্রহ্মচর্য-এর বেশে, জানি না দেহ ও প্রাণে গৈরিক কবে করবেন। ব্রজের আনন্দে নিজেকে যে মিশিয়ে দিতে চাই হে প্রাণসখা মোর, তোমাতে আমাকে মিলিয়ে দাও। তুমি সবই আমাকে করাচ্ছো এই বিশ্বাস ও আস্থা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যেন আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। সবই আমার জগৎগুরু ব্রজানন্দ করাচ্ছেন তাঁরই ইচ্ছায়।

দীক্ষা দিতে ঠাকুর বসেছিলেন খাটে আর আমি মাটিতে আসনের উপর, ঠাকুর যেন কিছুক্ষণ এদিক ওদিক দেখছিলেন, তারপর বলানন্দ মহারাজকে ডাকলেন "বলানন্দ ছোট একটা ধুতি দিয়া যাও"। আমার পরনে ছিল হাফ প্যান্ট, এই বার বলানন্দমহারাজ ধুতি দিয়ে গেলেন, ঠাকুর আমাকে বললেন "উঠো উঠো এইটা

পরতে হইবো" প্যান্টটা খুলে দিলেন। আমি ঠাকুরের সামনে লজ্জাহীন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, এবার ঠাকুর নিজের হাতে ওই ধুতিটা পরিয়ে দিলেন। বললেন, "এই বার ঠিক লাগতাছে।" জামাটাও খুলিয়ে দিলেন, গেঞ্জি ছিল তার উপর ধুতিটাকে দিয়ে শরীরটা ভালভাবে ঢেকে দিলেন। বললেন, "এই তো গুরুর চ্যালা।" ঠাকুর বলতে শুরু করলেন, "আচমনী করো তিনবার। কোশাকুশী থেকে জল নাও ও ওঁ শান্তি বলে সেবন করো, এবার সমস্ত দেহকে শুদ্ধ ও সমস্ত ইন্দ্রিয়কে জাগরণ করো - এই ভাবে মুখ, নাক, চক্ষু, কানের দু'পাশে ও নাভি, হৃদয়, মস্তিষ্ক ও মাথার উপর জয়গুরু বলিয়া জল ছিটাইয়া দাও। এইভাবে দেহ ও ইন্দ্রিয়কে শুদ্ধ করিবা। তোমাকে আমি কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা দিমু। তুমিও আজ থেকে কৃষ্ণ হইয়া যাইবা।" বুঝি নি সেদিন। আমার চক্ষুর দিকে দেখ। বল মন্ত্রটা। কী বলতে হবে ঠাকুর এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তারপর আমার কানে ওই কৃষ্ণ মন্ত্র বলে ফুঁ দিলেন আবার একবার ঘুরে বসলেন। এবার ঠাকুর পদযুগল আমার মাথায়, হৃদয়ে, কাঁধে ছোয়াচ্ছেন ও বলছেন, "তোমার সমস্ত অঙ্গে কৃষ্ণ বাস করুক"। থালার ফুল তুলসী বেলপাতা ঠাকুরের চরণে দিতে শুরু করলাম ঠাকুর যে মন্ত্র বলছেন সে মন্ত্রে। আজও ভুলিনি। মাঝে মধ্যে একটু চঞ্চল হয়ে উঠে পরেছিলাম, ঠাকুর একবার ধমক একবার আবার আম দিয়ে শান্ত করেন আমাকে, কারণ ওই খাটটার নিচে বেশ ফল আছে, লোভ হচ্ছিল। ঠাকুর দ্বিতীয় বার বুঝে নিজেই একটা লাঠি দিয়ে খাটের নিচের থেকে একটা আম বের করে আমাকে দিলেন। অনেকক্ষণ সময় হয়ে গেছে, দরজাও বন্ধ। এবার ঠাকুর বললেন, "তোর দায়িত্ব আমি নিলাম, তুই আমাকে কৃষ্ণ বলে ভাববি। তুই আমার সখা", সেদিন কিছুই বুঝিনি এর অর্থ আজ সেই অর্থগুলিকে বোঝার চেষ্টা করছি শুধু। তারপর বললেন "আমার এই নাম। ইষ্ট নাম রোজ করবি স্নান করে তারপর করবি নিত্যং, পূর্ণ্যং ... আমার রূপ সম্পূর্ণ প্রকাশ পাবে তোর মধ্যে। তারপর হরে ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে, গৌর হরি বাসুদেব, রাম নারায়ণ হরে, এই তারকব্রহ্মনাম"।

এবার আমি সত্যই অস্থির হয়ে উঠেছি, ঠাকুর বললেন কৃষ্ণ মন্ত্রটা রমণীকাকুর থেকে নিয়ে যাবি মুখস্থ করবি। দীক্ষা দেবার সময়তেই প্রায় লেখাপড়ার মতন ঠাকুর মুখস্থ করিয়েছেন দীক্ষার মন্ত্রটা। এর মধ্যে ঠাকুরের চরণ ধরে আছি এক হাতে আর একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে আর একটা ফল নেবার চেষ্টা করছি। এবার ঠাকুর ধমক আর ভালবাসা স্নেহ মিশিয়ে বললেন "তোকে অনেক ফল দেব" ডাকলেন

বলানন্দকে দরজা খুলে গেল বলানন্দ মহারাজ ও মা বাবা সকলেই ঘরে ঢুকে এসেছেন। মা কাঁদছেন, বলছেন ঠাকুর শেষে কিনা তোমার কাপড় পরাইয়া দিলা। রমণীকাকু বললেন, বাবা তো ভালই করছে বীণা, ওকে তো ছোট সখা কইরা নিছে তাইতো, কাইন্দো না। এবার ঠাকুর বললেন, "আমি যে ওরে কোল এর থিকাই ফেইকা আনতাছি। ওতো আমার সখা। বাবা কাঁদছেন, শুধু বললেন, বাবা খোকনের দায়িত্ব আজথিকা সব তোমার। ঠাকুরের উত্তর, বাবা ওর দায়িত্ব তো জন্মের আগের থিকা আমি নিছি। মনে পড়ে আমার, আমি RG. KAR Hospital-এ ভর্ত্তি ঠাকুর ঢাকা রওনা হবেন, আমার সম্বন্ধে ডঃ বাগচীকে বলে গেছেন যেন আমাকে Hospital-এ এসে দেখেন, ডাক্তার বাবু আমাকে Special ward-এ দেখে গিয়েছিলেন। আমি ডঃ শৈবাল সেনের তত্ত্বাবধানে ভর্তি হই। ঠাকুর ঢাকা থেকে চিঠি মারফৎ জেনেছেন যে তার ছোট্ট খোকন বাবা কেমন আছে।

আমার বেশ ভালোই লাগে। আমিও ঠাকুরের দীক্ষিত সবাইকে পারলে বলি "জয় গুরু, জয় ব্রজানন্দ"। আমি ছোট বলে সকলে স্নেহ করতেন ও ভালবাসতেন এই দুটো কথা বলার পর আনন্দও পেতেন। বাবাকে বলতেন রামকৃষ্ণদা আপনার এই ছেলে বেশ ভাল এখনই "জয় গুরু" জয় ব্রজানন্দও বলে। বাবা বলতেন ওটা ওর অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে। তখন বুঝতাম না এই দুটো শব্দের সঠিক অর্থ, বড়রা বলতো তাই আমিও বলতাম। আজও কি বুঝতে পেরেছি সঠিক অর্থে প্রাণের সখা আমার গুরুকে। সত্যই কি ব্রজের আনন্দকে অর্থাৎ কৃষ্ণকে জয় করতে পেরেছি। জানিনা কবে ঠাকুর সেই আশীর্বাদ করবেন যে আমি সোহহং হয়ে যাব। মিলেমিশে ভগবৎ প্রেমে শুধু নিজেকে ডুব দেওয়াবো ব্রজানন্দ ভবসমুদ্রে।

মাঝেমাঝে ঠাকুরকে বলি, হে প্রভু কেন আমার এ জীবনে এমন করলে, সংসারী করেও সংসার থেকে দূরে রাখলে, অবশেষে সব ছাড়িয়ে তোমার ইচ্ছাতেই তোমার কর্মে আমাকে নিয়োজিত করলে। ভেবে আনন্দ পাই ঠাকুর আমাকে তোমার নিত্য সেবা কর্মে নিয়োগ করেছো বলেই। তুমি তোমার মতন ক্ষমাপরানন্দকে তৈরী করে নাও। জয় গুরু ব্রজানন্দ জয় গুরু বুড়াশিব।

১৯৭৫ ডিসেম্বর আমি ভূপালে

১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাস, আমি ভূপাল BHEL বারখেরা টাউনশিপে থাকি। BHEL-এ চাকরি করি Q.C-এ। বেশকিছু মানুষের কথা মতন না চলার জন্য আমার শত্রুতা ক্রমশ বেড়েই চলে। ঠাকুরকে আমি প্রায়ই জানাই বৃন্দাবন লাদ্ধারামসিন্ধ ধর্মশালার ঠিকানায়। আমি প্রায় ক্লান্ত। ঠিক করে ফেললাম যে আমি আর আমার ভগবান ব্রজানন্দ-এর নামে থাকবো না কারণ তিনি যদি সত্যই সর্বশক্তিমান হন তবে আমার দুঃখ কেন নিবারণ করছেন না। আমার জীবনে ধর্ম পরিবর্তন করার একটা দিশা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকাডাকি করছে। আমার বাবাকে (কলকাতায়) জানালাম যে আমি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করব কারণ বিদেশ যাবার সুযোগ পাবো। তাই বাবার নামটা মাঝে ব্যবহার করতে হবে। যেমন আমার নামছিল মৃণাল — M — বাবার নাম রামকৃষ্ণ R— পদবি— PAUL অর্থাৎ খ্রিস্ট ধর্ম অনুযায়ী নাম হবে M R PAUL, বাবা চিঠির কোনও উত্তর দিলেন না।

জানালাম মাকে (বীণামাঈ) ও ঠাকুরকে।

ঠাকুরকে জানালাম, শৈশবে তোমার থেকে আমি দীক্ষা নিয়েছি। আজ অবধি কিছু চাইনি, শুধু তুমি বলেছ "বাবা সৎ হয়ে থাকবি।" কথা দিয়েছিলাম। এখানকার কিছু মানুষ সৎ থাকলে মেরে ফেলবে, সব জানানোর পরও তুমি কিছুই করছো না। তবে তোমার আর কোন শক্তি নেই। যিনি শক্তিহীন, আমি তার আর নই। ইতিমধ্যেই বারখেড়ার চার্চের ফাদার যোশেফ ফারনানডেজ-এর কাছে প্রতিদিনই যাই, তিনি প্রভু যীশুর কাহিনী বলেন আমার ভাল লাগে। মনে হয়, হে ভগবান ব্রজানন্দ, তোমার কি এমন শক্তি নেই যে তুমি প্রভু যীশু হতে পারো। মায়ের চিঠি পেলাম, মা জানালেন যে ঠাকুর একবারের জন্য হলেও বৃন্দাবন দর্শনের আদেশ দিয়েছেন। ভাবছি দেখি ঠাকুর

তোমার ইচ্ছা শক্তি। রোজই বারখেড়ার কালী মন্দিরে সন্ধ্যায় আরতির সময়ে যাই, ৬ ডিসেম্বর ১৯৭৫ সাল, সন্ধ্যা আরতি শেষ হয়েছে। সাইকেলে চড়ে একা যাতায়াত করি। সকালে Duty তে যাই স্কুটারে করে, স্কুটার চালায় মহালিঙ্গম ফোরম্যান, আমাদের দুজনেরই একসঙ্গে ডিউটির সময়স্মরণি হত। Morning ডিউটি চলছে আমার।

সন্ধ্যা আরতি শেষ করে সাইকেল-এ উঠতে যাই, এমন সময় মন্দিরের Watchman বাহাদুর বললো, সাহেব সাইকেলে সাপ জড়িয়ে আছে। টর্চ নিয়ে আসলে দেখলাম সবাই, এক বিষধর সাপ। কী করব ভাবছি। সবাই প্রায় হতভম্ব। ২৫ ডিসেম্বর খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করবো। সকলেই বলছে মৃণাল এখন কোন ধর্মের ঠাকুরকে তুমি ডাকবে? মনে গভীরতার বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে এল, হে ঠাকুর, তুমি কিছু একটা করো। একটু পড়েই দেখা গেল সাপটি নামার চেষ্টা করছে কিন্তু পাড়ছে না। বাহাদুর একটা লাঠি দিয়ে ওটাকে মাটিতে নামার সাহায্য করলো। আমার মনে যেন এইবার সাহস ফিরে এল। একটু এগিয়ে গেলাম টর্চ এর আলো ফেলতেই সাপটা নিমেষের মধ্যেই চলে গেল। বিশ্বাস পুনরায় হৃদয়ে জাগ্রত হল, বুঝলাম কিছু একটা করেছেন ঠাকুর আমার উপর। তাই বৃন্দাবন যাব বলে স্থির করলাম। জয় ব্রজানন্দ।

পূণ্যতীর্থ বৃন্দাবন দর্শন

১১ ডিসেম্বর ১৯৭৫ সাল খুব বৃষ্টি হল হঠাৎ সকাল বেলায় এক অলৌকিক দর্শন ঠাকুরের। বলে গেলেন, "বৃন্দাবনে আয়" সেই রাতেই ঝাঁসি-দিল্লীগামী ট্রেনে Military কামরায় চড়ে মথুরা পৌছানোর পর বৃন্দাবনে সরকারি বাসে চড়ে (৩টাকা বাস ভাড়া) যাই। গিয়ে আবিষ্কার করলাম যে, ঠাকুর যেই ধর্মশালায় উঠেছেন তার ঠিকানাটাই নিয়ে আসিনি। এবার ঠাকুরকে স্মরণ করলাম, কী করে ওই ধর্মশালায় পৌছাবো তাই ঠাকুরকে ডাকছি, ঠাকুর তুমি যদি ধরা না দাও কী করে পাবো তোমাকে। বাসস্ট্যান্ড থেকে রিকশা নিলাম, রিকশাওয়ালা আমাকে বললো, "ভাই এ বৃন্দাবন মে সবই সাধু হ্যায়, সব মন্দির হ্যায়, ধর্মশালা ভী হ্যায়" ঠাকুরের নাম আমি পুনরায় জপ করতে শুরু করলাম। সকাল ৭টা ১৫মিনিট ১২ ডিসেম্বর। হঠাৎ একটা ধর্মশালার উপর থেকে ঠাকুর ডাকছেন "খোকন বাবা এখানে এখানে"। ঠাকুরের নাম জপ করে বলছিলাম ঠাকুর তুমি কোনখানে? ঠাকুর এতক্ষণে স্বয়ং উত্তর দিলেন দোতলা বাড়ির বারান্দা থেকে 'এখানে'। রিকশা ভাড়া ৫ টাকা দিলাম, ঠিক দুগুণ। ২.৫০ টাকায় সেই সময়ে বাসস্ট্যান্ড থেকে লাদ্ধারাম ধর্মশালার ভাড়া ছিল।

ঠাকুরকে গিয়ে প্রণাম করলাম আর বললাম যে তোমার বাঁ পাটা দেখাও। ঠাকুর বললেন, "দেখ বীণামাই এখনও খোকন বাবা বিশ্বাস করতেই পারতাছে না যে ওরে আমিই নিয়া আইছি।" সামনে ছিলেন তরণী জ্যাঠামশায়, সূর্য কাকু, ধীরানন্দ মহারাজ, এখনকার তাপসীমাই তখন রেখাদি বলেই পরিচিত ছিলেন। আর বীণামাই।

তরণী জ্যাঠামশাই ঠাকুরের ধবনি দিলেন, আমি শুধু বললাম 'সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রী ব্রজানন্দ জীউকি'। ঠাকুর বললেন, "কি বিশ্বাস হইল! বাবা আমি কি আর যেই সেই ভগবান, সর্বশক্তিমান স্বীকার করলি তবে, ব্রজানন্দ ছাইড়া কোথায় যাবি, আমি যে তোর মনে, তোর প্রাণে, তোরে সেই ছোট্ট বেলায় আমি দীক্ষা কি আর এমনি এমনি দিছি, বাবা অনেক কাজ আছে তোর"। তরণী জ্যাঠামশাই, সূর্য কাকু সবাই বললো, বাবা কালকে যে তুমি বলছিলে এক ভক্ত আসবে তার পর যমুনা ও সব দর্শনে বের হবে সে কি এই বীণাদির ছেলে। ঠাকুর বললেন, 'হ্যাঁ। তবে আরও কয়েকজন আসবে'।

তারপরে ঠাকুরকে আমি ভূপালের জর্দা ও ৫৫৫ সিগারেট প্যাকেট ও ছোট একটা বটুয়া দিয়ে বললাম জর্দা বটুয়া খুব প্রসিদ্ধ ভূপালের, ঠাকুর আর্শীবাদ করলেন "জয় জয়, বেশ ভালো," জর্দার ঘ্রাণ নিলেন আর বললেন, "জয় জয় বেশ ভালো,"

তারপর প্রসাদ দিলেন আর বললেন, বাবা কাজ আছে, তোমার এখানে। তরণী জ্যাঠামশাই, সূর্য কাকু জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা ওকে কোন কাজে এনেছেন? প্রসাদ নিয়ে হাত ধুয়ে আসলাম, ঠাকুর, আমি, তরণী জ্যাঠামশাই, সূর্য কাকু, ধীরানন্দ মহারাজ, মা ও রেখামাই সকলেই ব্যস্ত, কেহ রান্না ঘরে সকালের বাল্যভোগে বাকিরা অন্য কাজে। ঠাকুরের আসন ও শয়ন চৌকি একই।

আমরা সকলেই নীচে বসে, ঠাকুর বললেন আমার উদ্দেশ্যে "বাবা এবার মন্দিরের জন্য জায়গা দেখ।" আমি ঠাকুরকে বললাম, 'তুমিই তো গোবিন্দ তোমার ইচ্ছাই তো সবকিছুর উর্ধ্বে, ঠাকুর বললেন, "না বাবা রাধারানির ইচ্ছা না হইলে যে বৃন্দাবনে গোবিন্দেরও স্থান নাই।" তরণী জ্যাঠামশাই জয় ধবনি দিলেন। "গোবিন্দরূপী ভগবান ব্রজানন্দ জীউর জয়।" বাল্যভোগ দিলেন ধীরানন্দ মহারাজ, ইতিমধ্যে হাতমুখ ধুয়ে এলাম। বাল্যভোগ শেষ হল, ঠাকুর আমাকে প্রথম প্রসাদটি দিলেন ও বললেন, "নেও বাবা, আর বাইরাইয়া পর, মন্দিরের জায়গা খোঁজ।" আমি প্রসাদ নিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে বললাম, তুমি আমার সঙ্গে চলো ঠাকুর। সবাই বললেন, ঠাকুর তো তোমাকে বলেছেন। তুমি আবার ঠাকুরকে বলছো সঙ্গে যেতে, ঠাকুর এইবার সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, "ওরে তোমরা বুঝতে পারো নাই, এ গুরুশিষ্যের কথা, তোমাদের এর মধ্যে থাকতে হবে না, খোকন বাবা আমি তোর সঙ্গে চললাম যা যা।" আমার যে কী আনন্দ! ঠাকুর আমাকে একটা দায়িত্ব দিয়েছেন।

সকল ভক্তপ্রাণ গুরুভাই-বোনেদের জানাই, আমি তখন খুব ধূমপান করতাম ভাবলাম যাক, ঠাকুরের থেকে ছাড়া পেলাম। লাদ্ধারামসিন্ধ ধর্মশালা পার হয়েই সিগারেট জ্বালালাম আর ভাবছি ঠাকুর তোমার কাজ তুমি করিয়ে নিও। সোজা বৃন্দাবন বাসস্ট্যান্ডে কারণ সিগারেটের প্যাকেট কিনতে হবে আগে। সময় প্রায় ১০টা, আগের রাতের জামা কাপড়েই, বৃন্দাবন বাসস্ট্যান্ডে একটা বড় রকম পান বিড়ি সিগারেটের দোকান আছে সাথে চাও বিক্রি হয়। নাম তার মিশ্রজি, গিয়ে জিগ্যেস করলাম, আচ্ছা এখানে একটা বাড়ি আমার গুরুজি কিনতে চান মন্দিরের জন্য। কাছাকাছি রাস্তার উপরে, আপনার সন্ধানে এরকম কি কিছু আছে বা দালাল কি পাওয়া যাবে? সিগারেটের প্যাকেট নিয়েছি একটা ধরাবো। দোকানি একজনকে ডাকলেন, 'ও রাধে, বাবুলালজি ও রাধে।' একজন বয়স্ক কালো মতো লোক, একটা গামছা পরনে খালি গা, রোগা ছিপছিপে, গালে দাড়ি না কাটা অবস্থায় ফিরে এল, পানদোকানির সঙ্গে বৃন্দাবনের

ভাষায় কথা হল বুঝতে পারলাম সবটাই যে ওই বাড়িটা বিক্রি করবে তবে পঞ্চাশ হাজার টাকার কমে নয়, বউ রাজি নয় কয়লার ব্যবসাটা স্থানান্তরিত করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। পানদোকানি বললেন, ওনাকে তুমি দেখিয়ে দেও না, ও বললো যে এখন ওর শ্যালক আছে, চলে গেলে জানাবে।

আমি জিগ্যেস করলাম যে বাড়িটা কোথায়, বাবুলালজি ইতিমধ্যে চলে গেছেন পান দোকানি বললেন যে উল্টোদিকটা দেখিয়ে ওই পার দিয়ে গেলেই দেখবে বিজলিঘর আছে সাদামতো বাড়ি দোতলা। ওটা শেষ হলেই দেখবে একটা গলি। ঠিক সোজাসুজি বাড়িটাই ওর। পানদোকানি আমাকে বললো, কাল আমি যেন একবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, আমি সিগারেটের পয়সা মিটিয়ে ফিরে আসি ঠাকুরের কাছে।

ঠাকুরের স্নান হয়ে গিয়েছে, অন্তরের ঠাকুর জিজ্ঞাসা না করেই অন্তর্যামী বললেন, "কাউলকা আবার যাইও"। আমি মাথা নাড়ালাম। মনে মনে বললাম "জয় ব্রজানন্দ"।

দুপুরের ভোগ, মোট ভক্ত সংখ্যা ৭ মহারাজকে নিয়ে, ভগবান - ১জন মোট - ৮জন। যথা

প্রথম — স্বয়ং শ্রী গোবিন্দ স্বরূপ ভগবান ব্রজানন্দ

দ্বিতীয় — মোহান্ত ধীরানন্দ মহারাজ

তৃতীয় — দুই সখী, বীণামাই ও রেখামাই

চতুর্থ — তিন সখা - তরণীকান্ত বসু মহাশয়

সূর্যকান্ত দাস মহাশয়

ও আমি মৃণাল

এইভাবে দুদিন চলল। লাদ্ধারাম ধর্মশালায় ঠাকুর দোতলায় ঘর নিয়েছিলেন তিনটি ঘর, ১টা রান্না ঘর, দুটো বাথরুম, দুটো পায়খানা।

তারিখ - ১৩/১২/৭৫

সকালে ঠাকুর বললেন "কী রে "আজ যাবি না"। আমি শুধু বলি তোমার হুকুম ঠাকুর বললেন "সঙ্গে আছি"— এ যেন মেঘ না চাইতেই জল।

বাল্যভোগ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাসস্ট্যান্ডের উদ্দেশে, আসলে বুঝলাম বাবুলালই ওই বাড়িটার মালিক। তবে অবশেষে বাড়িটা দেখালেন ৭ দিন পর, তার

শ্যামকুণ্ড চলে যাবার পর। বাবুলালের ছেলেরা ছোট তখন, এখন বিজয় প্রায় ৪০-৪৫ বছরের। ঠাকুরকে জানালাম। ঠাকুর যেন সবই করাচ্ছেন। এর মধ্যে তরণী জ্যাঠামশায় বললেন, "কী রে দেখে এলি কেমন? বললি না তো!"

রাত্রে ঠাকুরের নৈশ ভোগের সময় ঠাকুরকে যেন খুবই চঞ্চল দেখাচ্ছে। শুধু বললেন, "হে রাধারানি তুমি কৃপা করো।" একথা ঠাকুর তার পত্রের মাধ্যমেও জানিয়েছেন ভক্তদের এরকম পত্র আছে অমৃতসাগরে পৃঃ নং ২৬৬ ভক্ত উষারঞ্জনবাবুকে ব্যক্ত করেছেন "রাধারানি যে কি লীলা আমার সাথে আরম্ভ করিয়াছেন আজও একটা কিছু করিতে পারিলাম না"।

সেবার পর ঠাকুরকে আমি তার পদযুগল পরিচর্যা করতে শুরু করলাম ঠাকুর আমাকে বললেন, "খোকন বাবা তুই ঠিক খুঁজে বের কর, গুরুকে শুধু এভাবে সেবা করলেই হবে না, গুরুর জন্য গুরুর ধাম খুঁজতে হবেই তোকে"। আমি শুধু বললাম, ঠাকুর এতো তোমার লীলা, তুমি তো আমার সঙ্গে আছো তবে এত কেন চিন্তা করছো? কাল সকালেই আবার যাবো। তুমি কিন্তু ওই মানুষটাকে অর্থাৎ বাবুলালজিকে এনে দাও।

১৪/১২/৭৫ সকালবেলায় আমাকে ডাকলেন আর ঠাকুর ওই চৌকিতে বসে "জাগো জাগো জাগো রে মন বল ব্রজানন্দ হরে হরে" এই সঙ্গীতটি স্বকণ্ঠে করছেন আর আমার মাথার উপর তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশীবাদ দান করছেন। আমি ঠাকুরের চরণ ধরে শুধু বলছি, হে প্রভু তুমি কৃপা করো এই অধমকে, যেন এই অধম তোমার শ্রীমুখের বাণীকে সত্যে পরিণত করার চেষ্টা করতে পারে। উঠে পরলাম, ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম, ঠাকুরকে বললাম এবার আমি যাই, ঠাকুর বললেন "আজ থাক" বাল্যভোগ সেবা করার পর ঠাকুর আমাকে প্রসাদ দিয়ে বললেন "যাও টাঙ্গা ঠিক করো। ব্রজ দর্শনে যাবো"। আমি পরি কি মরি করে ছুটলাম কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনও ঘোড়ার গাড়ি পেলাম না শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড যাবার জন্য। এসে ঠাকুরকে বললাম। ঠাকুর বললেন, "যমুনা দর্শনে চলো"। সূর্যকাকু ও তরণী জ্যাঠামশাই বললেন রিকশা করে যাওয়া যাবে, আবার গেলাম রিকশা আনার জন্য তিনটে রিকশা আনলাম, ঠাকুর আর আমি এক রিকশায় রেখামাই ও বীণামাই এক রিকশায় সূর্যকাকু ও তরণী জ্যাঠামশাই এক রিকশায় ধীরানন্দ মহারাজকে ঠাকুর বললেন, "ধীরানন্দ তুমি পরে যমুনা দর্শনে যাইও"।

চললাম যমুনায়। জীবনে এই প্রথমে যমুনা দর্শন করতে যাচ্ছি, সঙ্গে স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর। ভাগ্যক্রমে একই বাহনে। ঠাকুরকে যেন ভালভাবে ধরে বসি, ঠাকুরের পায়ে যেন আমার পা না লাগে এই সব কথা আমার মা বীণামাই ও তরণী জ্যাঠামশায় বার বার করে বুঝিয়ে বলছিলেন। ঠাকুর শুধু বললেন, "গুরু শিষ্যে কোনও ভেদ নাই, তোমরা উঠো সব চল", ধবনি দিল ধীরানন্দ মহারাজ, সূর্যকাকু ও তরণী জ্যাঠামশায় এক রিকশায়। রাস্তায় বেশ অনেক মানুষ দেখলেন কেহ কেহ ঠাকুরকে রিকশা দাঁড় করিয়ে প্রণাম করছেন। কী যে আনন্দ আমার তা ভাবতেও পারছি না।

ঠাকুরের কথা আজও এই হৃদয়ে ভেসে উঠে। "বাবা বহু জন্মের পুণ্যের ফল, কোটিতে পাওয়া যায় না সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে নিয়া আর জন্মদাত্রী মারে নিয়া বৃন্দাবন দর্শন, যমুনা দর্শন ভগবান ও ভক্ত একাসনে বাবা গুরুশিষ্য মিলেমিশে একাকার"।

সেদিন ভাবার্থ বা ভাব জগতে ডুব দিতে পারিনি আজ পারছি। আজ সম্পূর্ণ অর্থ তো আমাকে ভাব জগতে পাগল করে তুলেছে, শুধু ভাবছি আর বলছি ঠাকুর তোমার শ্রীচরণ দর্শনে আমাকে চঞ্চল করো না স্থির করো, হৃদয়ে তোমার আসন প্রতিষ্ঠিত হোক, প্রতিটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে যেন তোমার নাম ভিন্ন অন্যকিছু উচ্চারণ না হয়, এ নাম যেন অখণ্ড হয় — খণ্ড যেন না হয়। তোমার কথা বা উপদেশ যেন তোমার হাত থেকেই পাই যেমন শৈশবে তুমি ফুলের গাছের ফুল আমাকে ছুঁড়ে দিতে ধরতে, ধরতে গিয়ে পড়ে যেতাম-তুমি ওই শৈশবে শক্তি যোগান দিতে মায়ের কাছে শুনেছি। আমার একান্ত ভিক্ষা তোমার ক্ষমাপরানন্দকে তুমিই তুলে ধরো তোমার নির্দেশ মতো কর্ম করার জন্য। যমুনায় পৌঁছলাম কিন্তু রিকশা যাবে না কারণ মাত্র ২ ফুট বা ২$^{১}/_{২}$ ফুট বালির রাস্তা, সকলে নেমে পায়ে হেঁটেই যমুনার উদ্দেশে চললো। আমরা কেসি ঘাটে পৌঁছলাম তখন যমুনা বেশ দূরে ছিল। ঠাকুর, আমি ও মা বীণামাই একত্রিত হয়েছি। ঠাকুর রিকশাতে আমি নীচে, রিকশাচালক হাতল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাকুর বলছেন "যাও তোমরাও যমুনায় স্নান কইরা আস" মা বললো 'খোকন, ঠাকুরকে নিতে পারবি না রে'? আমি রিকশাচালককে অনুরোধ করলাম ভাই চলো না, সে জানালো পিছনের দুটো চাকা তো মাটির বাইরে পরে যাবে আর রিকশা উল্টে যাবে। সাধুবাবা পড়ে যাবেন, মাথা ফেটে যাবে। আমি বললাম দেখ সামনে আড়াই ফুটের বেশি আছে চল না আমি পিছনটা ধরছি তুলে, তুমি শুধু সামনের চাকাটা ঠিক ঠিক ভাবে নিয়ে চলো

দেখ যেন বালির উপরেই তোমার সামনের চাকা থাকে। ঠাকুরকে বললাম দেখ ঠাকুর তুমি না গেলে যমুনায় আমি আর মা যাবো না, ঠাকুর বললেন, "বাবা এ কেমন বায়না তোর, বীণামাই খোকনরে বুঝাও।" মাও বললেন, 'ঠাকুর তোমাকে তো হাঁইটা যাইতে বলতে পারি না। তাই রিকশাটা যমুনায় নিয়া চলো।' এবার ঠাকুর বললেন "দ্যাখ দ্যাখ মা বেটা দুওটাই চালাক। আইচ্ছা কী করতে হবে কও।" আমি ও মা একসঙ্গে বলে উঠলাম রিকশা নিয়া তুমি একটা লীলা করো। এবার ঠাকুর বললেন রিকশা চালককে "ধর ধর চল যমুনায় চল যমুনায়।" নিমেষের মধ্যেই রিকশাচালক হাতলটা আস্তে আস্তে করে নিয়ে চলল এগিয়ে। পেছনে আমি রিকশার চাকার রডটা ধরেছি। শুধু ঠাকুরের নাম করছি আর যমুনার সামনে পৌঁছে জয়ধবনি দিলাম 'ভগবান ব্রজানন্দ জীউ কি জয়' এবার দেখি ঠাকুর আমার আর মার মুখের দিকে তাকিয়ে বলছেন "সাধ মিটলো", তরণী জ্যাঠামশায় এবার প্রায় দৌড়ে ঠাকুরের কাছে এলেন। কি করে আসলে বাবা রিকশা নিয়া। ঠাকুরের উত্তর, "ভক্তের ইচ্ছা পূরণ করতে আর যমুনারে স্পর্শ করতে"।

সকল ভক্তরা দৌড়ে আসছে দেখে ঠাকুর রিকশা থেকে নেমে এবার আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলেন যমুনা থেকে জল তুললেন মা, ঘটি করে, ওই ঘটির জল দিয়ে যমুনাতে ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করালেন, ঠাকুর চোখ একবারের জন্য বন্ধ করলেন তারপর রাধারানির উদ্দেশ্যে বললেন, 'জয় ব্রজানন্দ রাধে'। আমি ও মা ঠাকুরের চরণ অভিষেক করলাম দুগ্ধ, চন্দন, অগুরু ও যমুনা মাকে দিয়ে তারপর তুলসী ও ফুল দিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করলাম। সকলেই জয়ধবনি দিলেন। রেখা মাই বললেন 'জয় ব্রজানন্দ গোবিন্দ'। আমরা সবাই যমুনার জলে স্নান করে ঠাকুরকে রিকশায় নিয়ে ফিরে আসলাম ধর্মশালায়। প্রায় ১২.৩০ মিনিট, ভোগ শুরু হল। প্রসাদ নিয়ে সবাই বিশ্রাম করছি এমনি সময় কল্যাণী থেকে দেবনাথ বাবু তার পরিবার ও কন্যা উমা উপস্থিত। জানিয়ে রাখি যখন রিকশাটার পিছনের দিকে ধরি, রিকশার ওজন মনে হয়নি ৫০০ গ্রামও।

১৫/১২/১৯৭৫

ঠাকুরের ইচ্ছা মতো বরষানা, শ্যামকুণ্ডু, রাধাকুণ্ডু, গিরিগোবর্ধন দর্শন হবে। টাঙ্গা আগের দিন ঠিক করেছি। ২ খানা টাঙ্গাগাড়ী, যাত্রী সংখ্যা নিম্ন অনুযায়ী।

ভগবান — ১

বীণামাই, রেখামাই, শ্রীমতি দেবনাথ ও উমা দেবনাথ — ৪

তরণীকান্ত বসু, সূর্যকান্ত দাস, শ্রী দেবনাথ, ধীরানন্দ মহারাজ ও আমি।—৫

মোট যাত্রী — ১০

১ নং টাঙ্গাতে — ঠাকুর, রেখা মাই, বীণামাই আমি ও তরণী জ্যাঠামশায়।

২ নং টাঙ্গাতে — শ্রীমতি দেবনাথ, উমা দেবনাথ, শ্রীযুক্ত দেবনাথ, সূর্য কাকা ও ধীরানন্দ মহারাজ।

ভগবানের সঙ্গে মথুরাপুরী, গোবর্ধনপুরী ও শ্যামকুণ্ডু রাধাকুণ্ডু দর্শন-এ চললাম সবাই। হরে ব্রজানন্দ হরে তারক ব্রহ্মনাম ধরলাম সবাই। কী অপূর্ব সেই দৃশ্য। সকাল ৮.১৫ মিনিট :—

এদিকে ঠাকুরের ধামের জন্য বাড়ি দেখা প্রায় দুদিন বন্ধ বললেই হয়। শুধু বিকেলে ১৪/১২/৭৫ সন্ধ্যায় আমাদের তীর্থগুরু বৃন্দাবনের বিহারীলাল পত্রকারের কাছে গিয়েছিলাম দেখা করার জন্য। যাক জয় ব্রজানন্দ ধবনি দিয়ে বেরিয়ে পরলাম সকলেই। উদ্দেশ্য গিরিগোবর্ধন, শ্যামকুণ্ডু ও রাধাকুণ্ডু চললাম টাঙ্গায় যেমন স্থির করা ছিল। প্রথমে বরষানা, ঠাকুর ও আমি টাঙ্গাতেই থাকলাম সবাই উপরে উঠে রাধারানির দর্শন করলেন, আমি শুধু নীচে ঠাকুরের সঙ্গে থাকলাম, ঠাকুর নীচ থেকেই রাধারানির উদ্দেশ্যে জানালেন, "খেল তুমি আরও খেল তোমার রাঙা আবিরে আমায় খেলাও, খেল তুমি আরও খেল।" তখন বুঝিনি, আজ বুঝতে পেরেছি, ঠাকুরের কথার অন্তর্নিহিত অর্থ, একটু পরে তরণী জ্যাঠামশায় ফিরে এলেন। বললেন ঠাকুরকে রাধারানিকে উনি জানিয়েছেন সে আর উঠতে পারছেন না, তাই নমস্কার করে নিয়েছেন। তরণী জ্যাঠামশায়ের বয়স বেশি ভক্তদের মধ্যে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে খুব কষ্টও হয়। ঠাকুর বললেন, "শরীরকে কষ্ট দিয়া লাভ কি, ভক্তি দিয়া দর্শন করতে হয়, দেখলা না গণেশ তার মারে প্রদক্ষিণ কইরাই জগৎ প্রদক্ষিণ কইরা ফালাইলো।" তরণী জ্যাঠামশায় তারপর ঠাকুরকে প্রণাম করলেন, তাঁর দেখাদেখি আমিও প্রণাম করলাম, ঠাকুর তারপর বললেন "বুঝলা বাবা রাধারানির দেশ এইটা। অনেক উচাতে ওর জগৎ সংসারে যখন হোলি খেলা হয় তখন এখানকার সব সখীরাই রাধা হইয়া যায় আর কি রংই না আমারে দেয়, স্বর্গের থিকা সব দেবতারা খুব আনন্দ করে যেওই দেইখ্যা। আমার যে কী আনন্দ হয়, সেই দেইখ্যা।" আমার তখন এই কথার অর্থ মাথায় প্রবেশ করে নি, তরণী জ্যাঠামশায় জয় ব্রজানন্দ, জয় ব্রজানন্দ, জয় ব্রজানন্দ বলে উঠলেন। সত্যই তখন আমি একেবারেই উপলব্ধি করিনি। ঠাকুরের এই কথা গুলি, আজ যখন

স্মরণে ঠাকুর আসলেন সত্যই বুঝতে পারছি কি অপূর্ব তার দৃশ্য, কি অপূর্ব রাধারাণীর লীলা ভাবা যায় না। ২০১১ এ কার্তিকদা, বৌদি, ইতু ও তার স্বামী ঘোষমাইও বীণামাই এর সঙ্গে দোলের দুদিন পর বরষানা দর্শনে যাই সকলেই, দেখেছি যে সত্যই স্বর্গের সৌন্দর্য্য কাকে বলে, আর সবচেয়ে বড় বিষয় ছিল। বীণামাইর বয়স সবচেয়ে বেশি ছিল ৮২ পার করে দিয়েছিলেন। তারপর ওনাকে ডুলিতে তোলা হ'ল। মন্দির তখন বন্ধ ছিল। সন্ধ্যারতি হবে। মন্দির এইবার খুলবে, কি ধাক্কাধাক্কি আমি গুরু গুরু করছি, ঠাকুরকে জানাচ্ছি যে হে গোবিন্দ তুমি মাকে তোমার দর্শন করিয়ে দাও ভালভাবে। কারণ তুমি তো একাধারে রাধাকৃষ্ণ। মন্দিরের দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বীণামাই একেবারে মন্দিরে মূর্তির সম্মুখে দাড়িয়ে, বৌদি ও বৌদির বোন, গোবিন্দবাবু ও কার্তিকদা বাঁ দিকে আর আমি ডান দিকে মাই মাঝখানে ধাক্কার চোটে এবার বৌদিরা একটু সরে গেলেন। মাই ঠিক একই জায়গায়। আরতি শেষ হল ঠাকুর মশায় ফুলের মালা ও প্রসাদ সকলের হাত থেকে নিচ্ছেন। আমি মায়ের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছি কারণ চাপের চোটে বীণামাই পদপিষ্ট যাতে না হয়ে যায়। ঠাকুরকে ডাকছি। এবার বৌদিরা ডানদিকে চলে এলেন ভীরের ধাক্কায়, ঘোষমাঈ চলে গেলেন একেবারে বাঁ দিকের কোণায় পূজারি মায়ের ও আমাদের সকলেরই মালা ও প্রসাদ নিলেন এবং মাকে রাধারানির প্রসাদ দিলেন। ভগবান ব্রজানন্দের জয়ধবনি দিলাম। আবার বলি হে ভগবান ব্রজানন্দ যদি তুমি না থাকতে তবে কোন ভাবেই তোমার বীণামাই ঠিক থাকতো না, 'জয় ব্রজানন্দ'। এবার বলি যদি সে দিন অর্থাৎ প্রথম গোবর্ধন যাত্রা আমার জীবনে সে দিন তুমি (১৫/১২/৭৫) টাঙ্গায় বসে না থাকতে তবে হয়তো আমার এই বিশ্বাস এই জন্মে জন্মাতো না বলেই মনে হয়। আজ মেলাচ্ছি ও মুক্ত কণ্ঠে বলছি, যারা সেদিন বরষানা মন্দির দর্শন করেছিলেন ঠাকুর ও আমি ছিলাম নীচে তারা যেই আনন্দ করেছিলেন তার থেকে সহস্রগুণ বেশি দর্শন লাভ করেছিল ঠাকুরের এই ক্ষমাপরানন্দ, আর তরণী জ্যাঠামশায়ও পেয়েছিলেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সবাই নীচে চলে এসে টাঙ্গায় বসলো, কমলালেবু কিনেছিলাম আমি দোকান থেকে, এই প্রথম- জীবনে ৫ টাকা কেজি হিসাবে লেবু কিনেছিলাম, ইতিমধ্যে প্রায় ১২৫ মিনিট অতিক্রান্ত। সকলেই ফিরে আসলেন, আমরা চললাম গিরিগোবর্ধন-এর উদ্দেশ্যে পৌঁছলাম প্রায় ১২টার সময়। মিষ্টি, দুধ দিয়ে ঠাকুরকে জানিয়ে গোবর্ধনকে পূজা দিলাম। ঠাকুর বললেন শুধু গুরুর উদ্দেশ্যেই, গুরুকে গোবিন্দরূপে, কৃষ্ণরূপে সব প্রদান করো। তাই করলাম, আর জীবনে প্রথম ঠাকুরের মুখে সুন্দর ছড়া শুনলাম

"শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড গিরিগোবর্ধন। মধুর মধুর বংশীবাজে এই তো বৃন্দাবন"।— আশ্চর্য লাগছে ঠাকুরের সব চেনা জানা। ঠাকুর যেন রোজ হাঁটতে আসেন এমন ভাবে বলছেন। এবার আবার টাঙ্গায় উঠলাম চললাম শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডর উদ্দেশ্যে। ঠাকুর টাঙ্গা থেকে মাকে বললেন আমি আর ঠাকুর টাঙ্গার সামনে। মা, তাপসীমাই, আর তরুণী জ্যাঠামশায় পিছনে। "বীণা দেখ দেখ বাবুই এরও বাসা আছে, তোর একটা বাসা হইল না।" বলে একটা গাছে বাবুইয়ের বাসা মাকে দেখালেন আবার বললেন "দেখি তোরে এই গোবিন্দের দেশে রাখতে পারি কিনা" জয় ব্রজানন্দ। আজ তাইতো বলছি। তুমি তোমার বীণামাই ও বাবা রামকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে বাস করিয়েছিলে তোমারই দেবালয়ে, ধন্য তারা বাবা রামকৃষ্ণ তো বৃন্দাবনেই রয়ে গেল ব্রজবাসী হয়ে তোমার চরণে, আর বীণামাই তার ভজন সাধনের ও নিত্যপূজার মধ্যে রয়ে গেল তোমারই চরণে। জয় হোক তোমার ভক্তদের। পৌঁছে গেলাম শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডতে, ঠাকুরের এক লীলা দর্শনের সৌভাগ্য আমাদের সকল ভক্তদেরই হয়েছিল।

শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডতে কেউই জুতো পায়ে দিয়ে প্রবেশ করে না এই নিয়ম। আমরা সবাই জুতো টাঙ্গায় রেখেই এসেছি শুধু ঠাকুরের চরণে (বিনামা) পাদুকা কাপড়ের আছে। ঠাকুরকে আমরা ধরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে বেশকিছু পান্ডা এসে হই হই করে বলছে 'এ বাবা তোমার জুতা উতারো পহলে ফির অন্দর আও।' আমি ওদের উদ্দেশ্যে বললাম, আরে ভাই এহি তো তুমহারা আর হামারা শ্যাম হ্যাঁ, অউর কই নেহি। পান্ডাদের মধ্যে এক জন বলে উঠলো শ্যাম একই হ্যায়, ইয়ে সাধু শ্যাম কেইসে হোগা। এবার ঠাকুর আমাকে বললেন "বাবা তোর বিশ্বাসমতো ওদের নাও হইতে পারে আমি জুতা খুইলা যাই।" আমি বললাম চোখের জলে হে ঠাকুর তুমি তো একই সাথে 'রাধাকৃষ্ণ' তবে কেন তোমার লীলা দর্শন করাচ্ছো না। একজন লাঠি নিয়ে প্রায় আমার মাথার উপরে চড়াও হয়। আমি কেঁদেই ফেলেছি। হঠাৎ দেখি ঠাকুর যেন কেমন একটা কিছু করলেন বলে মনে হলো, সকলেই আমরা দেখলাম ঠাকুরের পাদপদ্মে সব পান্ডারা প্রণাম করছে। আর একজন পান্ডা বলছেন যে হে গোবিন্দ মেরা দরবাজে পর আও। ঠাকুর ওই পান্ডার উঁচু উঠানেই বসলেন এবং ওই পান্ডা তার শ্যামকুণ্ডুর দিকের বাড়ি, বর্তমানে মন্দির হয়েছে। ওই পান্ডার নাম ছিল ভাঙগোলা আজ সে গোবিন্দের চরণে। ভাঙগোলা ভাইয়ের বারান্দায় ঠাকুর বসলেন সকলেই একবার রাধা ও শ্যামকুণ্ডুতে স্নান করছে। বীণামাই ঘটিতে করে জল নিয়ে এলেন শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড থেকে এবং ঠাকুরের চরণে দিয়ে চরণের সেবা করাচ্ছিল

আমার মাথা চরণের নীচে দিল মাথাতে পড়ছিল। সে দৃশ্য দেখে অনেকেই ওই মগ দিয়ে ঠাকুরের চরণে দিয়েছিলেন, ঠাকুর তখন যে কথাটা বললেন সেটা হল "ওরা যে ফল পাইসে সে ফলতো আর আমার কাছে নাই"। ভাঙগোলা একটা কামরাও আমাদের সবার জন্য ছেড়ে দিলেন। আমরা এক টাকাও দিইনি। উপরন্তু ভাঙগোলা পান্ডা আমাকে ধর্মভাই করে নিলেন এবং ঠাকুরের জন্য মিষ্টি আনতে ৫ টাকা দিলেন। ফিরে এলাম বৃন্দাবনে সন্ধ্যা হয়ে গেল ফিরতে ফিরতে। ধর্মশালায় এসে একেবারেই সন্ধ্যা আরতি ও নৈশ ভোগ দেওয়া হল ঠাকুরকে। এই সুযোগে আমি একবার বৃন্দাবন Bus Stand-এ গিয়ে সেই পান দোকানিকে জিজ্ঞাসা করে এলাম যে বাবুলাল সোনি এসেছিল কিনা। বলল আমাকে ওই দোকানি আগামী কাল সকাল ৯ টা নাগাদ আসবে। কারণ ১০টা থেকে যে রোদ ওঠে ওখানে যেন মনে হয় দুপুর ১২টা বেজে গেছে। ধর্মশালায় গিয়ে দেখি আমার অপেক্ষায় নীচে সূর্যকাকু আর দেবনাথ বাবু এদিক ওদিক দেখছেন। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় গেছিলাম তারপর ঠাকুরকে গিয়ে সব জানালাম। ঠাকুর বললেন তাড়াতাড়ি সব প্রসাদ নিয়া যেন শুয়ে পড়ি। রাত্রিবেলা ঠাকুরের চৌকির পাশেই নীচে আমি বিছানা পাতি শোয়ার জন্য, বিছানা মানে সতরঞ্চি, কম্বল, বালিশ ও চাদর। ঠাকুরের রাতে বাথরুমে যেতে হলে আমাকে ডাকতেই হতো। রাত প্রায় দুটো হবে আমার ঘুমটা ভেঙে গেছে। সবাই ঘুমচ্ছে আমি দেখি ঠাকুর চৌকির উপর বসে আছেন, সে যে কি দর্শন তা বলে শেষ করতে পারবো না। জয় বুড়াশিব ব্রজানন্দ তুমি জাগ্রত ঠাকুর আমার। তোমার কৃপা যেন আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বর্ষিত হয় এই প্রার্থনা তোমার ক্ষমাপরানন্দের। তোমার সকল ভক্ত শিষ্য যেন সুখে শান্তিতে থাকে আজীবন তোমার আর্শীবাদে।

তারপর আবার ঠাকুর চৌকিতে শুয়ে পরলেন, ভক্তিভরে দর্শন করলাম স্বয়ং বুড়াশিব ব্রজানন্দকে। সকাল হতেই ঠাকুর উঠে জাগো জাগো গানটা নিজেই একা একা শুরু করে দিয়েছেন। তারপর উঠলেন ধীরানন্দ মহারাজ, বীণামাই, রেখামাই, দেবনাথ মাই, আমি শুয়ে শুয়ে সবই শুনছি, ঠাকুর তার পদযুগল আমার উপর রাখছেন মাঝে মধ্যে আবার গাইছেন জাগো জাগো জাগোরে মনু বল ব্রজানন্দ হরে হরে।

এবার ধীরানন্দ মহারাজ বললেন 'খোকন ভাই ওঠো, আমি শুধু ঠাকুরের আদেশের জন্য শুয়েছিলাম, ঠাকুর বললেই উঠবো, এই বার ঠাকুর নিজে ডাকলেন 'ওঠ বাবা' আমি তো শুধু অপেক্ষায় ছিলাম এক লাফে উঠে পরলাম, উঠেই ঠাকুরের চরণে

প্রণাম নিবেদন করলাম। ঠাকুর বললেন, জয় হোক, জয় হোক, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি," ঠাকুর হাসছেন। তরণী জ্যাঠামশায় শুধু বললেন 'ভালই আদরে আছ, মায়ের স্নেহ ভালবাসা আর শ্রীগুরুর আশীর্বাদ। তুমিতো শুধু সঞ্চয় করতেই আসছো। আজকে কি কোথাও ভ্রমণে যাইবা নাকি।' ঠাকুর বললেন— "নানা কইল গোকুল যাওয়া হইবো।"

যথারীতি আমি মুখ ধুয়ে ঠাকুরকে বললাম আজ কচুরি আর তোমার জন্য জিলাপি নিয়ে আসি, ঠাকুরের চা ভোগের পর, নীচে আনতে যাবো, তখন দেবনাথ বাবু বললেন উনিও যাবেন, চললাম দুজনে, বাঁকেবিহারি মন্দিরের কাছে যেতেই মিঠাইয়ের বড় দোকান, কেনা হল মিষ্টি ও কচুরি বাল্যভোগের জন্য। বাল্যভোগ হবার পর লুহিয়া বাজারে গিয়ে সবজি নিয়ে আসলাম।

এদিকে ঠাকুরে স্নানের জল বালতি করে কাপড় দিয়ে ঢাকা রোদে দেওয়া হল। এবার ঠাকুর বাঁ দিকের ছাদের উচু স্থানে বসলেন কৌপিন পরা, সরষের তেল রোদে গরম হচ্ছে। গায়ে কিছু নেই। আমাকে যে ১৫টা দিন তাঁর সেবার সুযোগ দিয়েছিলেন সেটা ছিল তার প্রথম দিন। অর্থাৎ ১৬/১২/১৯৭৫, ঠাকুরকে তেল মাখিয়ে দিলাম পদযুগল পরিচর্যা করার সুযোগ পেলাম, এটা আমার জীবনে সবচেয়ে বড় পাওয়া। তারপর ঠাকুরের বিভিন্ন কথোপকথন উপদেশ ও বুড়াশিব সম্বন্ধে জানা। প্রতিদিন ওই টা ছিল আমার সব নেশার সবচেয়ে উত্তম নেশা, ঠাকুরও আমাকে খুবই ভালবাসতেন অনেকেরই বিশ্বাস। তাই তো ক্ষমাপরানন্দ হিসাবে ঠাকুরের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পেরেছি বা আমার সৌভাগ্য হয়েছে এ জীবনে।

বাজারে তরকারি কেনার সময়ে ওই বাড়ির মালিক বাবুলালজির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, বাজারে আমাকে বলল-যে সে বাড়িটা বিকালে দেখাবে। আমার যে কি আনন্দ তা বলার নয়, ঠাকুর তো আমাকে একটা বেশি মিষ্টি দেবেনই এবং আশীর্বাদও পাবো। ঠাকুরের শরীর চর্চা করার সময়ে বললাম এই ঘটনাটা, ঠাকুর তখন তরণী জ্যাঠামশায়কে ডাকতে বললেন, আমি ডাকলাম ঠাকুর বললেন তরণী জ্যাঠামশায়কে "বাবা তুমি ওর সঙ্গে যাও আজ বিকালে একটা বাড়ি দেইখ্যা আসো পছন্দ হয় কিনা তোমার দেখ"। আমরা প্রসাদ নিয়ে ৩ টে নাগাদ ঠাকুরকে প্রণাম করে বের হলাম। বাবুলালজির বাড়িতে গেলাম, ওই পান দোকানিকে নিয়ে, ভাঙা একটা কাঠের দরজা বড়, ওর ভিতরে কয়লার দোকান ও পরিবারের সকলেই থাকে। তরণী জ্যাঠামশায় তো

রুমাল নাকে দিলেন রাস্তা থেকেই, কারণ রাস্তার পাশে সবাই মলমূত্র ত্যাগ করে। ছোট বড় সবাই, দুর্গন্ধ খুবই। ভিতরে দেখলাম সবই, তরণী জ্যাঠামশায় সঙ্গে করে কাগজ ও কলম নিয়েই গিয়েছিলেন হাতে নকসা করা হল ঠাকুরকে বোঝানোর জন্য। ঠাকুরকে গিয়ে বলা হল, বলে রাখি, বাবুলাল সোনি আমার থেকে সেদিন ১০০ টাকা নিল যে হেতু বাড়িটা দেখিয়েছে আমি ভেবেছিলাম ও একটা দালাল বুঝি। আরে বাবা ও তো নিজেই বাড়ির মালিক কথা মতো ২ দিনে আমি বাবুলালজিকে ২০০ টাকা দিয়েছি। তরণী জ্যাঠামশায়তো গিয়েই ঠাকুরকে সব বললেন, আমি শুধু ঠাকুরকে একটা প্রণাম করলাম। ঠাকুর আশীর্বাদ করলেন জয় হোক, জয় জয়। বক্তা ছিলেন-স্বয়ং ভগবান ও তরণী জ্যাঠামশায় আর শ্রোতাও হলেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজানন্দ বুড়াশিব। শুধু ঠাকুরের প্রশ্নগুলি যা যা ছিল জানাচ্ছি।

১। "জায়গাটা কি রাস্তার উপরে বাবা"— 'হ্যাঁ বাবা' তরণী জ্যাঠামশায় বললেন।

২। "বাস স্ট্যান্ড থিকা কত দূর"— 'দুই মিনিট বাবা'।

৩। "রাস্তাটা কি বড়"— 'মেন রোড বাবা'।

৪। "আসে পাশে কি মন্দির আছে"— 'এটাই প্রথম মন্দির হবে বাবা যদি আপনার দৃষ্টি হয়'। "জয় ব্রজানন্দ" ধবনি দিলেন জ্যাঠামশায়।

এবার আমাকে আবার বললেন "জয় জয়, খুব ভাল, খুব ভাল আমি ঠাকুরকে বললাম কি ঠাকুর পচ্ছন্দতো, ঠাকুর শুধু "রাধারানির জয় বল বাবা" এবার বুঝলাম রাধারানির ইচ্ছা না হলে স্বয়ং গোবিন্দকেও শুধু হাতে ফেরৎ যেতে হয়। তরণী জ্যাঠামশায় শুধু বললেন 'বাবা রাস্তাটায় খুবই কাঁচা ময়লাতে ভরতি।'

ঠাকুর বললেন "বাবা পদ্ম তো পাঁকেই হয়" ঠাকুরতো সবই দেখেছেন ও বুঝেছেন, ঠাকুরতো আমাদের সঙ্গেই ছিলেন, এটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উনি তো অন্তর্যামী। বাকি রইল শুধু ফাইনাল কথাবার্তা বলা, বাধ সাধলো বাবুলালজির শ্যালক ও স্ত্রী, ঠাকুরেরই লীলা ছাড়া আর কিছু নয়, ইতিমধ্যে আমাদের পান্ডা বিহারীলাল পত্রকারকে জানানো হল। দাম ঠিক হলে ৪০ হাজার টাকা জমি বাবদ - ২৫ হাজার ও পুরানো বাড়ির জন্য ১৫ হাজার টাকা গোবিন্দ ঘেরায় ৫০০ টাকা দিতে হয়েছিল। Registration এর সময় নাম পরিবর্তনের জন্য। ঠাকুর সুনীল পালধী মহাশয়কে জানিয়েছিলেন, "গোবিন্দকেও গোবিন্দর ভেট দিতে হইল।" এ রাধারানির খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। আমি সবই জানতে পারতাম মায়ের চিঠিতে ঠাকুরের লেখা যা কিনা

তরণী জ্যাঠামশায় লিখতেন। এও ঠাকুর জানিয়েছিলেন পত্র মারফৎ আমাকে এবং সকলকে বলতেন "যে সকল কাজের আগে আসে ও সিদ্ধ কাজ করায় ঠাকুর যাকে দিয়ে, কোন দিনও নাকি তার দুঃখ হয় না," জানিনা কেন ঠাকুর এই কথা, বলেছিলেন। ১৮/১২/৭৫ গোকুল যাত্রা শুরু হল, আমরা ওই একই দল, গোকুল এ গিয়ে পৌছাই বেলা ১টার পর, পথে মিষ্টি খুব খাওয়া হয়েছে। এবার গৌড়ীয় মঠে উঠলাম মঠের সকলের খাওয়া হয়ে গেছে। একজন বাবাজি শুধু বাকি আছেন, আশ্রমের প্রধান বললেন যে একটু অপেক্ষা করুন, কারণ ঠাকুর আদেশ করলেন ওই আশ্রমের থেকে যেন ডাল চাল ব্যবস্থা করে খিচুড়ির ব্যবস্থা করা হয়। হল তাই ধীরানন্দ মহারাজ বীণামাই ও ওই মঠের বাবাজি তাড়াতাড়ি করে খিচুড়ি রান্না করলেন। মাটির বাড়ি ছিল তখন আমরা দাওয়ায় বসে। ঠাকুরের আদেশ হল পাতা লাগিয়ে দাও, সবাই প্রায় বসে পড়লো, ঠাকুরের পাতা লাগালাম, সবার জন্য পাতা, ঠাকুরে আদেশে ঠাকুরের পাশেও পাতা দিলাম কিন্তু কেউ বসে নিই। কি যে ভগবানের ইচ্ছা, ধীরানন্দ মহারাজ ও আমি পরিবেশন করলাম ঠাকুরকে ধূপকাঠি দেখিয়ে ভোগারতি করা হল। তখনও ওই পাতাটি ফাঁকা, রেখামাই পাশের পাতা নিয়ে আর বীণামাই তার পাশের পাতা নিয়ে এই ভাবে সবাই, ভোগারতি শেষ, ঠাকুর ওই পাতার মধ্যে প্রসাদি তুলে দিলেন আর ধীরানন্দ মহারাজকে বললেন যে কিছু কিছু প্রসাদ যেন ওই খালি পাতায় দিয়ে দেওয়া হয়। এবার ঠাকুর বললেন "খোকন বাবা আসো আসো বসো গোবিন্দের পাশে আর প্রসাদ নাও"। সত্যই আমি ভাগ্যবান কিনা জানি না। তবে ঠাকুরের আশীর্বাদ তো নিশ্চয়ই পেয়েছি। নইলে কেনই বা ঠাকুরের এত স্নেহ ও আশীর্বাদ এই ক্ষমাপরানন্দের উপর হয়েছে।

কী আনন্দ, আর কী যে দৃশ্য ভাবাই যায় না স্বয়ং গোকুলপতির সঙ্গে সকল ভক্তরা একসঙ্গে মিলে মিশে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করছে। আজও ভাবি কত জন্মের পুণ্যের ফল যে ঠাকুরের পাশে বসে প্রসাদ পাচ্ছি ও ঠাকুর তার পাতা থেকে আমাকে দিচ্ছেন। ভাবলে মনে হয় এ যেন সত্যই আশীর্বাদ আর স্নেহ ছাড়া আর কিছুই না। জয় গুরু-জয় ব্রজানন্দ।

১৯/১২/৭৫

সকালে উঠে বাল্যভোগের ব্যবস্থা এবং সকল প্রকার ভোগের ব্যবস্থা করলেন দেবনাথবাবু, আমার আর বিশেষ কাজ নেই। বাজারে গেলেন ধীরানন্দ মহারাজ, সূর্যকাকু ও দেবনাথবাবু আমি ও তরণী জ্যাঠামশায় আর সকল মাইরা বাল্যভোগের

ব্যবস্থায়, উমা অর্থাৎ দেবনাথ বাবুর কন্যা কখন সকালে বৃন্দাবনের মন্দির দেখতে যাবে সেটা ঠিক করছিল। যাই হোক, বালতিতে ঠাকুরের প্রত্যেক দিনের মতো রোদে কাপড় দিয়ে ঢাকা রাখা হয়েছে সরিষার তেলের বাটি নিয়ে আমি হাজির, ঠাকুর বসতেন ধর্মশালার দোতলা উঠেই বাঁ দিকে ছাদের মাঝামাঝি স্থানে একটা তার টানানো ছিল। আমাদের ঘরগুলো ছিল ডান দিকে মাঝখানটা ফাঁকা একতলা দেখা যায় ডানদিকেই তিনটে ঘর রান্নাঘরটা ছিল প্রথমে একটু ছোট তারপর বেশ বড়বড় সেখানে আমরা সবাই থাকতাম ঠাকুরের জন্য শুধু চৌকি এবং তারপরে ঘরটায় তাপসী মাই, বীণা মাই ও বাকি সকল মাইরা থাকতেন ঠাকুর ছিলেন সকলের মাঝখানে। রান্না ঘরটা বেশ বড় ছিল। সকালে ছোট রান্না ঘরে রান্না হত আর রাতে হত বড় রান্নাঘরে। খাওয়া দাওয়া দুবেলাই বড় রান্নাঘরে হত। দেবনাথ বাবুরা প্রথম ঘরটাতেই ছিলেন।

চৌকির পাশে আমাকে শোয়ার জায়গা দিলেন, কারণ ঠাকুরের পদসেবার সুযোগ ঠাকুরই দিয়েছিলেন, আর ভোর হলেই ঠাকুর নিজে প্রথমে উঠতেন আর সুন্দর ভাবে ভৈরব বিভিন্ন সুরে সঙ্গীত করতেন। "জাগো জাগো জাগো রে মন বল ব্রজানন্দ হরে হরে" মাঝে মধ্যে আমার পিঠের উপর তাঁর পাদপদ্ম তুলে দিয়ে আমাকে নাড়া দিতেন আর বলতেন "দেখ কেমন নাক ডাকে এ যেন বাঘের ডাক" আমি জেগেই থাকতাম শুধু অপেক্ষা করতাম কখন ঠাকুরের পাদপদ্ম আমার এ দেহকে স্পর্শ করে ধন্য করবে তারপর আমি উঠবো, তরণী জ্যাঠামশায় একেবারে বাঁ দিকটায় শুতেন, তারপর সূর্যকাকু তারপর আমি, ঠাকুর চৌকিতে। পরপর ধীরানন্দ মহারাজ আমরা সকলেই মাটিতে, ভক্তের মাঝে ভগবান স্বয়ং গোবিন্দ এ সত্যই ভাবা যায় না। তার পরের দিন দেবনাথ বাবুরা আগ্রা হয়ে দিল্লি চলে গেলেন, আমরা মাত্র তখন ঠাকুর বাদে দুইজন মাই ও ধীরানন্দ মহারাজকে নিয়ে ৪ জন। —

"হরে ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে
গৌর হরি বাসুদেব রাম নারায়ণ হরে"

— বাদরে নিয়ে গেল ঠাকুরের উলের গেঞ্জি

২০/১২/৭৫

প্রতিদিনের মতো আজও বালতিতে ঠাকুরের জল সূর্যের তাপে গরম হচ্ছে, মানুষজন তিনজন চলে গেল সকাল বেলাতেই। ঠাকুর ও আমাদের সকলের মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। যাক ঠাকুর প্রতিদিনের মতো বাঁদিকের দুটো ছাদের মাঝের জোড়ার উঁচুটাতে বসেছেন আর আমি ঠাকুরকে চরণ থেকে শুরু করে প্রতিদিনই তেল মেখে ভালভাবে ঠাকুরকে আরাম দেবার চেষ্টা করি, বা সত্য বলতে কি প্রকৃত সেবা তখন বুঝতাম না। ঠাকুর মাঝে মাঝে বলে উঠতেন 'ধীরে বাবা' তারপর ঠাকুরের শ্রীমুখে বুড়াশিব ধাম আর বুড়াশিবের কথা প্রায় রোজই শুনছিলাম, সেদিন আদি শঙ্করাচার্য সর্ম্পকে বলছিলেন, আমিও খুব মন দিয়ে শুনছিলাম। একটু আগেই ঠাকুরই বললেন "এই গেঞ্জিটা খুইলা লই, নইলে তেল লাইগা যাইবো।" ঠাকুর হাত দুটো মাথার উপর তুললেন আর আমি আস্তে আস্তে তোলার চেষ্টা করছি। রেখা মাই দৌড়ে এলেন বললেন তুই এই দিকটা ধর অর্থাৎ পিছনদিকটা আর রেখা মা সামনের দিকটা ধরলেন খুললাম গেঞ্জি। ঠাকুর রেখা মাইকে জিজ্ঞাসা করলেন "ভোগ কতদুর?" তারপর বললেন "খোকন আজকা আমাকে স্নান করাইয়া দিব তুমি যাও।"

এ যেন মেঘ না চাইতেই জল, রোজই আমি তেল মাখিয়ে দিই ঠাকুর জল ঢালেন আর রেখা মাই মুছিয়ে দেন। আজ যে কি আনন্দ আমার জয় গুরু "আমি ঠাকুরকে বলে ফেললাম তিনসত্য কইরা বলো, আমি তোমাকে স্নান করাইয়া দিমু। বললেন ঠাকুর "হ্-হ্-হ নে নে ভাল কইরা পিঠে দে।" ভগবান গোবিন্দ-এর শ্রীমুখে নানান বিষয়ে জানতে পারছি সবই যেন ভুলে গেছি। ঠাকুর একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন। একটা বাঁদর ছাদে এসেছে আর আমি হাত দিয়ে ওটাকে তাড়ানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু আবার ভাবছি বাঁদরটার দিকে তেড়ে গেলে তো ঠাকুরের এই তন্দ্রা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই কি করবো। হে গোবিন্দ ভাবতে ভাবতে বাঁদরটা তারে রাখা ঠাকুরের উলেন গেঞ্জি যেটা কোন এক বিশিষ্ট ভক্ত বিদেশ থেকে এনে দিয়েছিল ঠিক মনে নেই সেটাকে নিয়ে দু'হাতে করে আমার দিকে তাকাচ্ছে। এইবার আমি মাকে ডাকছি। মা সকালের রান্নাঘরের বাইরে উনানে অন্নের জল বসিয়েছেন, চালটা ধোবেন মনে হয় মা দৌড়ে দৌড়ে আসতে আসতে ঠাকুর জেগে গেলেন বললেন 'কি হইছে'। আমি বললাম তোমার গেঞ্জিটা নিয়া গেছে বাঁদরে। ঠাকুর বললেন বীণামাই দেখ দেখ খোকন আমারে ঘুম পারাইয়া দিল তেল

মাখাইয়া আর ভাল বিদেশি গেঞ্জিটা বাঁন্দরে নিয়া গেল! হায় রাধারানি। কিছু খাইতে দাও অগো। মা ও রেখা মাই দৌড়ে আলু কেটে আনতে আনতে বাঁদরটা ওই গেঞ্জিটা নিয়ে চলে গেল। ঠাকুর শুধু বললেন শীতে খুব কষ্ট পাইতে হইব, হায় রাধারানি। মা আমাকে বললেন এইবার তুই ঠাকুরের ওই রকম একটা গেঞ্জি কিনে এনে দিবি যত টাকাই লাগুক। আমি তো একবাক্যে রাজি। যাক ঠাকুরকে বললাম, তুমি না আমাকে এতক্ষণ বললা মায়া সকল বস্তুর থেকে কাটাইতে হয়। সংসারে থেকে সকল কর্তব্য করতে লাগে কিন্তু ধুলা মনে কইরা ঝাইড়া ফালাইতে হয়, মায়া, মোহ, বাসনা ত্যাগ করতে লাগে। তুমি শুধু ওই গেঞ্জিটার জন্য এত দুঃখ করতাছ। হে ভগবান এ তোমার কি পরীক্ষা। আজ সত্য সত্য সংসার বন্ধন আর মায়া থেকে তোমার খোকনকে ক্ষমাপরানন্দতে পরিবর্তন করেছ। তোমার যেমন ইচ্ছা তেমন তুমি করো, তোমার সাধ কি আমার বোধের মধ্যে।

ঠাকুরকে স্নান করালাম তার কথা মতো। ঠাকুর বার বার বলছিলেন 'হে রাধে এটা কি করলা' "তোমার সখার ভাল উলের গেঞ্জিটাকি তোমার এতই পছন্দ ছিল" যে ওরে পাঠাইয়া নিয়া গেলা। আজ কিছুটা হলেও বুঝতে পারি আমাদের গোবিন্দের আসল লীলা। এই লীলার কথা শিখছি। ভোগারতি হল সকলেই প্রসাদ নিলাম। ঠাকুরকে বললাম সন্ধ্যায় তোমাকে নিয়া যাবো ঠিক তোমার রাধে একটা শীতবস্ত্রের ব্যবস্থা করবেন। ঠিক হল আমি, মা ও রেখা মাই সন্ধ্যা আরতির আগেই যাব ও একটা ভাল সোয়েটার কিনবো ঠাকুরের জন্য। অনেক খোঁজার পরও কিছুই হল না, বলে রাখি একটা রিকশায় ঠাকুর ও আমি আর একটা রিকশায় রেখা মাই ও বীণা মাই। ঠাকুর আমাকে বেশ ভালভাবে ধরে বসেছেন। এদিকে আমরা বাঁকেবিহারী মন্দিরের কাছে রিকশায় যাচ্ছি আর দোকানগুলো তে হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ নাম হচ্ছে এইবার ঠাকুরের লীলা শুরু, ঠাকুরকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের নাম এর এরকম ক্যাসেট হবে না। বাজবে না সকল ভক্তের মাঝে, "ঠাকুর বললেন হরে হরে"। আমি বললাম যে তোমার তো অনেক বড়লোক ভক্ত শিষ্য আছে তুমি একবার বললেই তো হয়। ঠাকুর বললেন "বাবা সবাই কি ভক্তি নিতে বা দিতে আসে, আসে দুঃখ দিয়া সুখ নিতে। টাকা দিয়া সুখ আর আনন্দ কিনতে। ভক্তির ভক্ত যখন আসবে তখন ঠিকই করবে।" আমি তখন জানতাম আমাদের ভক্তদের মধ্যে সেই সময় শ্রীযুবরাজ বড়াল খুবই ধনী ছিলেন। তাকে বললেই ঠিক গানের একটা ক্যাসেট করবে। ঠাকুর আবার আর একটা কঠিন শব্দ যোগ করেছিলেন 'বাবা আমি যাকে যে দায়িত্ব দেব বলে ঠিক করেছি তাকে

তো সে দায়িত্ব দিয়েই জন্ম দিয়েছি, তুমি কিছু ভাইবো না সব হইবো। আমিও নাছোড়বান্দা শৈশব থেকেই। ঠাকুর তো আমার আপনজন। ভয় কোনদিনই পাইনি শ্রদ্ধা করেছি, ভক্তিতে মাথা নত হয়েছে তাঁরই শক্তিতে। তাইতো জিজ্ঞাসা করলাম বলো না কে করবে। আমার একটা বড় সুযোগ এখানে কারণ রিকশায় শুধু স্বরং, ইতিমধ্যে আমরা একটা কাপড়ের দোকানে গিয়ে ঠাকুরের পছন্দ মতো গরম কাপড় কিনলাম লংকোটের জন্য, দরজির দোকান এ এসে দেখি বন্ধ হয়ে গেছে। পরের দিন আমি বাঁকেবিহারী মন্দিরের কাছে এক দরজিকে নিয়ে গেলাম ধর্মশালায় লংকোটের মাপ নেবার জন্য। ঠাকুর ব্যবহার করেছিলেন। জয় গুরু জয় ব্রজানন্দ ঠাকুর বৃন্দাবনেশ্বর গোবিন্দ আর আমি তার দাসানুদাস। ঠাকুর কাঁধে হাত দিয়ে দিলেন আমার রিকশাব ঝাঁকুনির জন্য এবার জোর করে দুবার হাতটা কাঁধে ঠুকে বললেন "যা - তুই করবি, তুই করবি - তুই করবি।"

আমি কিন্তু একবারও ভাবিনি কখনও ঠাকুর এতবড় একটা কাজ আমার মতো এক নগণ্য দাসানুদাসের হাতে সঁপে দেবেন। কোথায় ১৯৭৫ সন আর সেই আমাকে নিমিত্ত করে ঠাকুরই তাঁর প্রথম CD MP3 প্রকাশ করলেন ২০১০-এ ৩৪ বছর এর মাথায়।

যাঁরা প্রধান শিষ্য - তারা প্রত্যেকেই বলেছেন যেমন — ডঃ বাগচী, শ্রী সুনীল পালধী, বীণা মাই, ঝর্ণা কুণ্ডু আরও বহু ভক্ত শিষ্য। ভেবেছিলাম যে শুধুই গানগুলো হবে, ঠিক হল বীণামাইয়ের কিছু গান যেগুলো ঠাকুর খুব ভালবাসতেন আর ঠাকুরের কিছু পছন্দ করা গান আর ঠাকুরের স্বকণ্ঠের গান পেলাম গুরুভাই প্রশান্ত রায়ের কাছে। তাকে বলার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা উনি আমাকে দিলেন। ওইগুলো স্পুলে টেক করেছিলেন শ্রী সুনীল পালধী মহাশয় বাংলাদেশে, কি কি ভাবে যে ঠাকুর আমার কাছে শ্রী প্রশান্ত রায়ের মাধ্যমে পৌঁছেদিল, ভাবতেই পারছি না এখনও পর্যন্ত। ঢাকার চিত্ত মহারাজ বহুবার বলেছেন ঠাকুরের গানগুলো আমরা ভেবেছিলাম প্রকাশ করবো, কিন্তু তার আগে তুমি করে ফেলেছ। আমার উত্তরটা শুধু ঠাকুরের ইচ্ছা ছাড়া ত্রিভুবনে হাওয়াও বহে না। যাক্ এবার গান বাছার পর গায়ক গায়িকা বাছাই পর্ব শুরু। বিশেষভাবে শীতলদার মেয়ে সাহানা সিনহা মিশ্র-কে প্রথমেই ডাকলাম। সে এবং অন্যান্য শিল্পীরা আমার মায়ের গান ও ঠাক্‌রের আরও গান CD তে পরিবেশন করেছিল।

শুধু গানগুলো হলে যেন ঠিক হবে না ঠাকুর যেন এ ভাব বার বার জানাচ্ছেন আমাকে। তাই শুরু করলাম এবারে ঠাকুরেরই শ্রীমুখে শোনা ১৯৭৫ এ সব কিছুকে মনে করতে লাগলাম। তারপর গেলাম সাহানার বন্ধু লিপিকা মুখোপাধ্যায়ের

কাছে, লিপিকাকে সব বুঝিয়ে দিলাম কিছু বইও দিলাম ঠাকুরের যেমন লীলা পরিচয় অন্যান্য বইও সব মিলিয়ে দুজনে মিলে তৈরী করলাম গীতিআলেখ্য। আমার চিন্তায় ঠাকুরই বিরাজমান, ঠাকুরই সম্পূর্ণভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, লিপিকা সেভাবে লেখনীটাকে বাঁধন দিয়েছে, তৈরী হয়েছে এক গীতিআলেখ্য তাতে ছিল বীণামাঈয়ের গীতগুলি। শুধু-গানের CD তৈরী হল না, ঠাকুর বানালেন ঠাকুরেরই গীতিআলেখ্য। বিশিষ্ট ভক্ত ও শিষ্য-এর হাত দিয়েই CD টি প্রকাশিত করলেন ঠাকুর স্বয়ং ২০১০ এর রথযাত্রার দিন। ডঃ আনন্দগোপাল বাগচী মহাশয়ের মাধ্যমে উদ্বোধন করলেন। প্রথম দিনেই ৬০ খানা CD বিক্রী হল আমি আর বীণা মাই প্রায় সারা রাত দুজনে দুজনকে জড়িয়ে কেঁদেছি ঠাকুরের কাছে। এভাবে তুমি করলে ঠাকুর, মাই তখনই বলেছিল দেখবি তোকে ঠাকুর আশ্রমিক করে নেবে। আজ ভাবি মাই যে তার সন্তান এই ক্ষমাপরানন্দকে এই ভক্তি সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে, আজ আমি বলি:- মাগো তোমার ক্ষমাপরানন্দকে যে ভবনদীতে তুমি সাঁতার কাটতে শিখিয়েছ, জানি না তোমার ক্ষমাপরানন্দ সেই তোমার নাইয়াকে পাবে কিনা সাঁতরে তোমার মতন। আজ যে আমি বড়ই একা মা। তোমার নাইয়া অর্থাৎ আমার ঠাকুর ভিন্ন আর কোন আত্মীয় নাই যে মা গুরুভাই বোন ছাড়া। আর শ্রীগুরুর চরণ ছাড়া আর কিছুই এই নয়নে ধরা পড়ে না যে। দ্বিতীয় CD করার মূলে কার্তিকদার স্ত্রী অর্থাৎ আমার পরম শ্রদ্ধেয় বৌদি। বৃন্দাবনে যখন সকলেই গেলাম ২০১১তে তখন বৌদি বললেন বৃন্দাবনে যে মৃণালদা এবার যদি ঠাকুরের একটা নাম কীর্তনের CD তৈরী করার চেষ্টা করি। বৃন্দাবনেই বৌদিকে বলেছিলাম যে আপনি যদি কিছু আর্থিক সহযোগিতা করেন নিশ্চয়ই হবে। তারপর আমাদের আত্মীয় ও গুরুভগ্নী ঝর্ণাদি আমাকে অর্থ সাহায্য করলেন কার্তিকদা ও ঝর্ণাদি ১৫০০০+১৫০০০ = ৩০,০০০ আর ঢাকার মনোরঞ্জর কাকার ছেলে শিবু — ৫০০০ দিয়েছিল সব মিলিয়ে ৩৫,০০০ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল। সকলকে জানিয়েছি ভজনাঞ্জলীর CD1 ঠাক্‌রের টাকাতেই প্রকাশিত হয়েছে। নামকীর্তনের CD2 ভজনাঞ্জলী তাপসীমাইর হাত ধরে উদ্বোধন করেছেন বীণা মাই, ডাঃ বাগচী আরও অনেকে, সেটা ছিল মহালয়ার পুণ্যলগ্নে। এভাবেই ঠাকুর তার কথার মূল্য ও কথা যে মিথ্যা নয়, সেই যে আমাদের ভবসাগরের নাইয়া তার প্রমাণ বার বার দিয়েছেন। জয় গুরু জয় ব্রজানন্দ।

২১/১২/৭৫

বাবুলাল সোনি বর্তমানে মন্দিরের প্রাক্তন মালিক এলেন দেখা করলেন ও

বললেন সাধুবাবা আমার এই বাড়িটা তোমাকেই বিক্রি করবো কিন্তু আমার পত্নী একটু বেশি পয়সা চাইছে। ঠাকুর বুঝিয়ে বললেই হয়ে যাবে। যাই হোক বিকালে বাবুলালজির স্ত্রী আসলো। ঠাকুরের সামনেই স্বামী ও স্ত্রী যেন বেশ গরম মেজাজ নিয়ে কথা বলছে। ঠাকুর বুঝিয়ে বললেন "দেখো মাই ইয়ে সাধুকো নেই জানতে, খুদ গোবিন্দজি হুঁ, গোবিন্দ কো উনকা জমিন নেই দেওগো আপকা — রেহেনকা লিয়ে জমিন মিল জায়গা চিন্তা মত করো।" এই বার শান্ত হলেন, ওই মাঈর নাম ছিল অনার দেবী। ওনারা জমি কিনলেন অন্যস্থানে।

ঠাকুর বাড়িটি রেজিস্ট্রেশন না হওয়া পর্যন্ত খুবই বিচলিত ছিলেন। অনেক ভক্তকে তা পত্র মাধ্যমে জানিয়েছিলেন। মার্চ মাসে জমিটি রেজিস্ট্রেশন হয় ও মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় দোলের দিন। আমরা বছরের শেষের সময়ের জন্য আসতে পারিনি। ঠাকুর আমাকে আশীর্বাদ ফুল পাঠাতেন মায়ের চিঠিতে, এবং তরণী জ্যাঠা মশায় ঠাকুরের হয়ে লিখতেন। চিঠিগুলি ভালভাবে সংগ্রহ করে রাখতে পারি নি, কারণ আমার কর্মদোষ বলেই ধরে নেব। যেমন আমার বাবাকে ঠাকুর সম্পূর্ণ নিজের হাতের লেখায় চিঠি পাঠিয়ে ছিলেন, তা শ্রীযুক্ত সুনীল পালধী মহাশয়, তরণী কান্ত বসু, সকলেই জানতেন এবং কোন কিছু ছাপানোর বিষয় হলেই বলানন্দ মহারাজকে আমাদের শিয়ালদহের বাড়িতে ঠাকুর বাবার কাছে পাঠাতেন। বাবাই ঠাকুরের প্রথম সিসার ফটোর ব্লক তৈরী করান সাদা কালো ফটো থেকে। সেগুলো মেরুন বা কমলা রং কালিতে ছাপানো হত। বাবা যে ঠাকুরের সেই মহামূল্যবান পত্রটি কী করলেন আজও জানতে পারলাম না। ছোট থেকে লেখা বা সংস্কৃত স্কুলে পড়াশুনা তা ভগবান ব্রজানন্দের আশীর্বাদে ও বাবার প্রচেষ্টায় হয়েছে। ২য় শ্রেণি থেকে সংস্কৃত স্কুলে পড়াশুনা শুরু, চাণক্য শ্লোক, গীতাপাঠ করা ইত্যাদি শিক্ষক অজিত বাবু এর কাছেই শিখি, আর বাবা ঠাকুরের আশ্রমে আমাকে নিয়ে আসতেন। বলতেন ঠাকুরকে শোনা। সেই থেকেই আমার প্রেমের ঠাকুর, আমি কখনও দাদু ডাকি নি, কত বকুনি খেয়েছি, বাবা মাঝে মধ্যে মেরেওছেন। ঠাকুর একদিন বললেন "ও আমাকে যে মন থেকে ঠাকুর ডাকে, ওরে ওই নামেই ডাকতে দাও।" ডঃ আনন্দগোপাল বাগচী মহাশয় তাঁর পরিবার সহ বৃন্দাবনে যান ও ঠাকুরকে হরিদ্বার ও ঋশিকেশ দর্শন করান আমি চলে আসার পরে। এই ঘটনাটা জানতে পারি বীনা মাঈয়ের ডায়েরী হইতে।

আমাকে অনেক প্রবীন ভক্তরা বলতেন 'ওই যে ঠাকুরের পোলা' আমার বেশ ভালই লাগতো। তাইতো এই গ্রন্থটির নামাকরণ "ভগবান ব্রজানন্দের বেদবাণী ও আমার ঠাকুর।"

ভজন সম্বন্ধে

ভগবত প্রেম ও ভগবান এর সুখসাধ্য মাধ্যম হচ্ছে ভক্তি, ভক্তিদ্বারাই ভগবত প্রেম জাগ্রত হয় ভগবান ও ভক্তের মধ্যে তাইতো শাস্ত্রজ্ঞরা জানিয়েছেন — ভজনের মধ্যে খুবই সত্বর ভগবৎ প্রেমে পৌছান যায় বলে বিশ্বাস সকল ভক্তদের তাইতো মীরাবাঈও ভজনের মধ্যেই ডুবে থাকতেন তার কৃষ্ণকে খুঁজে পাওয়ার তাগিদে তাই সঙ্গীত পৃথিবী জুড়ে এতো প্রসিদ্ধ। মানুষ সভ্যতাকে যে এক অদ্ভুত প্রেমসাগরে নিয়ে যায়, আর ভজন সে তো হ'ল ভগবতপ্রেম।

"ভজ্ ধাতু 'ক্তি' প্রত্যয়ে" ভক্তি শব্দ নিষ্পন্ন হয়। 'ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ' গরুড় পুরানে কথিত। ভজ্ ধাতুর প্রয়োগ সেবার্থে করা হইয়াছে তাই ভক্তির অর্থই হইল সেবামূলক কর্ম আর ভগবানের পরম ও শ্রেষ্ঠ সেবাই হচ্ছে ভক্তের ভক্তি। নিস্বার্থ, নিষ্কাম হওয়া প্রয়োজন ঐহ্যিক ও বাহ্যিক সকল প্রকার কামনা বাসনা ভোগ বিলাস ত্যাগ করেই কেবল ভগবানে আশ্রিত হতে হবে, সকল ইন্দ্রিয় গুলির দ্বারা ভগবান ব্রজানন্দকে উপলব্ধি ও ভগবানে স্বাচ্ছন্দ উপভোগ করতে হবে। যেমন ভগবানের প্রসাদ কী কী? ১। চরণামৃত, ২। চরণ তুলসী, ৩। ভগবানের অমৃত বাণী, ৪। ভগবান সেবার অধিকারীর প্রসাদ, ৫। সকল ভক্তিরসের আস্বাদন এর প্রসাদ, ৬। কর্নে ভজনের প্রসাদ, ৭। চক্ষুতে ভগবান দর্শনের প্রসাদ, ৮। হৃদয়ে ভগবানের নামের প্রসাদ, ৯। হৃদয় গর্ভ মন্দিরে দেবতা প্রতিদ্বার প্রসাদ, ১০। সমস্ত ইন্দ্রিয় মধ্যে অখণ্ড নাম কীর্তনের প্রসাদ ও মহাপ্রসাদ, ভগবান ব্রজানন্দের মহাপ্রসাদ গ্রহণ করা। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমস্ত দেহে, মনে ও প্রাণে অক্ষন্ড নাম অনবরত চালিত নিশ্বাসে প্রশ্বাসে রক্তের চলাচলের সঙ্গে, "হরে ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে, গৌর হরি বাসুদেব রায় নারায়ন হরে।"

ভজন : ভগবানের জন, ভগবানের জন্য, ভগবান জনে জনে ভক্তি সেবার জন্য, ভগবানের উক্তিকে বিশ্বাস করাই ভক্তি। যার মধ্যে স্বয়ং ভগবান বিরাজ করেন। প্রকৃত ভক্তিই কিছু ঐহিক ও পারত্রিক ফল কামনা বাসনা শূন্য ভাবেরই ভাব। ভজনের মধ্যেই নিষ্কামের সমাধি ভাব দর্শণ আসে। যেমন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব-এর হত। ভজন শুনতে শুনতে ঠাকুরের সমাধি হয়ে যেত। গিরিশচন্দ্র যখন অভিনয় করতেন, সেই চরিত্রের মধ্যে মিশে যেতেন, তার সেই অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে রামকৃষ্ণদেবের সমাধি হয়ে যেত। যাঁরা ভগবানকে একমাত্র অবলম্বন রূপে ভজন করেন, তাতেই হৃদয় সমর্পিত করেন, তাদের আনন্দাশ্রুতে ভগবানের চরণ ধুইয়ে দেন। ভগবান তাতেই বিলীন হন।

এখানেই ভক্তের ভগবান বলা হয়। যেমন, নটী বিনোদিনী রামকৃষ্ণদেবের পায়ে পড়ে মুক্তির জন্য আকুলিত হয়েছেন। ভগবান ভক্তের মধ্যে তফাৎ হল।

বুড়াশিব মন্ত্র

"ওঁ হ্রীং নমঃ তত্ত্ব পুরুষায় বিদ্মহে বুড়াশিবায় ব্রজানন্দায়
মহাদেবায় ধীমহি তন্ধ্য রুদ্র প্রচোদয়াৎ।"

এখানে গীতার উল্লেখ করা হল শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, তুমি তোমার অতীত সম্পর্কে অজ্ঞান। তোমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও তাই। তুমি শুধু বর্তমান সম্পর্কে অবহিত। "অর্জুন আমি তোমার রথের সারথী ও সখা, আমি আমার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সবটাই জানি। কারণ আমিই স্রষ্টা আমিই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর"। তুমি আজ আছ, কালই অতীত হয়ে যাবে কিন্তু আমি সততই বর্তমানই থাকব। তুমি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, আমি সর্বদাই স্মরণীয় হয়ে থাকব। সকলেই আমার স্মরণাগত হবে। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে এই পার্থক্য। ভক্ত কর্তব্যে রত হবে, ভগবান কর্মকে নির্দেশ ও নির্দিষ্ট করবে। ভক্ত ভগবানকে একাগ্র চিত্তে স্মরণ করবে ফলের আশা না করে। ভগবান ভক্তের প্রয়োজনানুসারে ফল দান করবেন ও ভক্তি পরীক্ষাও করবেন। ভক্তকে তার জন্য কষ্ট করতে হবে, ভগবানের প্রতি বিমুখ হলে চলবে না তাইতো সুরদাস অন্ধ হয়েও ভগবানকে সঙ্গীতের মাধ্যমে অর্চ্চনা করেছিলেন। ভগবানকে চাক্ষুষ করেননি, তথাপি অন্তরে অন্তর্যামী রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সুরদাস স্বয়ং বিচরণ করেছেন সঙ্গীতের মাধ্যমে (হৃদয় মন্দিরে) তিনটি স্তরেই। ৩টি স্তর অবরোহণ, সঞ্চারী, আরোহণ। প্রতিটি স্তরই একে অন্যের পরিপূরক একটি ব্যতীত অন্যটি অচল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহশ্বের। এবার আসি, এই তিনের প্রকৃত রূপরেখা ব্রহ্মা — সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করলেন বালক গোপালকে যার পরবর্তী অধ্যায়ের নাম বিষ্ণু। ব্রহ্মা হলেন সঙ্গীতের অবরোহণ, বিষ্ণু হলেন সঞ্চারী (মধ্যক্ষা) আরোহণ হচ্ছেন মহেশ্বর, তার বাসস্থান সর্বোচ্চ শৃঙ্গে কৈলাসে, যার ওপরে আর কারও আরোহণ নেই। ব্রহ্মা বিরাজ করেছেন এই পৃথিবীতে নর রূপে নারায়ণ হিসাবে, মানবের সৃষ্টিকর্তা। গোপাল রূপে মর্ত্যে ঘরে ঘরে পূজিত। নারায়ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত মর্ত্যে। মহেশ্বর রূপে প্রতিষ্ঠিত কৈলাসে। সকলের তিনটি স্তরই একে অন্যের পরিপূরক। তিনের একত্রিত সম্পদ হচ্ছে এই শৃঙ্গে পৃথিবী বা ধরা তাই আমরা মানবজাতি বা ভক্তসকল শ্রীকৃষ্ণের বা নারায়ণের চরণে তুলসী পত্র নিবেদন করি আর দেবাদিদেব মহেশ্বরের মস্তিষ্কে বিল্বপত্র অর্পণ করি। কারণ শিবের চরণের অধিকারী শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণ, আর শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণের মস্তিষ্কের অধিকারী মহেশ্বর। এই তিনের একত্রিত সাঙ্গীতিক ছন্দই হল ভজন। ভজনের মাধ্যমেই সচ্চিদানন্দ কে অনুভব করা যায়। এই সচ্চিদানন্দ হলেন জগৎ গুরু ভগবান শ্রী শ্রী বুড়াশিব ব্রজানন্দ।

সন্ন্যাসিনী ভূমানন্দ ও মনীষানন্দের স্মরণে

শ্রীযুক্ত সুনীল রায় পালধি মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি ২০/০৪/২০১৩ বৈকালে তার বাড়ীতে গড়িয়া বোড়ালে।

'বুড়াশিব মাহাত্ম্য' অমূল্য গ্রন্থটি আমাকে দিলেন।

বুড়াশিব মাহাত্ম্য বইটির রচয়িতা সম্পর্কে বিশেষভাবে জানান।

'ভূমানন্দ' ছিলেন সংসারী জীবনে উত্তর চব্বিশ পরগণার কোন্নগরের বাসিন্দা শ্রীমতি তরঙ্গিনী মুখার্জী। শ্রীমতি মুখার্জীর স্বামী গত হওয়ার পর, তিনি তার জেষ্ঠ্য পুত্র, পুত্রবধূ ও কনিষ্ঠ পুত্রকে নিয়ে বসবাস করছিলেন। হঠাৎ একদিন স্বপ্নাদেশে দেখেন যে উনি বুড়াশিব ভগবান ব্রজানন্দের সান্নিধ্যে পৌঁছে গেছেন। এই স্বপ্ন দেখার পর উনি সকল সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে অধুনা বাংলাদেশ ঢাকা বুড়াশিব বাড়ীতে ভগবান বুড়াশিব ব্রজানন্দের কাছে পৌঁছে গেলেন। ঠাকুরের স্মরণাগত হলেন। ঠাকুর কিছুদিনের মধ্যে তরঙ্গিনীমাঈ ওনার জ্যেষ্ঠ পুত্র, পুত্রবধূ ও কনিষ্ঠ পুত্র ৭ বৎসরের বালককেও সন্ন্যাস দিয়া দিলেন, তৎকালীন সকল ভক্তরা নয়নাশ্রুতে তা প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে থাকলেন এবং সকলেই ঠাকুরের এই লীলায় নির্বাক। সুনীলবাবু জেষ্ঠ্য পুত্রের সংসার জীবনের নাম এবং পুত্র বধুর নামটিও স্মরণে আনতে পারলেন না। যাই হোক তরঙ্গিনী মুখার্জ্জীর সন্ন্যাস জীবনের নাম হলো 'ভূমানন্দ' ও কনিষ্ঠ পুত্রের নাম হলো 'মনীষানন্দ'। ঠাকুর তাঁদের ১ মাস যাবৎ আশ্রমে রাখিয়া পরে ঢাকার লালবাগে একখানা বাসা ভাড়া করাইয়া দিলেন। তাঁদের সন্ন্যাস জীবনের দিন অতিবাহিত হইতেছিল ভালভাবেই। ঠাকুর চিন্তা করিলেন মনীষানন্দের পঠন পাঠনের প্রয়োজন তাই তাদের নিয়া অধুনা ভারতবর্ষের কাশীতে নিয়া গেলেন। মনীষানন্দের স্মরণ শক্তি দেখিয়া স্বয়ং ভগবানও আশ্চর্য্য হইলেন। এলাহাবাদ যাওয়ার পথে, হাওড়া স্টেশন হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত যতগুলো রেল স্টেশন ছিল তাহা জলের মতন বলিয়া চলিল, যাত্রীরা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। অনেকের জিজ্ঞাস্য কে এই বিস্ময় বালক, বয়স তখন তার-৭ বছর হইবে। সেই সময় কাশীতে ক্যাপটেন সারভেয়ার সংস্কৃত কলেজ শুরু করেন। সেই স্কুলেই শুরু হইল মনীষানন্দের সংস্কৃত পড়াশুনা। তার মেধা এতই প্রখর ছিল যে স্কুল ইন্টার করার সময় সে কিনা ডিগ্রী করার ছাত্রদের খাতাও শুদ্ধ করিয়া দিত। ঠাকুর বহুবারই বলিয়াছেন মনীষানন্দ সম্পর্কে-"আর একজন শঙ্করাচার্য্য হইতে পারত"। সকলে মিলিয়া কাশীবাসী হইলেন, ঠাকুরও তখন কাশীতে ছিলেন। সুনীলবাবু এও জানান, একবার এক মৌলবী দ্যাখে ঐ ছোট্ট সন্ন্যাসী বালক রন্ধন করিতেছে।

মৌলবী ভাবল তার ধৈর্য্য পরীক্ষা করি, বহুভাবে বালকসন্ন্যাসীকে খ্যাপাইয়া তোলার চেষ্টা করিতেছিলেন। তবুও মনীষানন্দ নির্বাক ছিল। যখন মৌলবী সাহেব বলিলেন বলো তো, তোমার কৃষ্ণ কালো কেন? আবার বললেন কৃষ্ণ চোর ছিল, আমাদের আম্মা মহম্মদ যখন অন্ন পাক ক'রে গোষল করতে গিয়েছিল তখন তোমার কৃষ্ণ ঐ অন্ন খেয়ে গাছের উপর বসেছিল। আমাদের মহম্মদ এসে দ্যাখে যে সব অন্ন উধাও, এও দ্যাখে যে গাছে কৃষ্ণ বসে আছে। তারপর কৃষ্ণকে মহম্মদ নীচে আসতে বলে, আর যেই কিনা নিচে আসে, তখন মহম্মদ হাড়ির নীচের কালি দু-হাতে নিয়ে কৃষ্ণের মুখে ও শরীরে মাখিয়ে দেন। তাই তোমাদের কৃষ্ণ কালো। এই বার মনীষানন্দ ক্রোধে বলিয়া উঠিল মৌলবীকে যে জানো তো আমাদের কৃষ্ণ তার নাগ্রা চরণ দিয়ে এমন প্রহার করে ছিল তোমার মহম্মদকে যে তার টিকি ও ঘাড় নিচু করিয়া দিয়াছিল।

এমত অবস্থা ও পরিস্থিতি চরমে পৌছয়, সঙ্গে সঙ্গে ভগবান ব্রজানন্দ গাছতলা হইতে উঠিয়া দুই জনকে দুই বহু দিয়া তফাৎ করিয়া দেয় ও শান্ত করেন। আরও এরকম বহু ঘটনাই ঘটিয়াছিল মনীষানন্দের জীবনে। যা ঠাকুর বলিয়াছেন তার শ্রীমুখে তা অনেকেই শ্রবণ করিয়াছিল তাদের মধ্যে সুনীল রায় পালধী মহাশয় একজন।

পরে জানা যায় যে, 'ভুমানন্দমাঈ' 'বুড়াশিব মাহাত্ম্য' গ্রন্থটি শ্রীগুরুর পাদপদ্মে নিবেদন করেন। দুঃখের বিষয় ভূমানন্দমাঈর বড় পুত্র ম্যালেরিয়াতে দেহ রাখেন বয়স যখন তার ১৮/১৯ বছর। তাঁর স্ত্রীকে নিজগৃহে নিয়া যায় তার বাপের বাড়ীর লোক আসিয়া, রইল শুধু ভূমানন্দমাঈ আর মনীষানন্দ বালক সাধু। মনীষানন্দ ছিলেন খুবই মেধাবী ছাত্র এবং পরিশ্রমী। শ্রীশ্রীবুড়াশিব মহাত্ম্য প্রকাশে তার মায়ের অংশীদারও ছিলেন তিনি। আরও দুঃখের দিন স্বয়ং নিয়ন্তা বুড়াশিবকে দেখতে হইলো। মনীষানন্দ সাধনভজনের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে বিদায় নিল মাত্র ১৬ বছরে। বুড়াশিব মাহাত্ম্য গ্রন্থটি লিখে চলে গেলেন ভূমানন্দ মাঈও ঠাকুরের পাদপদ্মে। 'ভূমানন্দ মাঈর' জন্য আমরা আমাদের বুড়াশিব ব্রজানন্দের পরিচয়টা পাই সঠিক ভাবে, যার জন্য তিনি এ ধরায় এসেছিলেন। ঠাকুর মনীষানন্দ সম্পর্কে সব সময় বলেছেন 'ও আর একজন শঙ্করাচার্য্য হতো'। সুনীল বাবুর কাছে এও জানতে পারি যে একবার শিবধামে একটি বাছুর জন্মে কিছুদিনের মধ্যেই মারা গেল। ঠাকুর বললেন এরা অল্পদিনের জন্য ঋনী ছিল উদ্ধার হয়ে গেল। সুনীলবাবু জানালেন এবং আমারও মনে হলো এ যেন ভূমানন্দ ও তাঁর পরিবার সম্বন্ধেই ঐ মূল্যবান কথাটি প্রকাশ করেছেন ঠাকুর। জয় হোক ভগবান ব্রজানন্দ বুড়াশিবের। জয় হোক তাঁর মনীষানন্দ ও তাঁর ভূমানন্দমাঈর। স্বার্থক তাঁদের জন্ম। তাদের প্রনাম ক্ষমাপরানন্দের।

ঠাকুরের জন্মস্থান দর্শন

ভগবান ব্রজানন্দের জন্মস্থান দর্শনের জন্য শ্রীযুক্ত সুনীল পালধী মহাশয় আমাকে বলেন আমাকে যেন ভগবান ব্রজানন্দ নির্দ্দেশ করতে শুরু করেছেন মার্চ মাস থেকে আমি সেই সময় দেউন্দি গুপ্ত বৃন্দাবনের সকল ভক্তদের বলে এসেছিলাম যে ঠাকুর যদি আশীবাদ করেন তবে নিশ্চয়ই এর পর আমি ঠাকুরের জন্মস্থান দর্শন করেই আমার তীর্থ দর্শন শুরু করবো। ৫/৫/২০১৩ তাং সারকুলার টিকিট কেটে বেড়িয়ে পড়লাম।

কানপুর থেকে ৬/৫/২০১৩—টিকিট কাটলাম। ৯ নং প্ল্যাটফর্ম থেকে ট্রেনে উঠলাম ৪.২০ মিনিটে ট্রেন ছাড়লো। তারপর স্টেশনে নেমে চোখে জল এসে গেল যে হে ঠাকুর তোমার কি পরীক্ষা কোথায় তোমায় খুঁজবো এই ভারি ব্যাগ নিয়ে? ট্রেন লাইন পার হলাম এবং টেম্পো পেলাম, ভাড়া দশটাকা মাত্র। এসে পৌছোলাম, তারপর সোজা ব্রহ্মকুটী গঙ্গা ঘাট, দর্শন করলাম গঙ্গা আরতী, ঐ ভাড়ি ব্যাগটা যেখানে রেখেছিলাম, সেখান থেকে আবার টেম্পোতে উঠলাম, এক চমৎকার ঘটনা ঘটলো। হরিধাম না আসতেই টেম্পোয়ালা ইমলিকা নিচে হরিধাম বলে নামিয়ে দিলো ও পেয়ে গেল ফেরার সওয়ারী। ঐ খানে ব্যাগটা যেন মনে হচ্ছে তোলাই যাচ্ছে না। ঠাকুরকে শুধু জানালাম হে ঠাকুর, এসো আমার কাছে। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুমাঈয়ের রূপ ধরে যেন ঠাকুর আমার সামনে এসে পৌছলেন, এসেই বললো মহারাজ কোথায় যাবেন বললাম মাগো, যাবো আমি হরিধাম, উনি বললেন কেন যাবেন হরিধাম, আমি তখন বললাম যে ত্রিপুরানন্দজী আমার গুরুজীর পিতা, গুরুজীর জন্মস্থান দর্শন করার জন্য এসেছি। মাঈ বললেন আরে হরি ধামে কিছু পাবে না, আমরা যেখানে থাকি সেখানে ঐ রাজার বাড়ীর রাধুনি মাঈরা বংশানুক্রমে থাকে। আমাকে সোজাসুজি মঞ্জুমায়েদের বাড়ীতে নিয়ে গেল। রাত ৭টা বেজে গেছে। রাত কাটালাম। মাঈরা বললো যে-কাল সকালে সেই স্থানের গনেশ মন্দিরে নিয়ে যাবে ও গঙ্গায় স্নান করাবে ও ঠাকুরের জন্মস্থান দর্শন করাবে।

৭/৫/১৩ তাং এর সকালে গঙ্গাস্নান করার পর দেখা করলাম বিনায়ক শুকলের সঙ্গে যিনি বংশ পরম্পরায় পরিচিত। উনি জানালেন এবং ২৫০০ বছরের গনেশ মন্দিরের বর্ত্তমান পুরোহিত জানালেন যে তারা যতটুকু জানে তা হলো ত্রিপুরানন্দ মহারাজ বালককে নিয়ে দেশান্তর হয়েছেন। আমি যখন বললাম আমার ভগবান ব্রজানন্দই হচ্ছেন সেই বালক। ওনারা এও জানালেন যে এর জন্যই হয়তো এই পরিবারে এত ভাগে বিভক্ত হয়েছে।

সকাল ৭ টায় ব্রহ্মঘাটিতে গঙ্গাস্নান সেরে সব মন্দিরের দর্শনে গেলাম তারপর প্রাচীন শিব মন্দির দর্শন করলাম, পরে ভগবানের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখতে গেলাম। আমাকে শ্রীমান আলোক, দীক্ষা ও মঞ্জুমাঈ একেবারে গার্ড দিয়ে নিয়ে গেল।

আলোক ঠাকুরের জন্মস্থান দর্শনে আমাকে খুব সাহায্য করে, বুদ্ধিমান ছেলে ঠাকুরের জমির মাটিও এনে দিয়েছে। ঠাকুর ওর মঙ্গল হোক।

তিনদিন ঠাকুরের আশীবাদে কাটালাম বিম্বো আগরওয়ালার ধর্মশালায়।

সেদিন বেশকিছু ভক্তকে ঠাকুরের কথা শোনালাম ও ফটো দিলাম, ঠাকুর যেন সকলের দুঃখ কষ্ট দুর করেন। জয় ব্রজানন্দ, জয় গুরুজী জয় বুড়াশিব।

ওঁকারার স্তুতি

ক্ষমাপরানন্দ

ওঁ নমো শ্রী ভাগবতে জগৎগুরাচার্য্যও ব্রজানন্দও নমোঃ নমামি।
ওঁ ত্বংহি দেব দেব, মহাদেবও, মহেশ্বরাও
ওঁ ত্বংহি জগদীশ্বরাও বুড়াশিবাও নমোঃ ওঁ।
ওঁ ত্বংহি রামা, রহিম ত্বংহি দেবা, আল্লাহ ত্বংহি ও ও ও ওঁ।
ত্বংহি দেবী দেবী মহাদেবী মহাচণ্ডীও, মহাকালী ওঁ।
ত্বংহি নারায়ণায় ওঁ, মহালক্ষী ত্বংহি ওঁ।
ত্বংহি ওঁকারায় ওঁ প্রণাবায়ত্বংহি ওঁ।
ওঁ বাসুদেবাও, কেশবাও, গোপালাও, গোবিন্দাও চ জগন্নাথাও ওঁ।
ওঁ ত্বংহি বিদ্যাদেবী, রাধিকাওঁ সাবিত্রী ত্বংহি দেব, নারায়ণী ওঁ।
ওঁ পৃথিবীস্বহা, ওঁ অনন্তায় ওঁ, ওঁ সূর্যাও ওঁ, ওঁ বনাস্পতাও ওঁ,
ওঁ প্রাণাও ওঁ, ওঁ ভগতাও ওঁ, ওঁ স্বস্তিও ওঁ, ওঁ শান্তি স্বহাও ওঁ।
ওঁ নমো শ্রী ভাগবতে জগৎগুরাচার্য্যও ব্রজানন্দও নমোঃ নমামি।

ব্রহ্মচর্য্যয় কাশী ও বৃন্দাবন যাত্রা

কনৌজ থেকে কানপুরের এর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম স্নেহের আলোক ও দীক্ষাকে বিদায় জানিয়ে। ওদের মতন আমারও চোখের কোনে জল এসে গিয়েছিল। ওরা আমাকে টেম্পোতে তুলে দিল। স্টেশনে পৌঁছে ঠাকুরের কৃপায় WL Ticket টা VIP Quata য় Confirme এর জন্য আবেদন করলাম। AGM এর সঙ্গে দেখা করলাম আবেদন পত্রটি নিয়ে। কি আশ্চর্য, ভদ্রলোক শ্রীচর্তুবেদী বলে উঠলেন 'জয় ব্রজানন্দ'। আমি বললাম এ নাম আপনি কি করে জানলেন! শুধুই হাসলেন। বললেন মহারাজজী আপনি নিশ্চয়ই জানবেন। চিন্তাটা যে শুরুতেই চিন্তামনি গুরুমহারাজের চরণে জানিয়েছিলাম। শুধু যেন ওনার নির্দ্দেশেই আবেদনটা জমা দিয়েছিলাম। জয় ব্রজানন্দ আবার বললাম, ঠাকুরের চরণে আবার অন্তরের প্রণাম জানালাম।

সকাল ১০ টা ৩০ মিনিটের পর থেকে যে কি একটা পরীক্ষার পর পরীক্ষা চলছিল তা সত্যই স্বপ্ন আমার কাছে। ছায়ামাঈ লুচি ও আলুর শুকনো সবজি খাইয়েছিলেন আর সঙ্গে দিয়েও দিয়েছিলেন। যা কিনা ঠাকুরকে বার বার ভোগ নিবেদন করেছি এবং প্রসাদ গ্রহণ করি, দিন কেটে যায়। কাশী পৌছেই সোজা সৃঙ্গেরী মঠ। ঐ মঠ পরিচালক শ্রীমৎ মহাদেবানন্দের সঙ্গে দেখা হলো। সব জেনে বললেন যে 'আশ্রমে একা থাকার অনুমতি দেওয়া হয় না কিন্তু তোমার সব জেনে আমি অনুমতি দিলাম। কদিন থাকবে?' বললাম ৩ দিন ৩ রাত। উনি জানালেন ৩০০ টাকা দিন। রসিদ সঙ্গে সঙ্গে কেটে দিলেন। তবে বললেন বিদ্যুৎ থাকলে পাখা ও লাইট ব্যবহার করতে পারবেন। বিছানা ছিল না, বালিস ছিল না। চাদরও ছিল না। আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। তবে রাতে ঘড়ের তাপ মাত্রা ছিল ৪৮ থেকে ৪৯ ডিগ্রি। ঐ ঘড়টার বিশেষ একটা দিক আছে (১৮ নং)। সবচেয়ে বেশী গরম হাওয়া। প্রতিমামাঈ পরিচারিকা জানালেন যে সত্যই মহারাজ অন্য ঘর দিতে পারতো। ঐ রাতেই আমি একতলায় নেমে আসলাম। শোয়ার ব্যবস্থা করলাম নাট মন্দিরের সন্নিকটে। শুয়ে ঘুম আসছে না, ঠাকুরের নাম জপতে জপতে হঠাৎ দেখি, ঠাকুর আর আদি শঙ্করাচার্য্য যেন একই মনে হচ্ছে। কি এক অদ্ভুত দৃশ্য! এ আমার ভুল নয় তো। ঠাকুর যেন সেই ছোট বেলার মতন শুধু অহরহ বলছেন, "হরে ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে, গৌর হরি

বাসুদেব রাম নারায়ণ হরে।" "গুরু কা বাত হাতি কা দাত" একবার বের হলে সত্য হবেই। পরের দিন সকালে আমি যথারীতি ৫.১০ এর মধ্যে গঙ্গা স্নান সেরে বুড়াশিব বিশ্বনাথ দর্শনে বেড়িয়ে পরলাম।

আসতে আসতে প্রায় ১১টা। কারণ ঠাকুরের চরণ ও শ্রীশ্রী বুড়াশিব মাহাত্ম্য পাঠ করছিলাম বিশ্বনাথের মন্দিরে। অনেকে বুড়াশিব মাহাত্ম্য আস্বাদন করেছেন। অনেক দক্ষিণ ও উত্তর ভারতীয় ভক্তদেরকে ঠাকুরের ফটো বিতরণ করি। ঠাকুরই ব্যবস্থা করিয়েছেন। বিকালে গঙ্গাদেবীর আরতী দর্শন ও ভজনাঞ্জলী সিডি এবং শঙ্খ ধবনি, ওঁ নমঃ শিবায় ও নিত্যং পূর্ণং পরমাত্ম রূপম গান সমস্ত ধর্ম্মপরায়ন ভক্তমানুষেরা আস্বাদন করেছেন ঐ সংস্থাকে C.D. দুটোই দিয়ে এসেছি। খুবই আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছে ঐ 'গঙ্গা সেবা সমিতি'। দ্বিপ্রহরে প্রসাদ পেয়েছি ২ দিন অন্নপূর্ণা মন্দিরে। একদিন কিছুই খাই নি।

বারানসী থেকে ১২ তারিখে কানপুর ফেরার জন্য সৃঙ্গেরী মঠের মহারাজ মহাদেবানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, তিন দিন থাকলেন মহিমা কি বুঝলেন। কিছু চমৎকার কি ঘটলো? তখন আমি আমার প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের কিছু কিছু ঘটনা বললাম কিন্তু সব জানালাম না, যদি অন্য কিছু ভাবে। জিজ্ঞাসা করলেন, আদি শঙ্করাচার্য্যকে কি উপলব্ধি করলাম এবং আমার জগৎ গুরুর কি রূপ দর্শন করলাম? এও জানালেন কেন উনি আমাকে ঐ ১৮ নং রুমে থাকতে দিয়েছিলেন। আমি ও আমার মধ্যে যেন ১৮ বছরের তাজা যুবক জন্মায় এই ধর্ম্ম ও আদ্ধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করার জন্য। এও জানান ১৮ নং ঘরের একটা গৌড়ীয় মাহাত্ম্য আছে আমি যেন তা সম্পূর্ণ ভাবে অনুভব করি সমস্ত জীবনে।

বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে ঠাকুরের চরণ নিয়ে প্রবেশ করেছি প্রত্যহ। একদিন ঠাকুরের ফটো নিয়েও প্রবেশ করেছি। যেই সদর দরজা দিয়ে ঢুকতেই মন্দিরের প্রহরী বাহিনী আমাকে আটকে দিল। বলল যে বিশ্বনাথ মন্দিরে অন্য দেবতার ছবি নিয়ে প্রবেশ করা যায় না। তখন আমি শ্রীশ্রী বুড়াশিব মাহাত্ম্যটা খুলে দেখালাম। ঠাকুরকে ডাকছি ঠাকুর তোমাকে নিয়ে এই মন্দিরে প্রবেশ করাবই আশীর্বাদ কর। ঠাকুরের শিব গায়ত্রী মন্ত্রটা 'ওঁ হ্রীং নমঃ তত্ত্ব পুরুষায় বিদ্রমহে বুড়াশিবায় ব্রজানন্দায় মহাদেবায় ধীমহি তন্ব রুদ্র প্রচোদয়াৎ' পাঠ করতে শুরু করে দিলাম। বেশ জোড়ে জোড়ে নিঃশ্বাসের সঙ্গে চলছিল। সকলেই মহাদেবের এই মন্ত্রটাকে অন্যভাবে আস্বাদন

করছিলেন। ইতিমধ্যে Add SP officer আমার কাছে আসলেন। ফটোটা আর ঠাকুরের চরণ নিজে দেখলেন। আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন 'এই চরণ গুরুজী কোথায় ব্যবহার করেছিল? বললাম' বৃন্দাবনে এবং আমার মা সকল স্থানেই নিয়ে গেছেন, আমিও তাই করার চেষ্টা করছি। এবার আমার কাছে বাচ্চাছেলের মতন বললেন, যে আমার মাথায় ছুঁইয়ে দাও মহারাজ। সেইসঙ্গে নামটা যেন জপ করে দেই। সবই হল, ঠাকুরের নির্দ্দেশেই যেন সবাইকে বললেন Add SP সাহেব, "আর চেক করো না"। কি যেন বুড়াশিব ব্রজানন্দের এক অলৌকিক স্পর্শ তাদেরকে এই বিশ্বাস ও ভক্তির জগতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। 'জয় গুরু' 'জয়ব্রজানন্দ'।

দেউন্দিধামে কার্ত্তিক মাস

ঠাকুর ব্রহ্মানন্দকে যে প্রকৃত পরমেশ্বর বলে ভেবেছি এক অর্থে তা আবার যেন সত্য প্রমান হল। এই চা বাগানের ধামে কি মোহময়ী অপূর্ব কৈলাশপতি ও গোকুলপতি শ্রীগোবিন্দের লীলা তা যেভাবেই লিখিনা কেন তা সত্যই পূর্ণ প্রকাশ নয় যতক্ষণ নিজে এসে উপলব্ধি না করা যায়। তার উপর দয়াল ঠাকুরের 'আরতী' পরিবেশনের আশীর্বাদ। এ আমার জীবনে যেন ঠাকুরের প্রতিটি বিষয় পাওয়া ছাড়া খোয়ানোর কোনও ভয় নেই।

ঢাকায় পৌঁছই ১২ অক্টোবর ২০১৩ শনিবার অষ্টমীর দিন। নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশীর দিন, দেউন্দিতে আসব বাসে ঠিক হল। ঠাকুর যে আমাকে যেকোনও প্রকারে আনবে সেটাতেই আমার বিশ্বাস। দেউন্দির ভক্তরা অর্থাৎ অনন্ত বৈদ্যর পরিবারের লোকজন গাড়ি করে ঢাকা গেছেন ইটালির ভিসা করার জন্য। কুমার তাদেরকে বলেছেন যে আমি দেউন্দি যাবো এসেছি কলকাতা থেকে। দলে ছিলেন একজন মাঈ ও তিনজন ভক্ত। সবই তো ঠাকুরে নির্দিষ্ট করা ছিল আবার ঠাকুর তা বোঝালেন। ওনারা প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত করে ভিসার জন্য গেলেন ভিসা অফিসে। ইতিমধ্যে আমাদের কথোপকথন চিত্ত মহারাজের জ্ঞাত হল। আমাকে শুধু বললেন যে সাধুদের কারও জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয়। ঐ মাঈ বললেন আমরাই ওনাকে নিয়া যাব প্রথম সিলেট-ভ্রমণের পর ঐ মাঈকে আমি নাম দিয়েছি ধমক মাঈ। ভক্ত সঞ্জয়ের মা। বিষয়টি বাগানের সুনীলকে অবগত করা হয়েছিল কারণ মন্দিরে আমার প্রসাদ সময় মতন পাওয়া হবে না। যাই হোক্ ঠাকুরের কৃপায় ভিসা অফিসের কাজ খুবই তাড়াতাড়ি হল। ভাবাই যায় না। বুড়াশিবের কাছে আমি জানিয়েছিলাম যে যেন ঐ ভক্ত ও ভক্তার কাজ সত্ত্বর হয়। ওনাদের সঙ্গে রওনা হলাম, দেউন্দিতে সুনীলভাইয়ের ছেলেরা নিয়ে আসলো আমাকে।

খুব আনন্দ পেলাম মন্দিরে এসে। প্রসাদ পেলাম, সুনীল, আমোদ, গোলাপী মাঈ, সারথী আরও অনেকে। তারপর দিন সন্ধ্যার পর শ্রীমঙ্গলের এর দিদি স্মৃতিকণা মাঈ আসলেন। ফল্গু নদী অন্তঃসলিলা কেন? সীতার অভিশাপে। যখন রাম সীতা ও লক্ষণ

বনবাসে ছিলেন ১৪ বৎসর, তখন মহারাজ দশরথের মৃত্যু হয়। এবং সেই সময় রামের অনুপস্থিতে সীতার কাছে রাজা দশরথ পিন্ড গ্রহণ করতে আসেন ও সীতাও তাকে পিন্ডদান করেন। পরে রাম এলে সীতা তাকে সমস্ত কিছু বলেন। রাম তাকে জিজ্ঞাসা করেন তুমি যে পিন্ড দান করলে সাক্ষী কে আছে? সীতা বলেন তুলসী গাছ, ফল্গু নদী সাক্ষী আছে। কিন্তু রাম যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন তখন তারা তা অস্বীকার করেন। সীতা তখন ক্রোধান্বিত হন এবং ফল্গু নদী ও তুলসীগাছকে শাপ দেন। তুলসী গাছকে বলেন কুকুর তোমার গায়ে প্রসাব করবে। আর ফল্গু নদীকে শাপ দিয়েছিলেন তুমি অন্তঃসলিলা হয়ে থাকবে। তোমার উপরের জল সব শুকিয়ে যাবে, বালি খুঁড়ে জল পাবে মানুষ। শুধুমাত্র অক্ষয় বট সাক্ষী দিয়েছিল। তাই অক্ষয়বটের তলায় বিষ্ণুর পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে। সেই অক্ষয় বটই যেন দেউন্দি। তাই সকল কার্ত্তিকমাসের সাক্ষী হিসাবে এই বটতলাকেই আমার ভক্তি বিশ্বাস নিবেদন করি। কারণ আমার প্রাণেশ্বরের এখানে পদচিহ্ন আছে ও থাকবে যুগযুগ ধরে। এই স্মৃতিচারণ করি স্মৃতিকণা মাঈ ও অন্যান্য ভক্তদের নিকট।

১৪২১(২০১৪)-এর কার্তিক সংক্রান্তি উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

সাড়া কার্তিক মাস জুড়িয়া ভগবান ব্রজানন্দের নামে ভক্তদের দরজায় দরজায় হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া হবিষ্যি গ্রহণ করিয়াছি ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া। ভিক্ষার সাথী হিসাবে ছিলেন সঙ্গীত মাস্টার ফুলবাবুর বাবা। এবার আমাকে ঠাকুর গৈরিকে হৃদয় সাজিয়েছেন, সচ্চিদানন্দ মহারাজের কথা মতন ঠাকুরের বটতলা আসনেই এবারের সমস্ত পূজা আয়োজন করা হইয়াছে। ভক্তপ্রাণ বিশু ঐ স্থানটিকে সুন্দর হইতে আরও সুন্দরভাবে তৈরী করাইয়েছেন। বিশাল আকারের ঠাকুরের গোলকপতি ছবি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন পুনরায়। ঐ স্থানেই অধিবাস, মূল উৎসব ও বাসী উৎসব ও মহালুঠ আয়োজন করা হইয়াছিল। যাহা বর্ণনার ভাষা ক্ষমাপরানন্দের কখনও হইবে কিনা জানা নাই। এই উৎসবের জন্য যাহাদের কথা না লিখিলেই নয় তাহাদের কথা লিখিতেছি। মঙ্গল আরতির সময় যাহাদের ছাড়া কোনমতেই চলিত না তাহারা হইল পুত্রসম রূপম, মিন্টু, প্রিয়ন্ত, উজ্জ্বল, কান্তিলাল, বিকাশ ও আরও অনেকে। পদ্মামাঈ, চামেলীমাঈ, সুমীমাঈ, সিলেটের সীমামাঈ, শিল্পীমাঈ, গোলাপীমাঈ, তিলকামাঈ আরও অনেকে, সিলেটের রাজাবাবা অরুন, বরুন ও দেউন্দির আমোদ, সুনীল, দীনেশ, ফুলবাবু ও শ্রী আচার্য্য।

দেউন্দি বাগানে কার্ত্তিকের অধিবাস

কার্ত্তিক সংক্রান্তির উৎসবের অধিবাসের দিনের ঘটনা।

সন্ধ্যা আরতি ও মঙ্গল আরতির দায়িত্ব ঠাকুর যেন আমার উপর ন্যস্ত করল।

সন্ধ্যাদীপ কার্ত্তিক মাস ও রাধা দামোদর মাস সম্পর্কে আলোচনা শুরু হল। আমি শুরু করলাম বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে ঠাকুরের আশীর্বাদে। পাঁচটা প্রদীপ জ্বালাতে বললাম। ১। শ্রীগুরুর পাদপদ্মে ২। আকাশকে ৩। পাতালে ৪। সমুদ্রকে স্মরণ করে ৫। সমস্ত পিতৃ-পুরুষদের জন্য পূনঃরায় শ্রীগুরু পাদপদ্মে। কি চমৎকার সে আলোচনা সভা।

যাই হোক, পরদিন ভোর সাড়ে চারটের মধ্যে স্নান শেষ করে মঙ্গল আরতী শুরু করলাম। তারপর স্মৃতিকণা দিদি ধূনাটা নিয়া নামকীর্ত্তণ পরিক্রমা করতে শুরু করলেন এবং প্রথমে লুট দেওয়া হল বটতলায়। খুব আনন্দ উপভোগ করলাম। তার পর দুই ঘরে লুট হল। অপূর্ব সে দৃশ্য ও অনুভূতি যা ভোলার নয়। তার পর দিন স্মৃতিকণা মাঈ — শ্রীমা চলে গেলেন। কারণ ওনার আত্মীয়-স্বজন আসবেন এবং সংসারটাকে যে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে। ঠাকুর যে তাকে অনেকভাবেই পরীক্ষা করেছেন। পুড়িয়ে যেন খাটি সোনা বানাচ্ছেন। একমাত্র সন্তানকে হঠাৎ ঠাকুর তার চরণে নিয়ে নিয়েছেন কিছুদিন পূর্বে। তবুও তিনি ভেঙে পরেননি। ঠাকুরকে যেন বলেন, ঠাকুর আর কত দুঃখ দেবে। আর কত পরীক্ষা করবে আর কতই বা পুড়িয়ে দেখবে যে আমি খাঁটি আছি কিনা। পরদিন থেকে ঠাকুর আমাকে আরও বড় দায়িত্ব দিলেন। সেটা হলো ধূনুচী নিয়ে আমাকে ভক্তদের বাড়িতে যেতে হল। তারা আমাকে শ্রদ্ধাপূর্বক তাদের গৃহের মন্দিরে সমাদরের সহিত নিয়ে গেলেন লুটের জন্য। এখানে বলানন্দ মহারাজকে স্মরণে এল আমাদের বাড়ির উৎসবে। শেষে মহারাজ হাতে থালি নিয়ে লুটের গান করতে করতে লুট দিতেন। থালির সব মিষ্টি ও বাতাসা ইত্যাদি আর আমি খুব লুট ধরতাম। এখানে ঠিক তা বিপরীত। লুট দেওয়ালেন ঠাকুর আমাকে দিয়ে। আর সেদিনের আমি যেন ঐ সকল বালকদের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছি। কি অপূর্ব দৃশ্য। ঠাকুর এ যে এক অপূর্ব স্মরণীয় আমার জীবনে। তোমার অসীম কৃপা ও দয়া এই ক্ষমাপরানন্দের উপর, আমি ধন্য ঠাকুর। যেদিন থেকে শুরু হল আমার ঠাকুর সেবা করার সুযোগ, ঠাকুরই সব করিয়েছেন।

২৭শে অক্টোবর ২০১৩

'সন টিলায় ঠাকুরের লুট'

পূর্ব রাত হতেই ঠাকুরের নাম জপ্ করছি আর ঠাকুরের কাছে জানাচ্ছি "হে ভগবান ব্রজানন্দ" তুমি তোমার ক্ষমাপরানন্দকে-তোমারি নির্দেশ মতন সমস্ত কর্ম করিয়ে নাও। যার জন্য তুমি এই দেউন্দি বটতলা গুপ্ত বৃন্দাবন ব্রজানন্দ ধামে নিয়ে এসেছ। যত কঠিনই হউকনা কেন তোমার এই দীক্ষিত সন্তানকে সম্পূর্ণভাবে সমস্ত কর্ম সম্পাদন করিও। সেই রাত। অর্থাৎ ২৬শে অক্টোবর ২০১৩। সারারাতই ঠাকুরের নাম করে অতিবাহিত করেছি। কি অপূর্ব এক অনুভূতি যাহা প্রকাশ করে কুলাতে পারবনা। যেমন, দেউন্দির ভক্তদের ভক্তি। ছোট ছোট বালক ব্রজরাজরা, সমস্ত দেউন্দির তোমারই নামে যেন এক ভক্তির সমুদ্র সৃষ্টি করেছে। যারা এই দৃশ্য দেখেছে তার অভিভূত। ব্রজানন্দের মধুময় নামে স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর রূপ আনন্দ উপভোগ করতে পারে। রাত ৩ ঘটিকা হতে আমি প্রিয়ন্ত ও অন্যান্য যুবকদের ঘুম থেকে ডেকে তুললাম। প্রত্যেকেই উঠিয়া ঘরেঘরে নিজ নিজ কর্ম সম্পাদন করে মন্দির গর্ভগৃহে আসল। এদিকে ভক্ত রূপম ও কীর্তনিয়া ফুলবাবু এবং উজ্জল ও অন্যান্য ভক্তরা ধীরে ধীরে এসে উপস্থিত হল মন্দির প্রাঙ্গনে। ধীরে ধীরে ভক্তদের সমাগম বৃদ্ধি পেল। নগরকীর্তন সনটিলার বেলতলে পৌছাল। স্বয়ং ভগবান ঐ-বেলতলাতেই বসে সমস্ত ভক্তদের আশির্বাদ করতেন শুনেছি ভক্ত শান্তপ্রসাদের মুখে। আজ মনে হল সত্যিসত্যি ঠাকুর বেলতলাতেই প্রকৃতপক্ষে বিরাজমান। ঐখানে লুট শুরু হল প্রথম ভক্ত সমাগমে চর্তুদিক মুখরিত হতেছে — "হরে ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে। গৌর হরি বাসুদেব, রাম নারায়ণ হরে" সার্থক ভক্ত ও ভগবানের প্রেম। ঠাকুর হতে শুনেছিলাম ভগবান ব্রজানন্দের লুটে কথার পরিভাষা। শিষ্য ভক্তদের প্রেম ভক্তি ও নাম সংকীর্তন ষোল আনা পরিপুর্ণ হয় তখন যখন ভগবান ব্রজানন্দ স্বয়ং লুট বিতরন করেন। ওনার তারকব্রহ্ম নামের। ভাগ্যক্রমে সেই লুটের প্রসাদ যারা পায় তাদের প্রাপ্তি যোগ ঘটে ভগবান ব্রজানন্দের নামে। যারা পায়না তারা পূনঃ অপেক্ষায় থাকে। ঠাকুরের প্রেম ভক্তি লাভ করার জন্য। এই ভাবে শুধু লক্ষ্য করলাম সমস্ত লুট ধীরে ধীরে সমাপ্ত হল। যারা লুট দিচ্ছেন তারা এই ক্ষমাপরানন্দকে ঠাকুরের প্রতিনিধি হিসেবেই বরণ করে নিতেছিলেন। তাইতো ক্ষমাপরানন্দ ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানাইতেছে হে ভগবান ব্রজানন্দ তুমি অসীম করুনাময়। তোমার এরূপ কৃপা সকল ভক্তবৃন্দকে বর্ষণ কর।

৩রা নভেম্বর ২০১৩
রঘুনন্দন ঠাকুরের লুট

৩রা নভেম্বর রবিবার ছিল। আমরা মন্দির থেকে রঘুনন্দনের উদ্দেশে রওনা হলাম। প্রতিদিনের মতই ঠাকুরকে বললাম সঙ্গে তুমি চল তোমার ক্ষমাপরানন্দ যেন সমস্ত তোমার নির্দিষ্টভাবে কাজগুলো সুসম্পন্য করতে পারি নজর দিও। রঘুনন্দনের প্রায় ৭৫ ঘর, প্রথমে জ্যোর্তিময় দত্তের বাড়িতে লুট নেওয়ার জন্য গেলাম। অপূর্ব সেই অনুভূতি ভগবান ব্রজানন্দের কৃপায় যে বাড়িতে যাচ্ছি প্রত্যেকেই ঠাকুরের প্রতিনিধি হিসেবে ভগবান ব্রজানন্দের দূত মনে করে চরণ ধোয়ানো ও ধুপ দেখানো ও গৃহে ভগবান রূপে আপ্যায়ন করেছে। সরল সহজভাবে বসবাস করা ভক্তবৃন্দদের মাধ্যমে ভগবান ব্রজানন্দ আমাকে যেন ব্রহ্মচর্যের শিক্ষা দিচ্ছিলেন এবং পরীক্ষা নিচ্ছিলেন জানিনা উত্তীর্ণ হতে পারলাম কিনা। কার্তিক মাসের সমস্ত পরিক্রমাটাই ছিল পদব্রজে। কি কঠিন আর অপূর্ব মধুময় ছিল এই সারা কার্তিক মাসটা, ভগবান ব্রজানন্দের প্রতিদিনের মঙ্গল আরতীতে নতুনভাবে জানতে পেরেছি নগর কীর্তনগুলো শেষে স্বর্গীয় সুখ ও ঈশ্বর চিন্তার দিক আমার কাছে মধুময় যা আমি কোনদিনও ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমার যারা সঙ্গীসাথী ছিল তাঁরা ভাবতে পারেনি এত আনন্দ হতে পারে ভগবান ব্রজানন্দের নগর কীর্তনের। এই নগর কীর্তনে যারা ছিল তাদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করলাম। সুনীল বিশ্বাস তাঁর স্ত্রী তার ভগ্নী তাঁর পুত্র দুলন। আমোদ ও তাঁর মেজো ছেলে রূপম কীর্তনীয়াদের মধ্যে খুব মনে পড়ে ছোট ছোট সন্তান স্বরূপ ভক্তবৃন্দ। আমার নাম দেওয়া মিঠাইলাল আসল নাম কান্তি। নয়ন, রাজেস, প্রিয়ন্ত, অমিয়, শিমুল, মিন্টু, বিজিত, কানন, স্নেহের সারথি, সুমি, উর্মি। আর খুব কম হলে পরে দেড়হাজার ভক্ত ও শিষ্যোবৃন্দ ছিল কার কথা বলি আর কার কথা ফেলি। বারবার ভগবান ব্রজানন্দকে স্মরণ করেছি আর শুধু জানিয়েছি, দয়াল তোমার করুণা এবং তোমার এই আনন্দ আমার এই জীবনে সত্যই তুমি আমাকে যার জন্য আজ ক্ষমাপরানন্দ নামে রূপান্তরিত করেছ। প্রতিদিনই ভগবান ব্রজানন্দ যেন সমস্ত ভক্তবৃন্দের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। আমি আগে সমস্ত ভক্তপ্রাণ মিত্রদের জানিয়েছি, যে বৃন্দাবনের ঠাকুরের সান্নিধ্যে ১৫টা জন্মের তপস্যার ফল ছিল। ভগবান তখন অনেক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, "বাবা! সময় হলেই তুমি ঠিক বুজবা, তখন আউজকার কথাগুলি তুমি বুজবা।"

৪ঠা নভেম্বর-২০১৩

"গিলানীতে ঠাকুরের লুট"

লুটের দিন গিলানী নগর কীর্তন নিয়ে ঠাকুর রওয়ানা করালেন প্রতিদিনের মত আজ ঠাকুরকে জানালাম ঠাকুর তুমি সঙ্গে চল। ভক্তের মাঝে তুমি না থাকলে ভক্তমন্ডলী অসম্পূর্ণ হয়। দুর্গা মন্ডপে পৌছোলাম প্রায় দেড়-দু হাজার ভক্ত এইরূপ চিত্র কারো চোখে পরেছে বলিয়া আমার জানা নেই। ঠাকুর যে এই গুপ্ত বৃন্দাবন নাম দিয়েছে তা এক কথায় ভগবান ব্রজানন্দের করুনা ছাড়া আর কিছু না। দেউন্দি বাগানে এসে এই সকল তীর্থস্থানগুলো দর্শন না করলে ঠাকুরের সমস্ত মন্দির অসমাপ্ত ও অসম্পূর্ণ হয়। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস কারণ ভক্ত যেখানে ঠাকুর সেখানে। ঠাকুর বার বার বলেছেন। যেখানে ভক্তের এত চল সেখানে ভগবান না এসে পারেনা। ভগবান কে অনুভব করতে হলে একবারের জন্য দেউন্দি গুপ্ত বৃন্দাবন ধামে আসতে হয়। ভগবান যে স্বয়ং সম্পূর্ণ এই স্থানে মিলেমিশে যেন এক হয়েছে। এখানেই যেন ভগবান ব্রজানন্দ বসে ছিলেন। উনি এখানে বসে সকল ভক্ত শিষ্যদের প্রতি নিয়ত আশির্বাদ করিতেছেন। "ওঁ শান্তি" "ওঁ শান্তি" "ওঁ শান্তি" আয়ুষ্মান ভব। "দির্ঘজীবী হউ" "বিদ্যান হউ" "বিদূশি হউ" "শান্তিময় হউ" "জয় শম্ভু" "জয় শম্ভু" "জয় শম্ভু" "জয় জয়" "জয় জয়" "জয় জয়" "জয় ব্রজানন্দ" "জয় ব্রজানন্দ" "জয় ব্রজানন্দ" ইত্যাদি আশির্বাদের বাণী সকলকেই বর্ষণ করছেন স্থান কাল পাত্র বিশেষে। উনার কথা আজও মনে পড়ে "বাবা গুরু কা বাত হাতি কা দাঁত" এক দফে নিকেল নেসে বাপস্ নেহি হতা" তার বাবা সব হাতির দাঁত বেরয় না। তেমনি সব গুরুর কথা একবাক্যেই ফলে না। তাইতো বলি, "হে ভগবান ব্রজানন্দ তুমি এই ক্ষমাপরানন্দের প্রার্থনা গ্রহণ কর। সমস্ত দেউন্দির ভক্তদের মত তুমি সকল ধামেই বেশি করে আরও ভক্ত তৈরি কর।

যারা তোমার নাম পৃথিবী ব্যাপীয়া ছড়াইয়া দিবে। দেউন্দির সমস্ত কর্ সেবকরা প্রকৃত অর্থেই তোমার বাণী স্মরণ করিয়ে দেয়, গুরু সেবা করা যা-তা নয়। এই সকল ভক্তদের সকল প্রকার ডাক তুমি নিশ্চয় শুনবে যেন তারা কখনই কোন দিন তোমার আশীর্বাদ হতে বঞ্চিত না হয় আমার এই প্রার্থনা। তোমার জয় হউক

ঠাকুর। পৃথিবীর সকল ভক্তদের জয় জয়কার কর তুমি সকল সময় তাদের সঙ্গে থাকো তোমার ভক্তদের যেন কখনই তোমার নামে অভিযোগ না থাকে। তোমার কৃপা সবসময় তাদের বর্ষণ কর। হে দিন দুনিয়ার মালিক, হে কাঙ্গাল ঠাকুর, হে গোলোক প্রতি, হে গকুলেশ্বর, হে বুড়াশিব; তুমি তোমার স্বহৃদয় অভয় দান কর সকল ভক্তদেরকে। জয় হউক তোমার, জয় হউক বুড়াশিব ব্রজানন্দের। এরপর আমরা কাশবন নামক স্থানে নাম, সংকীর্তন সহ নগর কীর্তনে প্রবেশ করলাম। সূর্য তখন মাথার উপরে। কি আশ্চর্য তখনও নগর সংকীর্তনের সমাপ্তি ঘোষণা করেনি ভগবান ব্রজানন্দ। সাতচল্লিশ মাঈয়েরা একত্রিত হয়ে লুটের সামগ্রী একটি বিশাল জায়গায় সাজিয়ে রেখেছে। অপেক্ষা শুধু ভগবান ব্রজানন্দের প্রতিনিধির জন্য। যাহাতক প্রতিনিধির প্রবেশ উক্ত স্থানে সাতচল্লিশটি পরিবারের সকল আবাল, বৃদ্ধ-বনিতা উচ্চকণ্ঠে 'জয় ব্রজানন্দ' বলে ওঠে। গোপালদের উপচে পরা ভিড়ে কখন যে ক্ষমাপরানন্দ হারিয়ে গেছে ভগবান ব্রজানন্দের বরণে তা একেবারে বোঝা গেল না। সম্বিত ফেরা মাত্রই বুঝলাম এ যেন অসাধ্য সাধন করতে হবে এ যেন ভগবান ব্রজানন্দের নির্দেশ। কারণ একটি গৃহস্থের ঘরেই লুট গেলে কমপক্ষে ১৫ মিনিট প্রয়োজন হয়ে থাকে। যে স্থানের সাতচল্লিশটি পরিবারের একত্রিত লুটের সামগ্রি লুট দেয়া কি অসম্ভব তা কেউ না দেখলে বোঝানো মুসকিল। এবং তাদের ভক্তি বিশ্বাস আমাকে চালিত করেছে। ঐ অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য প্রতিটি মুহূর্তই ভগবান ব্রজানন্দকে স্মরণ করে নিজেকে ধন্য ভাবতে ছিলাম। যা বহু জন্মের কৃত কর্মের ফল যা প্রকৃত অর্থ নাম সুকৃত্তি। এর পর আমরা ২ : ২০ মিনিটে দেউন্দি গুপ্ত বৃন্দাবন ব্রজানন্দ ধামে ফিরে আসলাম। আজ পর্যন্ত জীবনে ভগবান ব্রজানন্দের নামে এইরূপ ভক্ত সমাগম দেখি নি। বললে মিথ্যা কথা বলা হবে না।

আমি-আমার পূর্বজন্মের সঞ্চিত কর্মফল যা কিনা ভাগ্য বলে উদ্ধৃত আছে "মিত্রলাভে" আমিও সেই ভাগ্যবান পুরুষ বলে নয়নাশ্রুর অঞ্চ লই আমার একমাত্র ভগবান বুড়াশিব ব্রজানন্দর শ্রীচরণে শিব ও কৃষ্ণ স্বরূপে নিবেদন করছি আর বলি অন্তর হতে, হে দয়াল ঠাকুর তোমার করুনা, কৃপা ও দয়া আমার জীবনে এরূপভাবে বর্ষণ কর যাতে আমি তোমার নাম সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া মানুষকে জানাতে পারি। আমার এই বিশ্বাসে কোন দিন ফাটল ধরাবে না। গুপ্ত বৃন্দাবনে কার্ত্তিক মাসে যদি তোমার অসীম করুনা আমার উপর না বর্ষন করতে তবে হয়তো

ক্ষমাপরানন্দের জীবন পূর্ণ হত না। তোমার নিত্যদিনের সেবা পূজার মধ্যে নিজেকে সেবায়িত হিসেবে তৈরী করতে পারতাম না। মধ্যাহ্নের ভোগরাগ গ্রহণ করে, সন্ধ্যা-আরতির জন্য তৈরী হলাম। আলোচনা সভার, বিষয়-ঠাকুরের "তারক ব্রহ্মনাম" আলোচনার সময় সন্ধ্যা আরতির পরে অপূর্ব সে এক সভা ছিল। ঠাকুর যে এইভাবে বিষয়টি সকলের সামনে বিশ্লেষণ করবেন তা আমি মহামূল্যবান পুস্তকটি প্রকাশের সময়েও বুঝতে পারি নি। ঠাকুর স্বয়ং নিজেই এসে সম্পূর্ণ বিস্তারিত "তারক ব্রহ্মনামের" সঠিক অর্থ এবং কিরূপে "হরে ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে, গৌর হরি বাসুদেব রাম নারায়ণ হরে" এই তারক ব্রহ্ম যে সুন্দর হতে আরও সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করলেন সকল ভক্তবৃন্দ ও শিষ্যবৃন্দের মাঝে ক্ষমাপরানন্দ শুধুই শিখন্ডিরূপে উপস্থিত ছিল বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস যাহা আজীবন স্মরণে থাকিবে। যতবারই এই ঠাকুরের তারক ব্রহ্মনাম ও ব্রজানন্দ স্মরণম এই পুস্তকটি আলোচনা হয়েছে এই দেউন্দি বটতলা গুপ্ত বৃন্দাবন ব্রজানন্দ ধামে ততবারই যেন এক একভাবে সমস্ত ভক্তদের বুঝিয়েছে অনুভূতি ও অনুভবসহ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত স্বীকার করছে।

লুট প্রায় শেষের দিকে। দিবস শুক্রবার, তারিখ-১৫/১১/২০১৩ সকল গৃহস্থের বাড়ি শেষ হওয়ার পর আশ্রমে ফিরে আসলাম। লুট শুরু হয়েছিল উজ্জল দাসের বাড়ি হতে, শেষ হল ধামে এসে, সকল ভক্তবৃন্দের জন্য পৃথিবী ব্যাপিয়া যে যেখানে আছে ভক্তরা ও শিষ্যেরা লুট সাজিয়েছিল এই দেউন্দি গুপ্ত বৃন্দাবন ধামে। লুট দেওয়ার পূর্বে ক্ষমাপরানন্দ তার দামোদর মাসের অভিজ্ঞতা অভিব্যাক্তির বহিঃপ্রকাশ করেছিল, কোন সময় যে আকাশ ভেঙে ভক্তদের নয়ন অশ্রুতে ব্রজানন্দধাম ভাসিয়ে দিল তা বুঝবার জো ছিল না। আমর মনে পড়ে ভারতবর্ষের বৃন্দাবন ধাম হতে যখন এই ক্ষমাপরানন্দ সাংসারিক জীবনে ছিল তখন সে বৃন্দাবনে গিয়েছিল ১৯৭৫ সনে। ঠাকুর তার খোকন বাবাকে বিদায় দিয়েছিল। দুই বাহুতে জড়িয়ে চোখের জলে সেদিনের দৃশ্য ক্ষমাপরানন্দ জীবনেও ভুলতে পারবেন না। একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটল এই দেউন্দি ব্রজানন্দ ধামে, যা বহিঃপ্রকাশ করা অসম্ভব বলে উপস্থিত সকল ভক্তবৃন্দের বিশ্বাস।

কার্ত্তিক সংক্রান্তির অনুষ্ঠান শুরু হল কি অপূর্ব অনুভূতি, ভাবাই যায় না।

এ যেন কোন এক বিশাল যজ্ঞের শুরু, দ্বাদশ মাসের প্রদীপ প্রজ্বলিত করা হল। শেষের প্রদীপ হল 'কার্ত্তিক' এর নামে। সকলেই মনে প্রাণে 'কার্ত্তিক' এর বিদায়টা মেনে নিতে পারছে না, যেমন দশমীকে মেনে নেওয়া খুব কঠিন। তবুও মানতে হবে। শুধু বলা হলো হে দামোদর, হে কার্তিকেয় তুমি আমাদের মধ্যে বৎসরে মধ্যমণি হয়ে এসো। তুমি একমাত্র ভক্তের মান। ধন্য তুমি তোমার দিনগুলতেই আমরা ভগবৎ বিশেষভাবে নিজেদেরকে ঠাকুর ব্রজানন্দের শ্রীপাদপদ্ম সেবার বিশেষ সুযোগ পাই ধন্য তুমি, তুমি আমাদের নূতন ভাবে আমাদের বাঁচার স্বপ্ন দেখাও ভগবৎ চিন্তায় ও মননে।

শুরু হল পরের অনুষ্ঠান ভজন সম্বন্ধে আলোচনা, আমার সঙ্গে রূপম সঙ্গীতের মাধ্যমে রূপদান করল আর দোলন দোলা দিল তালের মাধ্যমে। সকলেই জানালো যে মহারাজ এসে স্বর্গের আনন্দকে ব্রজানন্দ মর্ত্তে নিয়ে এসেছেন আপনার আলোচনার মাধ্যমে। 'আল্লা' আর ভগবান ব্রজানন্দকে মিলে মিশিয়ে একাকার করে দিয়েছেন। অনুষ্ঠানের শেষে ঠিক যে-কে কি বলছে খানিকক্ষণ বুঝতে পারছিলাম না। তারপর যেন মনে হ'ল কি যে সকলে বলছে এ কি সত্য? আমার ঠাকুরকে শুধু নয়নাশ্রুতে জানালাম 'কি যে তুমি করতে চাও এই ক্ষমাপরানন্দকে দিয়ে জানিনা, জয় গুরু জয় ব্রজানন্দ'।

পরের দিন আলোচনা 'ঠাকুরের তারক ব্রহ্মনাম' শুরু হল। শরীরে আমার ১০৪ জ্বর, ঠাকুরকে জানালাম। ঠাকুর সবই তোমার খেলা, খেলাও তুমি আর শুধু তোমার খেলায় যেন তুমি আমাকে খেলিয়ে নিতে পার। খেলাও আমায় খেলাও। ভক্তমন্ডলিকে এবং সকল গুরুভাইবোনদের জানিয়ে রাখি, একটি অক্ষরও মিথ্যা লিখছি না। বা আগামীতেও লিখব না বলে ঠাকুরের কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

অনেক রাত হয়ে গেল সকলের কেমন লাগল, তা জানালে তো আমার অহঙ্কার বাড়বে বৈ কমবে না, থাকুক সে কথা। ঠাকুরের কথা যেন ঠাকুর সকলের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন এই বিশ্বাস যেন আমার থাকে।

এবার মূল উৎসব। কি অপূর্ব, কত ভক্ত আমার জীবনে এটা প্রথম দর্শন হাজার হাজার ভক্ত শিষ্যে ভীড় যে দেউন্দি বটতলা গুপ্ত বৃন্দাবনে এক নব

কুম্ভমেলায় পরিণত হয়েছিল শুধু এতটুকুই লিখতে পারলাম। ঠাকুর যেন সকলের মাঝেই ঘোরাফেরা করছেন। ঠিক যেন কলকাতার এভারগ্রীন বা মহম্মদ আলী পার্কের দুর্গাপুজার ভীড়কেও হার মানিয়ে এগিয়ে যায় দেউন্দির জনারণ্য ভগবান ব্রজানন্দের।

বড় খেলার মাঠটায় প্রসাদ দেওয়ার জন্য যে স্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেখানে খুব নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে ব্রজানন্দ মহাপ্রভুর প্রসাদ গ্রহণ করছেন সকল ভক্তরা।

আসল কথা স্বর্গটা নেমে এসেছে দেউন্দি গুপ্ত বৃন্দাবন ব্রজানন্দ ধামে। এই আনন্দকে লিখে প্রকাশ করার কোন ভাষাই আমার মতন এক সামান্য ঠাকুরে শিষ্যের পক্ষে সম্ভবই নয়। আমি এ বিষয়ে অতিব ক্ষুদ্র থেকেও ক্ষুদ্র অণু বলা চলে।

দেউন্দিতে না আসলে ঈশ্বরপ্রেম, ভক্তি, ভগবৎ প্রেম, ভগবানের আশীর্বাদ কি জানতেই পারতাম না। এই ব্রহ্মচর্য্য জীবন আমার ধন্য, ঠাকুর যে আমার পরম দয়াল তাইতো তারই সবকিছু এই দান আমাকে আগামী দিনে পথ চলতে শেখাবে। এরপর আমি এক সপ্তাহের জন্য ব্রাহ্মণডুড়া যাই। ঠাকুরের পরমভক্ত যীশু আমাকে দেউন্দি এসে নিয়ে গেল। ওখানে যে আমার আর এক মা আছেন নাম তার প্রেমময়ী মা, তিনি ভগবান ব্রজানন্দের সাধিকা ও সন্ন্যাসী, হরিহরানন্দ মহারাজের থেকে সন্ন্যাস নিয়েছেন। তিনি আমারই অপেক্ষায় দিন গুনছেন কখন তার কাছে যাব আমারও মন কাঁদছে যে তার জন্য। অবশেষে দেউন্দি থেকে যেন ছুটি নিলাম এক সপ্তাহের ব্রাহ্মণডুড়ার জন্য।

দেউন্দির উৎসব হলেই যাঁদের কথা স্মরণে রাখতে হয়, নাহলেই উৎসব করা সম্ভবই নয় তাঁরা হলেন রূপম, উজ্জ্বল, দোলন, মিন্টু, প্রিয়ন্ত, বিকাশ, হরিপ্রসাদ, কিরণ, মায়েদের মধ্যে পদ্মা, চামেলী, সুমী, রাধারাণী, তিলকা, ও গোলাপী মাঈ। ভক্ত আমোদ, সুনীল, দীনেশ ও শ্রীযুক্ত আচার্য্য মহাশয়দের নাম উল্লেখযোগ্য। সিলেটের ভক্ত রাজাবাবু অরুণ, বরুণ, সীমা, তিন্নি, মিত্রা ও শিল্পী মায়েদের কথা ভোলার নয়। নামগুলি মনে আসছে না বলে লিখতে পারলাম না। তাই দুঃখিত।

ব্রাহ্মণডুড়ার কথা

যীশু আমাকে ব্রাহ্মণডুড়ায় নিয়ে গেল, এ যেন আর এক স্বর্গ, মায়ের স্বর্গ, — উলুধ্বনি দিয়ে আমাকে বরণ করে নিল। মা আমাকে দেখেই বললো "কি বাবা তোমার মারে মনে পড়লো, তোমার লিগা বইয়া আসি পথ চাইয়া" সবটাই সিলেটি ভাষায়। আমাকেও কিছুটা সিলেটি টান বা ভাষা শিখতে হচ্ছে।

প্রথম দিন ঃ—

যীশু ওর দাদার বাড়িতে নিয়ে গেল। উনি ঠাকুরের সান্ধ্যকালীন নামকৃর্ত্তন দিয়েছিলেন মানিক চৌধুরী লেখা কিছু গান পরিবেশন করলেন। অপূর্ব কণ্ঠ কিন্তু এত পান খায় সে যে সমস্ত গানের অক্ষর বোঝা যায় নি। তবুও ঐ দুখানা গান ভিডিও করে ওয়েবসাইটে দিয়েছি সঙ্গে পন্ডিতজীর একটা গান দিয়েছি। পন্ডিত এককালে খুব ভাল গায়ক ও গানের মাষ্টার ছিলেন যে তা এখনও না বললেও বুঝে নেওয়া যায়।

প্রতিদিন সকাল বিকেল ঠাকুরের শিষ্য ভক্তদের বাড়িতে যীশু আমাকে নিয়ে গেছে। খুবই আনন্দ উপভোগ করছি এ যেন ঠাকুরের আর এক করুনা, কি ভাবে যে ব্রহ্মচর্য্য ঠাকুর করিয়ে নিচ্ছেন সে ঠাকুরই জানেন। ঠাকুর আমাকে জ্ঞান, প্রেম ও বৈরাগ্যে নিয়ে যাচ্ছেন সে বুঝতে পারছি এক নূতন ভক্তি সাগরে ভাসিয়ে যেন ভাগবতে প্রবেশ করাচ্ছেন। যা কিনা সকল বেদ ও গীতার এক মিশ্রন যেন সম্পূর্ণ অর্থে ভগবান ব্রজানন্দের 'অর্ঘ্যম' কে পুনরায় নবকলেবরে পরিচিতি লাভ করাচ্ছেন হৃদয় মাঝে যেন বলে উঠছে

শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ, হরে মুরারে,
হে নাথ ব্রজানন্দ, তুমি বাসুদেবায়
তুমি রাম, গৌর তুমি, তুমি নারায়ণায়
হে নাথ ব্রজানন্দ তুমি মোর প্রাণায়।।

যীশুর সঙ্গে ওর বোনের বাড়ি গেলাম খুব আনন্দ হল। ঠাকুরকে ভোগ রাগ ও স্মরণ করার মধ্যেই কিভাবে দুটো দিন কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। আবার ব্রাহ্মণডুড়ায় ফিরে এলাম। পুনঃরায় সকল ভক্তদের বাড়িতে নিয়ে গেল যীশু। এক

ভক্ত মাঈ হঠাৎ করে পুকুরে স্নান করতে করতে প্রায় দৌড়ে এসে আমাকে ভক্তি নিবেদন করল। ও কাঁদতে লাগল। যীশু বলল ঐ মাঈর কোন সন্তান হয় নি। তাই খুব কষ্ট তার। ঠাকুরের ভোগের প্রসাদ ও আর কিছু কাজ করতে বললাম ঐ মাঈকে। ঠাকুরকে জানাচ্ছি যে হে গোপাল গোবিন্দ বুড়াশিব ব্রজানন্দ ঐ-মাঈর কোলে তুমি সন্তান হয়ে নইলে আসো ঠাকুর ওনার কষ্ট লাঘব কর। ওকে সন্তানের মা করো হে ঠাকুর।

যেটা বলা হয়নি যখন ব্রাহ্মণডুড়া মন্দিরের তৃতীয় দিনে প্রেমময়ী মাঈর শরীর খুবই খারাপ হয়ে গেছিল। সকলেই বলেছিল আর থাকবেন না, এবার মুক্তি পাবেন, আমার হয়তো আর তার থেকে সন্ন্যাস নেওয়া হবে না। ঠাকুরকে শুধু জানিয়েছি, আর ব্রহ্মমন্ত্র জপ করেছি। বলেছি হে ঠাকুর ব্রজানন্দ, প্রাণনাথ তুমি তোমার ক্ষমাপরানন্দকে প্রেমময়ীর মাধ্যমে সন্ন্যাস প্রদান করো।

সকলে মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিলাম একটু ভাল না হওয়া পর্যন্ত আমি যেন দেউন্দি না যাই আর গৌরিক বস্ত্র যেন প্রেমময়ীর হাত থেকে গ্রহণ করি। ঠিক তাই করলাম ২৫, নভেম্বর ২০১৩ তে সকাল ৬.৩০ মধ্যে তৈরী হলাম ও প্রেমময়ীকে স্মরণ করলাম, সে যেন সকল শরীর খারাপ ভুলে গিয়ে এক প্রাণময়ী প্রেমময়ী মাঈ হয়ে গেছেন। যাক সবই ঠাকুরের নির্দেশ, তা না হলে সম্ভব নয়। দেউন্দি বাগান থেকে আমোদ, রূপম, উজ্জল, সানটিলা থেকেও শান্ত প্রসাদও এসেছে। রূপম ভক্তি সঙ্গীত পরিবেশন করল, শান্তপ্রসাদ গৌরিক বসন নেওয়ার বিষয়ে জানালো, 'ঠাকুর ব্রজানন্দই' ক্ষমাপরানন্দকে এই সুদৃঢ় বাংলাদেশে ব্রাহ্মাডুড়াতে পাঠিয়েছেন, ঋত্তিক ও সন্ন্যাস করার জন্য যেমন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নবদ্বীপ ধামে থাকতেন কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন পরম বৈষ্ণব ভারতী গোঁসাই থেকে।

আরও বহু কথাই বলেছেন। সকলেরই বিশ্বাস ভগবান ব্রজানন্দ যদি না চাইতো যে অতীতের মৃণাল বর্তমানে ক্ষমতাপরানন্দ হবে না তবে কারোরই ক্ষমতা হতো না মৃণালকে ক্ষমপরানন্দে কেউ পরিণত করে। শুধু ভাবি আর বলি "কি খেলা খেলছি ঠাকুর তোমার এই বিশ্বলয়ে।" জয় গুরু জয় ব্রজানন্দ। প্রেমময়ী মা খুবই আনন্দে ডগমগ। কি আনন্দ! আমাকে ডেকে বলছেন, তোমার এইসব কিছু তুমি

সামলাবে। তার আনন্দের ছবি কয়েকটা বইটাতে দিলাম। ডাক্তারবাবুর ছবিও দিলাম। যার সন্ন্যাস জীবনের নাম ছিল প্রেমময় মহারাজ।

যেদিন আমি ব্রাহ্মণডুড়ার থেকে ফিরলাম এ যে এক বিষাদভরা সন্ধ্যা। বাংলাদেশে প্রায়ই বনধ বা হরতাল চলে। আমাকে দেউন্দি থেকে নিতে এসেছিল কানন ও আর এক ভক্ত সি. এন. জি নিয়ে। মাঈ শুধু একটা কথা বলছিল "আমি সবাইরে কইয়া দিমু আমার বাবায় আমার সব জানলা দরজা বন্ধ কইরা দিয়া গেছে।" আমি মাকে — বলেছি তুমি আমারে বিদায় দাও দুইটা মাসের জন্য আমি আমার সংসার জীবনের একটা বড় কর্তব্য শেষ করে আসতে হবে। — এই ৮ই ডিসেম্বর ২০১৩ তে খুবই গন্ডগোলের মধ্যে বাংলাদেশের বর্ডার পার করিয়েছেন স্বয়ং আমার ঠাকুর নতুবা বন্দর থেকে নিয়ে আসার পথেই হয়তো ক্ষমাপরানন্দ হারিয়ে যেত এ জন্মের মতন। 'আমার ঠাকুর' হয়তো লেখাই হতো না। আমার ঠাকুর আমার সাথে ছিল বলেই আজ আমি আছি। জয় ব্রজানন্দ যখন ভারতের মাটিতে পা রাখলাম তখন যেন হৃদয় থেকেই বেড়িয়ে এল জয় প্রাণনাথের জয়, জয় ব্রজানন্দের জয়। সেদিন মনে হয় কিছু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী (পাঁচজন) আর আমি দুই দেশের বর্ডার দিয়ে এসেছি, সকলেরই প্রায় জিজ্ঞাস্য কি করে এলাম। উত্তর শুধু শ্রীগুরু ব্রজানন্দের আশীর্বাদে।

ব্রাহ্মণডুরায় যাঁদের কথা না বললে নয় তাঁরা হলেন স্বর্গীয় অদ্ভুত কুমার দাস, তাঁর স্ত্রী গীতা মাঈ, পুত্র শিবু আর অধ্যক্ষ রঞ্জিত কুমার দাস, দেবী ও শিল্পী মায়েদের কথাও সকল সময়ে স্মরণে আসে বিশেষভাবে প্রণতোষের কথা তো সকল দিনই ভাবিয়ে তোলে। শাহাবাজপুরের শ্রী দিলীপ কুমার নাগ ও ওঁর স্ত্রীর দোলাকেও খুবই স্মরণে আসে। সচিব অশোকমোহন দেবের নামও উল্লেখযোগ্য। এরা সকলেই মঙ্গলময়ের অসীম ও অকৃপণ আশীর্বাদে সুস্থ থাকুক এই প্রার্থনা। জয় গুরু জয় ব্রজানন্দ।

ঠাকুরের লীলা মন্টু সর্দ্দারের উপর

১৯৬৭ গিলানি চা বাগানের সর্দ্দার মন্টু প্রসাদ চৌহানের ঘটনা। ঠাকুরের অসীম কৃপা মন্টু সর্দ্দার ও তার পরিবারের উপর বর্ষিত হয়েছিল। লস্করপুরে ঠাকুর তপময়ী মাঈয়ের বাসায় মধ্যাহ্ন ভোগ গ্রহণ করেছেন। সকল ভক্তশিষ্যদের মহাপ্রভু তার মহাপ্রসাদ বিতরণ করছেন। গৃহের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে একজন মাঈ অঝোরে কাঁদছেন। ঠাকুর যেমন ডাকেন প্রসাদ ..... প্রসাদ..... বললেন "মাঈ আইসো প্রসাদ নাও, সকল দুঃখ ঘুচিয়া যাইব"। যেই না এই কথা বলা যেন আকাশ ভেঙ্গে পরলো ঠাকুরের চরণে।

ঠাকুর তপময়ী মাঈকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হইসে, এই মাঈ টার? তপময়ী মাঈ ঠাকুরকে জানালেন, 'বাবা ওর স্বামী ও পরিবারের পুরুষদের বর্ত্তমানের আয়ূব খাঁ সরকার ধর্ম্মঘট করার অপরাধে ধইরা লইয়া গেছে। সাজা হইসে ১৪ বৎসরের কারাদন্ড। ঠাকুর ঘটনার সকল বিষয়ে অবগত হইলেন। তারপর ঠাকুর আবার ঐ মাঈকে বললেন "প্রসাদ নাও, প্রসাদ নাও"। যে তার স্বামী ও পরিবারের মানুষের জন্য ঠাকুরের চরণে মাথা দিয়ে কাঁদছিলেন।

এইবার ঐ ভদ্রমহিলা যার পরিচয় মন্টু সর্দ্দারের স্ত্রী - নাম ইন্দুবালা সঙ্গে ছিল তার পুত্র পাঁচ-ছ বৎসরের শান্ত প্রসাদ। ইন্দুবালা ঠাকুরকে বললেন 'আমি প্রসাদ নেব তখনই যখন আমার স্বামীকে নিয়ে আসবে। ঠাকুর বললেন কি? এবার জগৎগুরু ব্রজানন্দ হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন ভরা ঘর ভক্তের মধ্যে। বললেন "আমার ভক্তকে বিনা অপরাধে ১৪ বৎসরের জেল? অধর্ম টিকবে না। আমি ব্রজানন্দ হইলে ২৪ ঘন্টার মইধ্যে জেল ভাইঙ্গা নিয়া আসবো, আসবোই আসবো।"

আবার মনে আসলো ঠাকুর বলতেন "গুরু কা বাত হাতি কা দাঁত ও বিশিষ্ট বাগানের মানুষেরা ঠাকুর কে অনুরোধ করতে লাগলেন ও বললেন বাবা এ আয়ূব সরকারের কঠোর শাষন। কিছুতেই পরিবর্ত্তন হবে না। দয়া করিয়া তুমি তোমার মুখের বাক্য ফেরৎ নিয়া নাও।

ঠাকুর যেন এবার বজ্রপাত ঘটাইলেন বললেন, ব্রজানন্দ স্বয়ং বুড়াশিব তার উপর আর কিছু নাই, বিশ্বাস রাখ মাঈ, তাই তো এবার আমি এ ধরায় অধর্মের বিরুদ্ধে ও ধর্মকে স্থাপন করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছি। ওদের কে আমি জেলের তালা ভাইঙ্গা তোমার কাছে আনবোই আনবো। তুমি চিন্তা করিও না। অধর্মকে বিনাশ করবোই করবো।" দিনটি কালী পূজার দিন ছিল। উপস্থিত সকল ভক্তরা প্রায় শতকরা ভাগ ধরেই নিল এইবার ভগবান ব্রজানন্দের কথা ফলিবে না। কারণ আয়ূব সরকারের কঠোর শাসন কিছুতেই পরিবর্তন

হইবে না। আমাদের কাছে ভগবান ব্রজানন্দের প্রতিটি মুখনিশ্রিতবানীই বেদবানী বলিয়া আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। সকল ভক্ত শিষ্যদের স্মরণ করিয়ে দেই যে, "ভগবান ব্রজানন্দকে মানুষ বলে ভাবলে মহাভুল ও পাপ সঞ্চয় করিবে। ভগবান ব্রজানন্দ মানুষ ভগবান ও তিনিই যুগের শ্রষ্টা, স্বয়ং সিদ্ধ কিন্তু তিনি সাধক নহেন। স্বয়ং সাদ্ধ। ঠাকুরের মুখের বাণীকে মিথ্যা বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন সাধক অনুকূল চন্দ্রের শিষ্যরা, তাদের মধ্যে ছিলেন বাগানের বিশিষ্ট ভক্তবিন্দরা তাদের মধ্যে ছিলেন সেদিন উপাংশুবাবুরাও।

ভগবান ব্রজানন্দ জানালেন তিনি আরও কয়েকদিন এই স্থানেই থাকবেন। ঠাকুরের লীলা বুঝবে কারও কি এমন ক্ষমতা আছে। শুরু হয়ে গেল কর্ত্তার ইচ্ছা। সমস্ত পাকিস্তান জুড়ে চলছে জরুরী ও মিলিটারী শাষনকাল। কিন্তু হঠাৎ বৈকালে লাহোর থেকে আয়ুব খাঁ ঘোষনা করলেন যে যারা যারা বিনা অপরাধে কারাদন্ডে দন্ডিত হয়েছে তাদের আজই রাতের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে। আর শ্রমিক ধর্ম্মঘটের জন্য কোন শ্রমিককেই চাকরি হারাতে হবে না। সেই সকল কারাদন্ডে দন্ডিত বিনা অপরাধের মানুষরা ও শ্রমিকরা নিজ নিজ কাজে পুনঃদখল থাকিবে। মিলিটারীরা প্রত্যেককেই তাদের বাড়ীতে ফেরৎ দিয়ে আসবে সম্মানের সহিত ইত্যাদি।

কালীপূজার অমাবষ্যার রাত। ভোর হতে না হতেই সেই ইন্দুবালার নয়নাশ্রু মুছিয়ে দিলেন ভগবান ব্রজানন্দ। লস্করপুর চা বাগানেও মিলিটারীর গাড়ী এলো - ঐ গাড়ী থেকে নামলো ব্রজানন্দের ভক্তরা ১। মন্টু সর্দ্দার, ২। গোপাল সর্দ্দার, ৩। শিবনাথ দাদার ছেলে, ৪। অমৃত মাল, ৫। ছেলে অনন্ত মাল ও বন্ধু, ৬। রাম সিং মুন্ডা।

গোপাল সর্দ্দার ও সকলেই ঠাকুর ব্রজানন্দের জয়ধ্বনি দিতে দিতে বাগানে সেদিন সূর্যোদয় ঘটিয়েছিল। বাগানের সকলেই প্রথমে ভেবেছিল যে কে বা কারা ঐ দুঃখের সময়ে আনন্দ ও অট্টোহাসি হাসছে। পরে সকলেই সেই সূর্যোদয়ের রংয়ে রাঙিয়ে দিয়েছিল ঠাকুরের চরণ। "হরে ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে, গৌর হরি বাসুদেব, রাম নারায়ণ হরে নামে তে।" পরের দিন লস্করপুর চা বাগানে উৎসব হয়ে গেল। ধন্য সেই সকল ভক্তরা যারা প্রত্যক্ষ করেছেন ঠাকুরের এই লীলা আজ শান্ত প্রসাদ ঐ লীলার কথা স্মরণ ক'রে নয়নাশ্রু ঠাকুরের চরণে নিবেদন করে আজও।

আজ এই লীলাই সাক্ষী, ভক্তের ভগবান - কাঙালের ঠাকুর। কলিকালে কালীরাত্রে শ্যামারূপে জগৎগুরু ব্রজানন্দ মহাপ্রভু ভগবান। জয় ব্রজানন্দ।

ঠাকুরের পরিচিতি ও নিত্যপূজা পদ্ধতি

ঠাকুর আমাদের স্বয়ং সিদ্ধ, সাধক নন। ভগবান ব্রজানন্দ নামে তিনি কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চলে যাবার পরে। পিতা শ্রীমৎ ত্রিপুরানন্দ সরস্বতী, মাতা শ্রীমতি দুর্গাদেবী, জন্ম স্থান - কনৌজ, উত্তর প্রদেশ কানপুর হতে ৮১ কিলোমিটার দুরত্ব। জন্ম হয় দৈবযোগের মাধ্যমে। ভগবান ব্রজানন্দের আবির্ভাব দিবস ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৮৪০, তিরোধান দিবস ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯।

ভগবান ব্রজানন্দের এশিয়া মহাদেশের মন্দিরের বিবরণ ঃ

আদি মন্দির, ঢাকা বুড়াশিব ধাম, ঢাকা, বাংলাদেশ।

সমাধি মন্দির - গুরুধাম, বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, কলকাতা, ভারতবর্ষ।

নবদ্বীপ বুড়াশিব ব্রজধাম, নবদ্বীপ, নদীয়া, ভারতবর্ষ।

বৃন্দাবন বুড়াশিব ব্রজানন্দধাম, বৃন্দাবন, ভারতবর্ষ।

মানিকগঞ্জ পূর্ণানন্দভবন, মানিকগঞ্জ, বাংলাদেশ।

দেউন্দি বটতলা গুপ্তবৃন্দাবন ব্রজানন্দ ধাম, দেউন্দি, সিলেট, বাংলাদেশ।

ব্রাহ্মণডুরা বুড়াশিব ব্রজধাম, ব্রাহ্মণডুরা, বাংলাদেশ।

ঠাকুর দশনামী সন্ন্যাসী, আদি শঙ্করাচার্য্য ও ভগবান ব্রজানন্দ সরস্বতী একই।

দশনামী সন্ন্যাসীদের আশ্রম ভিত্তিক পদবী ও পরিচয়।

শ্রষ্ঠা ঃ আদি শঙ্করাচার্য্য।

মঠ ঃ চারটি ঃ ১। শৃঙ্গেরী মঠ, দক্ষিণ ভারত, ২। সারদা মঠ, গুজরাট, ৩। গোবর্ধন মঠ, জগন্নাথক্ষেত্র ও ৪। যোশী মঠ।

কোন কোন মঠের অন্তর্ভূক্ত কি কি পদবী ঃ

শৃঙ্গেরী মঠের অধীনে ঃ ১। সরস্বতী, ২। পুরী, ৩। ভারতী।

সারদা মঠের অধীনে ঃ ৪। বন, ৫। অরণ্য।

গোবর্ধন মঠের অধীনে ঃ ৬। তীর্থ, ৭। আশ্রম।

যোশি মঠের অধীনে ঃ ৮। গিরী, ৯। পবর্বত ও ১০। সাগর।

দশনামী মঠের মতে, আমাদের বেদ 'যজ্জর্বেদ'।

গুরুর পরিচয় দশনামীদের কাছে জগৎ গুরাচার্য্য ঃ পরমহংস পরিব্রাজক স্বামী ব্রজানন্দ জীউ।

মূল সাধনা "অহম্ ব্রহ্মাস্মী"

ঠাকুরের দীক্ষার মন্ত্র জপ করার পর যারা সময় পাবেন। তারা ঠাকুরের 'অর্ঘম' পাঠ করবেন। নিতং পূর্ন্যং পরমাত্ম রূপম্ নিরঞ্জনং তং দেবাদিদেবম্। তারপর তারব্রহ্মনাম "হরে ব্রজানন্দ হরে। হরে ব্রজানন্দ হরে। গৌর হরি বাসুদেব। রাম নারায়ন হরে।" আপনি আপনার মনের ইচ্ছা জানান ঠাকুর ব্রজানন্দকে।

এখানে জানিয়ে রাখি, যে যেমন ভাবে নিত্যপূজা করতে ভালবাসেন তিনি সেভাবেই করবেন। তবে আমাকে বহু ভক্তশিষ্য বার বার জিজ্ঞাসা করেছেন এবং জানিয়েছেন আমি যে ভাবে করি বা জানি সেইগুলো যেন পুস্তিকাটিতে জানাই, তাই জানাচ্ছি। যার যেমন ইচ্ছা সে সেই ভাবে করতে পারেন।

১। তুলসী বৃক্ষে জলদেবার মন্ত্র ঃ—

ওঁ ব্রজানন্দ মধুসুদনম্ কৃষ্ণেতি বাসুদেব জনার্দনম।

চত্বেরী তব নাম মহাবিপত্তি নাশনম্।

ওঁ প্রিয়ঃ প্রিয়ে প্রিয়াবাসে নিত্যং শ্রীব্রজানন্দসংকৃতে।

তক্ত্য দত্তং ময়া দেবী গৃহানার্ঘ্যং নমোহস্তুতে।

৩ বার জল দেবেন বৃন্দাদেবীকে এই মন্ত্রে।

২। তুলসীচয়ণ মন্ত্র ঃ

ওঁ তুলস্যমৃতনামাসি সদা ত্বং ব্রজানন্দপ্রিয়া। ব্রজানন্দার্থং চিনোমি ত্বাং বরদা তাং বরদা ভব শোভনে। তদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈ পূজয়ামি যথা হরিম। তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মলবিনাশিনি।

৩। বিল্লপত্র চয়ন মন্ত্র ঃ

ওঁ পূণ্যবৃক্ষ মহাভাগ মালুর শ্রীফল প্রভো। বুড়াশিবায় ব্রজানন্দায় পূজনার্থায় ত্বাৎপত্রাণি চিনোম্যহম্।

৪। দূর্বাচয়ন মন্ত্র ঃ

ওঁ সহস্রপরমা দেবি শতমূলা শতাঙ্কুবা। সবর্বং হরতু মে পাপং দূবর্বা দুঃস্বপ্ননাশিনী।

৫। ঠাকুরের শ্রী চরণে তুলসী নিবেদন এর মন্ত্র ঃ—

এতৎ স্বচন্দন তুলসীপত্রং ওঁ শ্রীশ্রীবাসুদেবায় চ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় বিষ্ণুবে বহুরূপায় শ্রী জগৎগুরু ব্রজানন্দায় শ্রী চরণে সমর্পিতামি।

৬। পুষ্পাঞ্জলী ঃ—

১। এস স্বচন্দন গন্ধ পুষ্পাঞ্জলী বিল্লপত্রাঞ্জলী সহিত ওঁ শ্রীশ্রী বুড়াশিবায় ব্রজানন্দায় শ্রীপাদপদ্মে নিবেদয়ামি।

২। এস স্বচন্দন গন্ধ পুষ্পাঞ্জলী ওঁ শ্রীশ্রীজগৎগুরু ব্রজানন্দায় শ্রী পাদপদ্মেসমর্পিতামি।

৩। এস স্বচন্দন গন্ধ পুষ্পাঞ্জলী ওঁ শ্রীশ্রীবাসুদেবায় কৃষ্ণায়, গোবিন্দায় স্বরূপায় শ্রীমৎ ব্রজানন্দায় শ্রীচরণে সমর্পিতামি।

৭। ভোগনিবেদন মন্ত্র ঃ—

প্রথমে তিন বার 'জয় গুরু' বলে কুশিদ্বারা জলের ছিটা দিতে হবে সমস্ত ভোগের উপর 'ইদং সোপকরনান্নায় ওঁ শ্রীগুরু ব্রজানন্দায় নমঃ' বলে বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত ভোগের উপর সমস্ত ঘুরিয়ে ইষ্ট নাম ১০ বার বলে জপ করিতে হবে। এবং বলতে হবে প্রভু ব্রজানন্দ তুমি যা ব্যবস্থা করিয়েছ তাই তোমাকে তোমারই ভোগে নিবেদন করছি তুমি গ্রহণ করো এসো জগৎ গুরু ব্রজানন্দ।

৮। গুরুস্তোত্র ঃ

ওঁ নমস্তুভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে ব্রজানন্দ (যারা যে মন্ত্রে দীক্ষিত সেটাই পাঠ করবেন) কৃষ্ণ/শিব রূপিনে। ব্রহ্মজ্ঞান-প্রকাশায় সংসার দুঃখ তারিণে। অতিসৌম্যায় দিব্যায় বীরায়াজ্ঞান হারিণে। নমস্তে কুলনাথায় কুলকৌলীন্যদায়িনে। কৃষ্ণ / শিব তত্ত্বপ্রবোধায় ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিনে। নমস্তে গুরবে তুভ্যং সাধকাভয়দায়িনে। অনাচারাচার — ভাববোধায় ভাবহেতবে। ভাবাভাববিনির্ম্মুক্ত-মুক্তিদাত্রে নমো নমঃ। নমস্তে শম্ভবে তুভ্যং দিব্যভাবপ্রকাশিনে। জ্ঞানানন্দস্বরূপায় বিভবায় নমোনমঃ। ব্রজানন্দ শক্তিনাথায় সচ্চিদানন্দরূপিণে। কামরূপায় কামায় কমিকেলিকলাত্মনে। কুলপূজোপদেশায় কুলাচারস্বরূপিণে। আরক্তনিজতচ্ছক্তি

বামভাগ-বিভূতয়েঃ। নমস্তেহস্তু বুড়াশিবায় চ ব্রজানন্দায় নমস্তেহস্তু নমোনমঃ। ইদং স্ত্রোত্রং পঠেন্নিত্যং সাধকো গুরুদিম্মুখঃ। প্রাতরুত্থায় দেবেশি ততো বিদ্যা প্রসীদতি। কুলসম্ভব পূজায়ামাদৌ যো ন পাঠেদিদম্। বিফলা তস্য পূজা স্যাদভিচারায় কল্পতে।

৯। গুরু প্রণাম মন্ত্র ঃ

ওঁ অখন্ডমন্ডলাকারং ব্যপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ। অজ্ঞানতিমিরান্ধ স্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া, চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ। গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুঃ সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।

ওঁ নমঃ শ্রী ভগবতে জগৎ গুরু শ্রীশ্রী ব্রজানন্দায় নমো নমঃ।

১০। জলশুদ্ধি ঃ—

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতী, নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু। জলে আঙ্গুল রাখিয়া বলিতে হইবে।

১১। আচমন ঃ—

দক্ষিণ হস্তে কোষাকুষি থেকে জল নিয়ে। ওঁ শান্তি বলে তিন বার জল পান করতে হবে। প্রতিবারই হাত ধুয়ে ফেলতে হবে।

১২। দেহশুদ্ধি ঃ—

বাম হস্তে কুশিতে জল নিয়ে দক্ষিণ হস্তে তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল নিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বিতীয় ও তৃতীয় কড়ের মাঝে রাখতে হবে। এবার ঐ দুই আঙ্গুল একত্রিত করে বলতে হবে — 'জয় গুরু' (২) মুখের ডান দিকে ও বাদিকে, নাকের দুদিকে (২) ডান ও বা, দুই চোখে। (২) দুই কানে (২)। নাভিতে ১ বার হৃদয়ে (১) একবার, কণ্ঠে (১) বার মাথায় ১ বার ও বাকী কুশির সব জল হাতে নিয়ে ও মুঠো বন্ধ করে তিনবার 'জয় গুরু' (৩) করে মাথার উপর দিয়ে দেহের চারিদিকে ছিটিয়ে দেবেন, তাতে ঐ স্থানও শুদ্ধ হয়ে যায়।

১৩। শ্রীগুরুর চরণামৃত গ্রহণ করার মন্ত্রঃ ও' অকাল মৃত্যুহরণং সবর্ব্যাধি-বিনাশনম্। শ্রী গুরোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধীরায়াম্যহম্।

ক্ষমাপরানন্দের সন্ন্যাস যাত্রা

জয় ব্রজানন্দের নাম নিয়ে ১০শে ফেব্রুয়ারী ২০১৪ ভোর বেলায়। সূর্য্যদেব তখনও প্রকাশ করেননি নিজেকে, বেরিয়ে চললাম Salt Lake এর বাস Stand এর উদ্দেশ্যে। যাই হোক ঢাকা বুড়াশিব ধামে পৌছলাম রাত প্রায় ১১টা হবে। ঢাকাতে ঠাকুরের আবির্ভাব ও তিরোধান উৎসব পালন ক'রে, দেউন্দি থেকে আগত ভক্তদের সঙ্গেই বাগানে চলে এলাম। আসার সময় চিত্তমহারাজ আমাকে জানিয়েছিলেন যে তিনি আমাকে রাজধানীতে রাখতে চান। কিন্তু আমার মন যে পড়ে আছে ব্রাহ্মণডুরার প্রেমময়ী মাঈয়ের কাছে। কারণ আমি যে শ্রীমৎ হরিহরানন্দ মহারাজকে কথা দিয়েছিলাম যে তেমন যদি সত্য কিছু হয় তবে তোমার কথা মতনই ব্রাহ্মণডুড়ার মায়ের থেকে যে কোনও কিছু গ্রহণ করবো। এখানে বলে রাখি, যখন শ্রীমৎ হরিহরানন্দ সরস্বতী মহারাজ ঢাকা থেকে এসেছিলেন কলকাতা বাঙ্গুর গুরুধামে তখন একদিন মহারাজ আমার পূর্ব সংসার এ এসে ঠাকুরের ভোগরাগ নিবেদন ও গ্রহণ করেছিলেন। গুরুধামে ফেরার পথে রিক্সায় যেতে যেতে বলেছিলেন এবং কথা আদায় করে নিয়েছিলেন যেন আমি ব্রাহ্মণডুরাতে গিয়ে বুড়াশিব ব্রজানন্দধাম দর্শন করি। এও জানিয়েছিলেন যে "তোর এসব গাড়ি, বাড়ি ঐশ্বর্য্য সব ত্যাগ করতেই হবে। এগুলো সব ছেড়ে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পথে আসতে তোকে হবেই।" সেদিন বিশ্বাস করি নি। কিন্তু যখন ঢাকা বুড়াশিব বাড়িতে যাই শিবরাত্রি উপলক্ষে তখন কেন জানিনা, মাথা মুন্ডন করলাম ও বুড়াশিবের মাথাতে মুন্ডন করা চুলের অংশ দিলাম। আর ঠাকুরকে জানালাম ঠাকুর আমার মনে প্রাণে বৈরাগ্য আনো। তোমার যা ইচ্ছা তাই করো।

ঠাকুর যে কি করলেন, হরিমহারাজ ইতিমধ্যেই তার সন্ন্যাস জীবন সমাপ্ত করে শ্রীগুরুর চরণে আশ্রয় নিয়েছেন। শুধু তাঁর কথা বার বার মনে হচ্ছিল। "সব ছেড়ে দে, এসব তোর নয়।" আর মনে আসছিল প্রেমময়ী মাঈয়ের কথা "বাবা তুমি এসেছো, আমার কবে মুক্তি।" তার পর যে কোথা থেকে কি হয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। একের পর এক। শ্রী সুনীল রায় পালধি-ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত ও শিষ্য আমাকে জানালেন "তুমি তো এখন ব্রহ্মচর্য্য করছো, কিছু স্থান দর্শন করে আসো," ঠিক করে ফেললাম তারই কথা মতন, ঠাকুরের জন্মস্থান দর্শন করবই। সুনীলদা আমাকে যেন গল্পের মতন করে সব কিছুই জানালেন। বেড়িয়ে পড়লাম তীর্থদর্শনে। ফিরে এলাম ভয়াবহ উত্তরাখন্ডের ধবংসলীলার কয়েক দিন আগে।

যাক্, ঢাকা বুড়াশিব ধাম থেকে ফিরলাম দেউন্দিতে। প্রথমে ঠিক ছিল, যে শিবরাত্রিতে সন্ন্যাস নেবো। তারপর বিশেষ কিছু কারণে ঠিক হল দোলপূর্ণিমার দিনই নেবো। সকল কিছুই ঠিক, ঠাকুরই আমার জীবনের নির্দ্দেশক ও নিয়ন্তা। ওনার যেমন ইচ্ছা তেমনই করলেন। দিনটা আমাকে ভাতৃপ্রতীম রঞ্জনই মনে করিয়ে দেয় দোলযাত্রার দিনটা খুব ভালো মহাপ্রভুর আবির্ভাব। জয় গুরু, জয় ব্রজানন্দ।

সমস্ত ভক্তপ্রাণ শিষ্য, ভক্ত ও পাঠকদের কাছে একটা প্রশ্ন — যদি বিশ্বাস করি যা হচ্ছে বা হবে সবই ঠাকুর করেন বা করান। তবে ক্ষমাপরানন্দ যে আজ সন্ন্যাস জীবনে প্রবেশ করেছে সেটাও ঠাকুরের ইচ্ছা। তিনিই আমার জীবনের সব, তাঁকে ছাড়া কাওকেও এ জীবনে সবর্বশক্তিমান ঈশ্বর বা ভগবান বলে পূজা বা অর্চনা করিনি আজ অবধি। যারা ভগবান ব্রজানন্দকে নিত্যপূজা করেন, ঠাকুর যেন তাদের মঙ্গল করেন এবং প্রকৃত দৃষ্টি উন্মোচন করেন, এই প্রার্থনা ঠাকুরের চরণে।

সন্ন্যাসের দিন ঃ দোলপূর্ণিমা, তাং-১লা ও ২রা চৈত্র

সন্ন্যাস গ্রহণ করি ভগবান ব্রজানন্দের সন্ন্যাসী হরিহরানন্দ মহারাজদ্বারা সন্ন্যাস প্রাপ্ত সন্ন্যাসিনী মাঈ প্রেমময়ী (যিনি ব্রাহ্মণডুরা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন) সরস্বতীর কাছ থেকে।

সন্ন্যাস গ্রহণ আত্মপীন্ড অব্যুদয়ীক শ্রাদ্ধ ও প্রস্তুতি গণপতি হোম ও বিরজা হোম কুন্ড স্থাপন করেন চট্টগ্রামের পন্ডিত শ্রী অনির্বান ভট্টাচার্য্য ও পন্ডিত শ্রী দিলীপ চক্রবর্ত্তী মহোদয়।

সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয় দশনামী আশ্রম অনুযায়ী ও তদানুসারে। অনুষ্ঠানটির পরিচালক চট্টগ্রামস্থীত চন্দ্রনাথের ভোলাগিরি আশ্রমের মহন্ত মহারাজ শ্রীমৎ উমেশানন্দ গিরি। অনুষ্ঠান শুরু হয় ১লা চৈত্র সকাল ৯-৪৭ মিনিটে। সমাপ্ত হয় ২রা চৈত্র। ভোগরাগ অতিথি সেবা হয় দ্বিতীয় দিন। বিরজা হোমে বসার পর বিশেষ কিছু আমার মনে নেই। সারা রাত্রি ধরে সে যেন ঠাকুর ব্রজানন্দ স্বয়ং সব কিছুই করে গেছেন। ঠাকুরের চরণে আমার একান্ত প্রার্থনা হে ভগবান ব্রজানন্দ, আমার নিবেদন তোমার সকল ভক্ত শিষ্যদের তুমি তোমার ভক্তি সাগরে ডুব দেওয়াও। তাদের সকলের মঙ্গল হোক। তাদের হয়ে তোমার কাছে যেন প্রতিদিন প্রার্থনা করতে পারি। হে দয়াময় তোমার দয়াতে তাদের সবর্বতোভাবে সবর্বপ্রকারের মঙ্গল হোক। তোমার ভক্ত শিষ্যরা ভাল থাকুক আরোগ্য লাভ করুক, শিক্ষিত হোক। তাদের অভাব যেন না

থাকে, তাদের কষ্ট দিও না। তারা যেন শান্তি পায়। আমায় সেই ধৈর্য্য ও শক্তি দাও। তোমার ভক্তশিষ্যদের আনন্দে রাখো। তুমি যে মঙ্গলময়। তুমি যে আমার একমাত্র ঈশ্বর বা ভগবান।

জয় হোক ঠাকুর। তোমার দেওয়া ব্রহ্মমন্ত্র যেন সকল সময়ে মঙ্গল বহন করে তোমার জয় গান গায়।

জয় ব্রজানন্দের জয়। জয় ব্রজানন্দের জয়।

জয় হোক। জয় হোক। হোক তোমার জয়।

শুধু মনে প্রাণে তোমার চরণে আমার একটাই প্রার্থনা

হে ঠাকুর আমায় পঞ্চ বৈরাগ্য দাও

১। ফল্গু বৈরাগ্য : ফল্গু নদীর বালি সরালে যেমন জল বের হয়। উপরে বালি নিচে জল। এইরূপ ভোগবাসনা থেকে নির্লিপ্ত কর।

২। শুষ্ক বৈরাগ্য : এই বৈরাগ্য যেন আমাকে স্পর্শ না করে। প্রকৃত অর্থেই যেন তোমার ভজন আর ভক্তের হয়ে প্রার্থনাই যেন আমার আহার হয়।

৩। মর্কট বৈরাগ্য : আমি যেন বানরের ন্যায় এ বৃক্ষ ঐ বৃক্ষ করে না বেড়াই। তোমার মন্দিরে স্থিতি কর। সমস্ত কাম, ক্রোধ, লোভের বশীভূত না হই। তোমার নাম ভিন্ন আমার যেন কিছু না থাকে এই দেহে।

৪। শ্মশান বৈরাগ্য : সে তো তুমি পরীক্ষা নিয়েছই আমার। এ জীবনে আর যেন আমাকে বিচলিত না হতে হয়। কারণ সকল দায়িত্বই তো অর্পন করেছি তোমারই চরণে। আমার তো এ জীবনে শ্মশান যাত্রা আর তুমি করাবে না এটাই আমার বিশ্বাস। আজ আমার কেউই নেই তুমি ছাড়া, তোমার নাম ছাড়া।

যুক্ত বৈরাগ্য : কেবলমাত্র ভজনের আনুকুল্যে শরীর রক্ষার্থে যত সামান্য প্রয়োজন, সেটাই যুক্ত বৈরাগ্য। এটার আবার দুই শাখা। এক গৃহস্থলোকের ও যারা দিশাহীন বাবাজী, যারা জীবন এর পথে পাথেয় বা নিয়ন্তাকে নির্দিষ্ট বা চিনতে পারে না ভজনে। এমন বৈরাগ্য যেন তোমার ক্ষমার জীবনে কোনদিন না আসে এই প্রার্থনা।

আমায় আশির্বাদ করো হে ভগবান ব্রজানন্দ আমি যেন তোমারই নির্দ্দেশ মতন শুধু এ দেহে নাম জপ করে তোমার চরণে আশ্রয় নিতে পারি এই প্রার্থনা।

ঠাকুরের ভজন আমারও জগন্নাথ

কথা ও সুর - ভগবান ব্রজানন্দ

আমারও জগন্নাথ, আমারও জগন্নাথ
শোভে রথপরি, আহা মরি মরি।
রাম শুভদ্রা সাথ
আমারও জগন্নাথ, আমারও জগন্নাথ
একে তিন, তিনে এক প্রভু ব্রজানন্দ
বিতরেণ জীবগণে, শান্তি ও আনন্দ
অধরে মধুর হাসি, করেতে মোহন বাঁশি
শির পরি সিকি চূড়া বরাভয় হাত।
আমারও জগন্নাথ, আমারও জগন্নাথ
আষাড়ের শেষ বেলা যায় বুঝি বয়ে
ঝড় ঝড় বারি ধারা ঝড়ে রয়ে রয়ে
রথ যে টানিতে হবে রথ যে টানিতে হবে
বাঁধ কোমর কষি, সবাকারে সাথ
আমারও জগন্নাথ, আমারও জগন্নাথ

নানান ভাব

ভক্ত - সুজিত কুমার ঘোষ

ভক্ত ভাবে আমি ভক্ত,
রাখো অহম ভাব।
জ্ঞানী ভাবে আমি সোহম,
আমার মাঝে সব।
দুটি ভাবই সমসত্ত্ব,
তার কাছে যাওয়া।
অহম ভাবে কাছে থাকা,
সোহম তাঁকে পাওয়া।।
লিঙ্গরূপী শরীর মাঝে,
তিনি করেন বাস।
নানানরকম বুদ্ধি বিচার,
বাড়ায় পাবার আশ।
কল্পনাকে সাকার করে,
দেখি বিশ্বরূপ।
আমি নিত্য ব্রজানন্দ,
আমি আনন্দ স্বরূপ।।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিত প্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।। ২/৫৫
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মু নিরুচ্যতে।। ২/৫৬

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোহপাস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।। ২/৫৯

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।। ২/৬১
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংস্যঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে।। ২/৬২
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।। ২/৬৩
রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চয়ন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি।। ২/৬৪
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে।। ২/৬৫

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো ব্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষ।। ৩/১৯

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।। ৩/২৭

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোহনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেহপি কর্ম্মভিঃ।। ৩/৩১

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।। ৩/৩৭

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ। ৩/৪২

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিযস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেহব্রবীৎ।। ৪/১

স এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ
ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্।। ৪/৩

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।। ৪/৫

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।। ৪/৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।। ৪/৮

বীতরাগভয়াক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ।। ৪/১০

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।। ৪/২১
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে।। ৪/২২
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে।। ৪/২৩
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা।। ৪/২৪

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।। ৪/৪০

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।। ৫/১০

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।। ৫/১৫

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্শরীর-বিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ।। ৫/২৩

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ।। ৫/২৭
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মু নির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ।। ৫/২৮
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।। ৫/২৯

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ।। ৬/১

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মবর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ।। ১০/২
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।। ১০/৩
বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেবচ।। ১০/৪
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোহযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এণ পৃথগ্বিধাঃ।। ১০/৫

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোহবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।। ১০/৭
অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ।। ১০/৮
মচ্চিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।। ১০/৯
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।। ১০/১০
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা।। ১০/১১

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ।। ১০/২০
আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী।। ১০/২১
বেদানাং সামবেদোহস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা।। ১০/২২
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্।। ১০/২৩
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ।। ১০/২৪
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ।। ১০/২৫
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ।। ১০/২৬

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভষ্যিতাম্।
কীত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা।। ১০/৩৪
বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোহহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ।। ১০/৩৫
দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োহস্মি ব্যবসায়োহস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্।। ১০/৩৬
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোহস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মূনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ।। ১০/৩৭
দণ্ডো দংয়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যনাং জ্ঞানং জ্ঞানবত্তামহম্।। ১০/৩৮
যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং ভদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্।। ১০/৩৯
নান্তোহস্তি মথ দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশভঃ প্রোক্তো বিভূতেব্বিস্তরো ময়া।। ১০/৪০
যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তএদবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্।। ১০/৪১

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্।। ১৬/১
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্তবং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্।। ১৬/২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত।। ১৬/৩

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।। ১৮/৫৪
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।। ১৮/৫৫
সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎ প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্।। ১৮/৫৬

গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব।
কীর্ত্তনৎ সর্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ।। গীতামাহাত্ম্যম্/৪৮
গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পরিব্রতা।
ব্রহ্মাবলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী।। গীতামাহাত্ম্যম্/৪৯
অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী।

বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী।।
ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্।।

গীতামাহাত্ম্যম/৫০

গীতামাহাত্ম্যম/৫১

বিঃদ্রঃ- আমি ভাগবৎগীতা, চাণক্যশ্লোক ও মিত্রলাভ অধ্যয়ন করিয়াছিলাম শৈশবেই কারণ সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে পরিতাম বলিয়া। মাঝে মধ্যে গুরুধাম মন্দিরে আসিয়া ঠাকুরকে পাঠ করিয়া শুনাইতাম। আমার জীবনের ভাগবৎগীতার শ্রেষ্ঠ শ্লোকগুলি উল্লেখ করিলাম মাত্র। যাহার নাম কৃষ্ণকথামৃত দিলাম।

চাকর হতে চাই

কথা ও সুর - ঠাকুরপদ সরকার

এমন মানুষ জনম বারে বারে, হয় কিনা হয় জানা নাই।
গুরু তোমার চাকর হতে চাই চাই গো

কর্ণমূলে মহামন্ত্র করেছিলে দান
জীবনভরে ফুটিলো না সাধের ফুল বাগান।
ষড়োরিপু শোনে না কোনো বাধা মানে না,
কি করে যে মনকে বোঝাই।।

হৃদগেরুয়া বসন পরাও আমার জীবনে,
মত্ত্ব থাকি নিশিদিনে রাঙা চরণে।
চরণ ছাড়া করো না, নির্দয় হয়ো না।,
ঐ চরণের দাস হয়ে রই।।

১৪২০ সালের পয়লা চৈত্র দোল যাত্রায়,
সন্ন্যাসী পদবি নিয়ে জীবন ধন্য হয়।
অধম ক্ষমা বলে গুরুর চরণ তলে,
পাই যেন তোমার চরণে ঠাঁই।।

"হরে ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে,
গৌর হরি বাসুদেব, রাম নারায়ণ হরে",
এই নামে গুরু তোমার চাকর হতে চাই।।

ঠাকুরের ভজন ব্রজানন্দ জয় জয়

কথা ও সুর - ভগবান ব্রজানন্দ

শ্রীগুরু জয় জয়, গোবিন্দ জয় জয়,
পতিত পাবন হরি, ব্রজানন্দ জয় জয়।
রাধিকা রমন হরি, ব্রজানন্দ জয় জয়,
গোপিকা বল্লভ হরি, ব্রজানন্দ জয় জয়।
কনৌজের ভূমি পরে শিবহম্ ধ্বনি করে।
জীবেরও লাগিয়া এলো, এইবার ব্রজরাই।

রমনারই বন মাঝে, প্রকাশিল সাধু সাঝে,
শিশুবনমালী হরি
ব্রজানন্দ জয় জয়, রমনারই বন মাঝে.....

কালি দুর্গা মহাশক্তি, বানী লক্ষী মহামুক্তি,
চৈতন্য স্বরূপ হরি, ব্রজানন্দ জয় জয়।
পাপী, তাপী, রুগী, দুখি, জ্ঞানী, ধনী, মানী, সুখি,
সাধু, সন্ত, দীন গাহে, ব্রজানন্দ জয় জয়।

নানা দেশে, নানা ভাবে, করে লীলা নিজভাবে
ভক্ত গাহে শিব হরি, ব্রজানন্দ জয় জয়।

ভক্তগৃহে বৃন্দাবন, করে নিজে সংস্থাপন
কৃষ্ণরূপে দরশন দেন প্রভু দয়াময়,
ব্রজানন্দ জয় জয়, ব্রজানন্দ জয় জয়।

ডোর ও কৌপিনধারী, মোহন মুরলী ধারী
বুড়াশিব কৃষ্ণ হরি ব্রজানন্দ জয় জয়।
হরে ব্রজানন্দ হরে, হরে ব্রজানন্দ হরে,
গৌর হরি বাসুদেব, রাম নারায়ণ হরে।

বিঃদ্রঃ- ঠাকুরের কথা ও সুরের এই ভজন সঙ্গীতটি ভজন সাধিকা পুরবী মাঈ হইতে সংগ্রহিত।

"যাও নূতন যুগের যুগাবতার প্রেমময় ব্রজানন্দের লীলার কথা জগৎবাসীকে শোনাও"

- ভগবান ব্রজানন্দ বলিতেছেন

লীলা পরিচয় হইতে উদ্ধৃত — "কেন আপনি আমায় ডাক্‌ছেন?" ভগবান ব্রজানন্দ মৃদু হেসে উত্তর দিলেন— "তুমি এস আমার সঙ্গে — তুমি যা চাও আমি তাই দেব।" আমি আবার প্রশ্ন করলাম আপনার কাছে আমি কি চাইব, কিইবা দিতে পারেন আপনি আমাকে? তিনি বললেন, "কি আমি তোমাকে দিতে পারি— সে কথা তোমার জেনে কাজ নেই, তবে এই জেনো —যদি তুমি আমার প্রাণ চাও, আমি তাও দেব।" তাঁর সে মধু হতে মধুর প্রেমমাখা স্বরে নিজের অজ্ঞাতসারেই তখন যেন বিস্ময় বিমুগ্ধ আত্মবিস্মৃত হয়েছি—শুধু অস্ফুট স্বরে বল্‌লাম কেন দেবেন। তিনি তখন ভূবন ভুলান মৃদু মধুর হাসি হেসে আমার হাত ধরে বললেন — "তুমি যে আমার ভক্ত, ভক্ত আমার মাতাপিতা, — ভক্ত আমার বন্ধুভ্রাতা—ভক্ত যে আমার প্রাণ। এবার যে আমি শুধু ভক্তের জন্য ব্রজানন্দ স্বামীরূপে অবতীর্ণ হয়েছি। কৃষ্ণ অবতারে যখন অবতীর্ণ হই তখন শুধু শ্রীমতির সাথে প্রেমলীলা করবার জন্যই আমার সে অবতার। কিন্তু সে অবতারেও রাধার সঙ্গে প্রেমলীলা সাঙ্গ করতে পারি নাই— শ্রীমতির কাছে ঋণী থেকে যাই। তাই পুনরায় রাধার প্রেমের ঋণ-পরিশোধ করার জন্য রাধা প্রেমে বিরহোন্মাদ গৌরাঙ্গ-রূপে অবতীর্ণ হই। কিন্তু এর একবারও জীবের কল্যাণের জন্য বিশেষ কিছু ক'রে যেতে পারি নি। আমার নাম ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু হরি—সে বারেও ভক্তের প্রাণের পিপাসা মিটিয়ে যেতে পারলাম না। তাই যখন লীলার সময় ফুরিয়ে এল, তখন একদিন ভক্তবৃন্দ সঙ্গে নিয়ে শ্রীক্ষেত্রধামে হরিসংকীর্ত্তনে মাতোয়ারা হ'য়ে সহসা জগন্নাথ দেবের শরীরের সঙ্গে মিলিয়ে যাই। ভক্তের প্রাণবল্লভ আমি আমাকে হারিয়ে ভক্তগণের সেদিন যে কি ব্যাগ্র ব্যাকুল আকুলতা। আমি তখন পুনরায় আবির্ভূত হ'য়ে ভক্তগণকে এই আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিলেম— "ভক্তগণ, তোমরা উতলা হ'য়ো না, তোমাদের প্রাণের পিপাসা আমি এবারও মিটিয়ে যেতে পারলাম না,—তাই আমি অঙ্গীকার করে যাচ্ছি—আমি পুনরায় অবতীর্ণ হব। শ্রীক্ষেত্র হ'তে ঈশান কোণে অবতীর্ণ হ'য়ে তোমাদের হৃদয়ের ক্ষুধা মেটাব। অন্যান্য বারের মত রাধাকে ছেড়ে পৃথক পৃথক দেহ ধারণ ক'রে নয়— রাধা ও আমি এক দেহে এক সঙ্গে অবতীর্ণ হব। তখন আমার বর্ণ হবে কৃষ্ণ অবতারের মত কৃষ্ণ নয়—গৌরাঙ্গ অবতারের মত গৌরও নয়;—রাধার পীত বর্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির কৃষ্ণ বর্ণ এই দুই বর্ণের সম্মিলনে শ্যামল-পীত।"। তিনি আবার বলতে লাগলেন্— "বৎস, এবার আমি শুধু ভক্তের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছি—ভক্ত যদি আমার প্রাণ চায় আমি তাও দেব। গৌরাঙ্গ অবতারে যে 'অনর্পিতং চরিং চিরাৎ।' প্রেমরস দেব ব'লে প্রতিশ্রুত হ'য়েছিলাম-সে রসত তখন তাহাদিগকে দিতে পারিনি এবার তাই দিতে এসেছি। তুমিত সেই বাঞ্ছা করেছিলে এস, এবার সেই রস নিজে পেয়ে জগৎকে বিলাও।" ভগবান ব্রজানন্দ আদেশ করলেন "যাও নূতন যুগের যুগাবতার প্রেমময় ব্রজানন্দের লীলার কথা জগৎবাসীকে জানাও।"

সকল ভক্ত শিষ্যদের ধন্যবাদ

ভগবান ব্রজানন্দের বেদবাণী ও আমার ঠাকুর গ্রন্থটির উপসংহার লিখতে লিখতে ঠাকুরকে স্মরণ করছি। আর প্রার্থনা জানাই তার শ্রীচরণে। হে ঠাকুর তোমার সকল ভক্তশিষ্যকে আশীর্বাদ প্রদান কর। সমস্ত বিশ্বব্যাপী যে যেখানে আছে, সকলেই যেন সুস্থ্য থাকে, তোমার স্মরণ ও নাম জপ যেন করে প্রতিদিন। তাদের কোন অভাব রেখো না। যেমন তুমি, তোমার রমেশানন্দ মহারাজকে বিভিন্ন পত্র মাধ্যমে নানারূপে আশীর্বাদ প্রদান করেছ। অপূর্ব সে সমস্ত তোমার আশীর্বাদ।

এই সকল রূপের মাধ্যমে তোমার সকল ভক্ত ও শিষ্যগণকে পৃথিবী ব্যপিয়া তদরূপ দর্শন দিও। তোমার ওঁ শান্তির বাণী ধবনিত হউক বিশ্বময়। ওঁ শান্তি উপলব্ধি করুক জগতের প্রতিটি মানুষ। পূর্ণ হোক তাদের জীবন।

এই গ্রন্থটি প্রকাশ করতে যে সকল ভক্তবৃন্দের সহযোগিতা পেয়েছি, তাদের তুম মঙ্গল করো, হে মঙ্গলময়! তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা রইল। বিশেষভাবে যাদের কথা না লিখলেই নয় তারা হলেন শ্রীযুক্ত সুনীল রায় পালধী, কেষ্টবাবু শ্রীমতি দেবী মুখার্জী, পুরবী মাঈ, সুনীল বিশ্বাস ও পুত্রসম সুরজিৎ সরকার।

যে সকল গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে ভগবান 'ব্রজানন্দের বেদবাণী ও আমার ঠাকুর' গ্রন্থটি সম্পূর্ণতা লাভ করেছে সেগুলো হলো : 'গুরুধাম' পত্রিকা, অমৃত-সাগর, বুড়াশিব মাহাত্ম্য, ভজনরত্নমালা, লীলা পরিচয়, ওমনিপটেন্ট ও রমেশানন্দের নাটকের বই।

ঠাকুরের নির্দ্দেশিত পথেই যেন তার ক্ষমাপরানন্দ সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করতে পারে এই নিবেদন।

ঠাকুরের চরণে ক্ষমাপরানন্দের প্রণাম—

"ওঁ নমঃ শ্রীশ্রীভগবতে জগৎগুরাচার্য্য ব্রজানন্দায় নমো নমঃ।"

জয় গুরু জয় ব্রজানন্দ জয় গুরু
ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি